# বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সাম্প্রতিক

মেজর জেনারেল (অব) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক

মেজর জেনারেল ইবরাহিম, বীর প্রতীক, ৪ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জানুয়ারি ১৯৭০-এ পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি কাকুলে যোগ দেন এবং সেপ্টেম্বর ১৯৭০-এ নিজ ব্যাচে প্রথম স্থান অধিকার করে কমিশন পান। অতঃপর মুক্তিযুদ্ধ - দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ৩নং সেক্টরের সঙ্গে। পরবর্তী দীর্ঘ চাকরি জীবনে বিভিন্ন প্রকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮৮-৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহাসিক শান্তি প্রক্রিয়ায় অবদান পালনকারী একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তীতে সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে ডিএমও, বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির কমান্ডান্ট ও যশোর অঞ্চলের জিওসি ছিলেন। ১৫ জুন ১৯৯৬-তে অবসরপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে তিনি ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর মহাপরিচালক ছিলেন। চাকরি সংক্রান্ত কাজে তিনি পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেছেন। তিনি ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের (১৯৬২-৬৮) একজন কৃতী ছাত্র। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। সামরিক লেখাপড়ার অঙ্গনে তিনি ইংল্যান্ডের বিশ্ববিখ্যাত 'দি রয়েল স্টাফ কলেজ কিম্বারলি' থেকে (১৯৮৩) পিএসসি ডিগ্রি এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'আর্মি ওয়ার কলেজ' থেকে (১৯৯০) এ ডব্লিউ সি ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পীস স্টাডিজ' নামক বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক।

www.nagorikpathagar.org

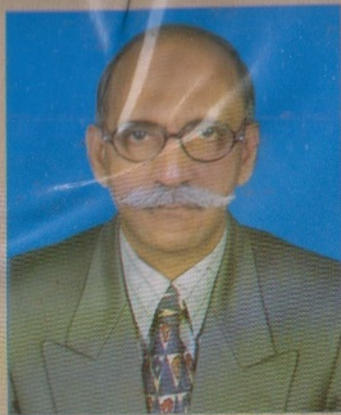

মেজর জেনারেল ইবরাহিম, বীর প্রতীক, ৪ অক্টোবর ১৯৪৯ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জানুয়ারি ১৯৭০-এ পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি কাকুলে যোগ দেন এবং সেপ্টেম্বর ১৯৭০-এ নিজ ব্যাচে প্রথম স্থান অধিকার করে কমিশন পান। অতঃপর মুক্তিযুদ্ধ - দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ৩নং সেক্টরের সঙ্গে। পরবর্তী দীর্ঘ চাকরি জীবনে বিভিন্ন প্রকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। ১৯৮৮-৮৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঐতিহাসিক শান্তি প্রক্রিয়ায় অবদান পালনকারী একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তীতে সেনাবাহিনী সদর দপ্তরে ডিএমও, বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির কমান্ডান্ট ও যশোর অঞ্চলের জিওসি ছিলেন। ১৫ জুন ১৯৯৬-তে অবসরপ্রাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে তিনি ঢাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ-এর মহাপরিচালক ছিলেন। চাকরি সংক্রান্ত কাজে তিনি পৃথিবীর বহু দেশ সফর করেছেন। তিনি ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজের (১৯৬২-৬৮) একজন কৃতী ছাত্র। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। সামরিক লেখাপড়ার অঙ্গনে তিনি ইংল্যান্ডের বিশ্ববিখ্যাত 'দি রয়েল স্টাফ কলেজ কিম্বারলি' থেকে (১৯৮৩) পিএসসি ডিগ্রি এবং যুক্তরাষ্ট্রের 'আর্মি ওয়ার কলেজ' থেকে (১৯৯০) এ ডব্লিউ সি ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড পীস স্টাডিজ' নামক বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক।

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সাম্প্রতিক

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক গ্রন্থাগার

# বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সাম্প্রতিক

মেজর জেনারেল (অব) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
বীর প্রতীক

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সাম্প্রতিক ❖ মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীর প্রতীক
প্রথম প্রকাশ ❖ জুলাই ২০০২
প্রকাশক ❖ সৈয়দ জাকির হোসাইন ❖ এ্যাডর্ন পাবলিকেশন
২৯ সেগুন বাগিচা (পুরাতন ১৪১), ঢাকা-১০০০ ফোন : ৯৩৪৭৫৭৭, ৮৩১৩০১৯
চট্টগ্রাম অফিস : ৩৮, এন. এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ফোন : ৬১৬০১০
গ্রন্থস্বত্ব ❖ লেখক
প্রচ্ছদ ❖ সুনীল কুমার
মূল্য ❖ তিনশত টাকা মাত্র

---

BANGLADESHER SWADHINATA O' SAMPRTIK
(INDEPENDENCE & CONTEMPORERY ISSUES OF BANGLADESH)
BY MAJ. GEN. (RETD.) SYED MD. IBRAHIM
Published in July 2002
Published by Syed Zakir Hossain, Adorn Publication
29 Segun Bagicha (old 141), Dhaka-1000. Tel:9347577, 8313019
38, N.A. Chowdhury Road, Anderkilla, Chittagong-4000, Tel: 616010
Copyright : Writer
Coverdesign : Sunil Kumar
Price : Tk. 300 Us$ 5

ISBN-984-8193-29-4
Ap-32-2002

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

সুধী পাঠক সমাজ

যাঁরা আমাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন

www.nagorikpathagar.org

# লেখকের নিবেদন

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন ব্যক্তি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও গৌরব চিরজীবনের জন্য লালন করে যাচ্ছি; কিন্তু এটাই কি যথেষ্ট? দেশ নিয়ে ভাবতে হবে, অন্যের সাথে নিজের ভাবনাকে বিনিময় করতে হবে এবং গঠনমূলক সমালোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে; কিন্তু যেহেতু সেনাবাহিনীতে চাকুরী করতাম, সেহেতু মতপ্রকাশের স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য বাধা ছিল। অবসর জীবনে সেটা নেই। তাই গণতান্ত্রিক সমাজে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সুযোগে এবং নিজের মনের তাগিদে লিখেছি।

১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১ সালে আমি বিভিন্ন বাংলা পত্রিকায় বিভিন্ন বিষয়ে যে কলামগুলো লিখেছি সেগুলোর মধ্য থেকে বেছে বেছে কিছুসংখ্যক নিবন্ধ একত্রিত করে প্রকাশ করা হলো। ঐ সকল পত্রিকার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ধারণাটি মূলত প্রকাশক এ্যাডর্ন পাবলিকেশন-এর পরিচালক সৈয়দ জাকির হোসাইন-এর। তার জন্য প্রকাশককে ধন্যবাদ।

সংকলনের শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধ ও দেশ গঠনমূলক নিবন্ধগুলোকে স্থান দেয়া হয়েছে। অতঃপর মহানবী (সঃ)-এর জীবন ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়গুলো। পরবর্তী অধ্যায় বা গুচ্ছগুলো সাম্প্রতিক বিষয় প্রসঙ্গে। রচনাগুলোর মাধ্যমে আমার নিজস্ব চিন্তাধারা এবং সমমনাদের চিন্তা প্রকাশিত হয়েছে।

আশা করি পুনঃপাঠেও সম্মানিত পাঠকসমাজ বিরক্ত হবেন না। রেফারেন্স হিসেবে কোন না কোন কাজে লাগতেও পারে।

সকলের প্রতি শুভেচ্ছা।

ঢাকা, জুলাই, ২০০২

ইবরাহিম

www.nagorikpathagar.org

# সূ চি প ত্র

## ১. স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ


শতাব্দীর শেষ স্বাধীনতা দিবস : কিছু প্রাসঙ্গিক সংলাপ ৯
মুক্তিযুদ্ধ : কী পেয়েছি কী পাইনি ২৩
বিজয়ে পরাজয়ের দুশ্চিন্তা ২৭
একের ভেতর চার ও স্বাধীনতা দিবসের অন্যান্য ভাবনা ৩৪
সামনে অন্ধকার সিঁড়ি আলো জ্বলবে কবে? ৩৮
গৌরবের মুক্তিযুদ্ধ ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ৪২
শহীদ বদিউজ্জামান, সেলিম এবং অজানাদের স্মৃতি ভোলা যায় না ৪৭


## ২. ধর্ম ও জীবন


প্রসঙ্গ : বিশ্বশান্তির জন্য বিশ্বজনীন প্রার্থনাসভা ৫০
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামরিক নেতৃত্ব ৫৫
মহানবীর শিক্ষা ও সমকালীন বিশ্ব ৬২
সকলের জন্য ক্ষমা চাই, সকলের চাই মঙ্গল ৬৯
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন, কুরআন এবং সরকারের জবাবদিহিতা ৭৭


## ৩. সেনাবাহিনী এবং সংহতি


নভেম্বর '৭৫-এর অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থানের দুঃখজনক অধ্যায় ৮৫
সশস্ত্রবাহিনী দিবসের ভাবনা : বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পেশাদারিত্ব ৯৫
রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস ও নাসিমের মতভেদ একদিনে হয়নি ১০৯
সেনাপ্রধান নিয়োগসংক্রান্ত প্রশ্নে আরো কিছু কথা ১৩০
সেনাবাহিনী আইন, '৮১-এর সেনা বিদ্রোহ ও সংসদীয় কমিটি ১৩৯
প্রেক্ষাপট ৭ নভেম্বর : সংহতি কাদের মধ্যে এবং কেন? ১৪৯
সিপাহী জনতার বিপ্লব ১৫৪
সৈনিক থেকে রাষ্ট্রনায়ক ১৫৭




www.nagorikpathagar.org

৭ নভেম্বর : রাজনীতিবিদ থেকে রাষ্ট্রনায়কে সম্ভাব্য উত্তরণের লগ্ন ১৬১
জিয়া থেকে খালেদা ৭ নভেম্বরের উত্তরণ ১৬৬

## ৪. নির্বাচনী নিরাপত্তা ১৭৪

সংসদ নির্বাচন ২০০১ : নিরাপত্তা সম্পর্কিত কিছু ভাবনা ১৭৪
নির্বাচনকালে নিরাপত্তা-পরিবেশ ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা ১৭৯
সেনা কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসির ক্ষমতা না দিলে জাতিকে মূল্য দিতে হতে পারে ১৯০
তিন প্রধান সমীপে : নির্বাচনের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ১৯৭
প্রসঙ্গ : ১ অক্টোবরের নির্বাচন ও জবাবদিহিতা ২০৪
বেগম খালেদা জিয়া এবং সেনাবাহিনীকে সতর্ক অভিনন্দন ২১০

## ৫. প্রতিরক্ষা ও সীমান্ত

বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রশ্ন ও কর্নেল তাহেরের চিন্তা : উপমহাদেশের সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিত ২১৫
বোকামির কারণেই বিএসএফ মারা গেছে ২২৬
পাদুয়া থেকে রৌমারী-চাঁদপুরে মেঘনা-পদ্মা? ২২৯
যাঁরা বলেন সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজন নেই তাঁরা বাংলাদেশকে ভারতভুক্ত করতে চান ২৩৯

## ৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল ২৪৪
পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি তাই দিনে দিনে এর সমাধান সম্ভব নয় ২৪৮

## ৭. পুলিশবাহিনী

পুলিশবাহিনীর মৌলিক সংস্কার অপরিহার্য ২৫৩



www.nagorikpathagar.org

# ১. স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ

## শতাব্দীর শেষ স্বাধীনতা দিবস : কিছু প্রাসঙ্গিক সংলাপ

১.

এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৯৭-দ্বিতীয় সংস্করণ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং এককালে (১৯৬৩-৬৭) আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক সম্পাদিত তিনটি বৃহদাকার খণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ড 'হিস্ট্রি অফ বাংলাদেশ ১৭০৪-১৯৭১ ---- পলিটিক্যাল হিস্ট্রি' পুস্তকের ৭১৭ থেকে ৭৪০ নং পৃষ্ঠায় বিধৃত রচনা ও ম্যাপগুলির প্রতি সম্মানিত পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। **'বঙ্গ অথবা বাঙলা'** ইত্যাদি নামে একটি ভূ-খণ্ড তথা জনপদ প্রায় দু-হাজার বৎসর যাবৎ বিদ্যমান। সময়ের বিবর্তনে, নানা ঘাত-প্রতিঘাত কম-বেশি হয়ে, ঐ ভূ-খণ্ড ও জনপদেরই বৃহদাংশের নাম তথা পরিচিতি হয়েছে **'বাংলাদেশ'**। ঐ প্রাচীন ভূ-খণ্ড ও জনপদের বর্তমান অবশিষ্টাংশ হচ্ছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের অন্যতম প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ। অর্ধশতাব্দী পূর্বেও আমরা পূর্ববঙ্গ ছিলাম। একই ভূ-খণ্ডকে উত্তর-দক্ষিণ বা পূর্ব-পশ্চিম নামে বিশেষায়িত করা কোন নতুন ঘটনা নয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পাশাপাশি দুটি অঙ্গরাজ্য বা স্টেট আছে যেগুলোর নাম নর্থ কেরোলাইনা ও সাউথ কেরোলাইনা। এশিয়া মহাদেশের উত্তরপূর্ব কোণায় আছে নর্থ কোরিয়া ও সাউথ কোরিয়া নামক দুইটি আলাদা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র। এই উপমহাদেশেই 'পূর্ব-পশ্চিম' বিশেষণে বিশেষায়িত আরও একটি প্রদেশ ছিল যেটির নাম ছিল পাঞ্জাব। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে প্রদেশটি ভাগ হয়ে পূর্ব অংশ গেল ভারতে এবং পশ্চিম অংশ গেল পাকিস্তানে। উভয় দেশেই প্রদেশ দুটির নাম থেকে গেল পাঞ্জাব। কিন্তু অনুরূপভাবে বিভক্ত পাকিস্তানের ভাগে পড়া পূর্ববঙ্গ নামক প্রদেশটির নাম অচিরেই বদলিয়ে করা হলো পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে, তৎকালীন রাজনৈতিক সংগঠকগণ যেকোন সঙ্গত কারণে নতুন দেশের নাম রাখতে গিয়ে পূর্ব-বাংলা বা পূর্ব-বঙ্গ বা বঙ্গ বা বাংলা এ রকম না রেখে বরঞ্চ, নতুন শব্দ দিয়ে নতুন নাম রাখলেন যথা– **'বাংলাদেশ'**। সেই বাংলাদেশের জন্ম আজ থেকে আঠাশ বছর আগে ঠিক এই দিনে। আঠাশ বছর বয়স্ক একটি দেশ কখনই নবীন নয়। নতুন রাষ্ট্র এই অজুহাত দিয়ে কোন রকম ব্যর্থতা বা অঘটনের দায়িত্ব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। কিছুদিন পূর্বে (১৩/০৩/১৯৯৯), ঢাকা মহানগরী থেকে প্রকাশিত অন্যতম দৈনিক পত্রিকা 'প্রথম আলো' অফিসে ঐ পত্রিকারই সম্পাদকের উদ্যোগে একটি গোলটেবিল আলোচনা বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বিষয়বস্তু ছিল 'মুক্তিযুদ্ধ : কি পেয়েছি, কি পাইনি?' আলোচনার বিবরণের জন্য অদ্য স্বাধীনতা দিবসে প্রথম আলো পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা বা ক্রোড়পত্র দেখা যেতে পারে। আলোচকবৃন্দ ছিলেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত



www.nagorikpathagar.org

অধ্যাপক জনাব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক এবং '৯৬-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা জনাব জামিলুর রেজা চৌধুরী, সিলেটে অবস্থিত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং শিশুবিষয়ক ও বিজ্ঞান বিষয়ক স্বনামধন্য লেখক জনাব মুহম্মদ জাফর ইকবাল, নারী আন্দোলনের নেত্রী মালেকা বেগম এবং আমি নিজে। আলোচনা বৈঠকের মডারেটর বা পরিচালক ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান। ন্যূনতম কথায় সর্বাধিকের নিকট গ্রহণযোগ্য ভাষায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সংজ্ঞায়িত করা, '৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে অভীষ্ট নিকট ও দূরবর্তী লক্ষ্যসমূহ, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধাগণের মধ্যে বিবিধ আঙ্গিকে বিভেদ সৃষ্টি, ১৯৭২-'৭৫ সময়কালের গণতান্ত্রিক অসহিষ্ণুতা ও সংবিধানের চারটি সংশোধনী এবং এই প্রেক্ষাপটে ও ধারাবাহিকতায় একাধিক বিপ্লব তথা প্রতিবিপ্লব, ৭৬-৮২ সময়কালে একাধিক সামরিক শাসন জারি, পাকিস্তান এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষায় সমস্যা, যুবক সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অসহিষ্ণুতা ও ধ্বংসাত্মক প্রবণতা বৃদ্ধি, সমাজে বেকারত্ব ও হতাশা বৃদ্ধি, নারী সমাজের ক্ষমতায়নে অপ্রতুল সাংবিধানিক পৃষ্ঠপোষকতা, লেখাপড়ার খাতকে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গিতে অবহেলা, সার্বিকভাবে সমাজে আইন অমান্য করার প্রবণতা বৃদ্ধি, রাজনীতিতে টাকা ও অস্ত্রের প্রভাব অসামান্যভাবে বৃদ্ধি, সমাজে বিভিন্ন খাড়া ও সমান্তরাল (ভার্টিক্যাল ও হরাইজন্টাল) আঙ্গিকে বিভেদ সৃষ্টি ইত্যাদি কারণে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্যসমূহ অর্জন না হওয়া বিষয়ে আলোচনা হয়। আমি (তথা আমরা) নিজেও একটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে, ইনশাল্লাহ, একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবো। এ প্রসঙ্গে প্রস্তুতি অর্ধেক পথে আছে। বিষয় : 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি'। দেশের আপামর জনসাধারণের মনে এই ধরনের প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই আছে। একজন সক্রিয় তথা সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার মনেও এই প্রশ্ন উত্থাপিত আছে। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর এবং ঐ প্রসঙ্গের কিছু মূল্যায়ন উপস্থাপন করবো। আজ স্বাধীনতা দিবস তথা মুক্তিযুদ্ধ শুরুর দিন।

২.

ভাষাভিত্তিক জাতিতত্ত্বের নিরিখে আমরা অবশ্যই বাঙালি জাতি। বিগত কয়েকশত বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা হলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধ এবং তার ফসল হিসেবে বাংলাদেশ সৃষ্টি। জন্মের মুহূর্তে ছিলাম বাঙালি কারণ আমার মায়ের মুখের ভাষা ছিল বাংলা। জাগতিক প্রয়োজন মিটানোর জন্যে শিশু বয়সে প্রথম যে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে শিখি সেগুলোও ছিল বাংলায়। জন্মের মুহূর্তে আমি ছিলাম মুসলমান। কারণ তাৎক্ষণিকভাবেই ঈমানের বাণী অর্থাৎ কলেমা এবং আজান আমার কানে ফুঁকে দেওয়া হয়। শিশু বয়সেই যখন প্রথম কথা বলা শিখি, যখন



www.nagorikpathagar.org

বোধের উদয় হচ্ছিল তখন অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে ধর্মকেও চিনতে শিখি এবং নিজে কলেমা পড়া শিখি। তারপর থেকেই নিজের বিবেচনায় ও সিদ্ধান্তেই মুসলমান এবং বাঙালি। এই করেই, তৎকালীন বাংলার একটি নিভৃত গ্রামের একটি বালক, আমি, বড় হচ্ছিলাম। বাঙালিত্ব এবং মুসলমানিত্ব এই দুয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে দেইনি। আমাদের গ্রামে আমাদের পাশের পাড়াটি ছিল হিন্দুপাড়া। ঐ পাড়ার ছেলে রামকৃষ্ণ ছিল আমাদের সমপাঠি বা সহপাঠি। আমি যে নিয়মে মুসলমান এবং বাঙালি ছিলাম, রামকৃষ্ণও ঠিক ঐ নিয়মেই হিন্দু এবং বাঙালি ছিল। আমাদের গ্রামের বাইরে সারা উপমহাদেশ তথা বিশ্বব্যাপী যেমনই আরো মুসলমান এবং আরও বাঙালি ছিল, তেমনি আরও হিন্দু ও বাঙালিও অবশ্যই ছিল। একই গ্রামে বসবাসরত হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি ছিল না। কেউ হিন্দু বা কেউ মুসলমান, কিন্তু সৃষ্টিকর্তারই হুকুমে উভয়েই একই গ্রামে বাঙালি হিসেবে জন্মগ্রহণ করি এবং নিজের নিজের স্বাধীন বিবেচনায় হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে থাকি নিজেদের পৃথক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এই করতে করতে এলো ১৯৭১। নয় মাসের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর আমরা অর্জন করলাম বাংলাদেশ। ১৯৭১-এর ২৬শে মার্চের আগে ছিলাম পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের নাগরিক – 'পাকিস্তানী'। অতঃপর হয়ে গেলাম বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের নাগরিক– 'বাংলাদেশী'। নিজেরা কষ্ট করে, রক্ত দিয়ে, জীবন নিয়ে যে পরিচয়টা অর্জন করলাম সেটা হলো বাংলাদেশী। এখন আমি হলাম একজন গর্বিত বাংলাদেশী-বাঙালি-মুসলমান এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমার এককালীন সহপাঠি রামকৃষ্ণ হল একজন গর্বিত বাংলাদেশী-বাঙালি-হিন্দু। আমার জন্য অতিরিক্ত গর্ব হল যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। তবে এটাও ধ্রুব সত্য যে, এ কষ্ট ও সংগ্রামের পেছনে যে প্রেরণা সেটার মূল উপাদান আহরিত হয়েছিল বাঙালিত্ব থেকে। বাঙালিত্বের বিনিময়ে বাংলাদেশী হইনি; বাংলাদেশী এবং বাঙালিত্ব একে অপরের পরিপূরক পরিচয়। যেমন বহু জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা নামক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ হয়েছে 'সাউথ আফ্রিকান', কোরিয়ার নাগরিকগণ হয়েছে কোরিয়ান, ইরাকের ভেতরে বসবাসরত আরব জনগোষ্ঠীর মুসলিম খ্রিষ্টান সকলেই তথা নাগরিকগণ হয়েছে 'ইরাকি', বৃহৎ রাষ্ট্র ইরাকের পাশে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কুয়েতের ভেতরে বসবাসরত আরব জনগোষ্ঠীর সকলেই তথা নাগরিকগণ হয়েছে 'কুয়েতী', শতাধিক উপজাতির আবাসভূমি নাইজেরিয়া নামক রাষ্ট্রের নাগরিকগণ হয়েছে 'নাইজেরিয়ান', দুইশত-এর বেশি উপজাতি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি-গোষ্ঠী ও অন্তত বিশটি বড় জাতির তথা জাতি-গোষ্ঠীর আবাসভূমি ভারত বা ইন্ডিয়ার নাগরিকগণ হয়েছে ভারতীয় বা ইন্ডিয়ান এবং অন্তত তিনটি ভিন্ন ভাষাভিত্তিক জাতি-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত বেলজিয়াম নামক দেশের নাগরিকগণ হয়েছে 'বেলজিয়ান'। ঠিক এই স্থলে আমার বক্তব্যের অন্যতম প্রতিপাদ্য হলো এই যে, বাঙালিত্ব এবং বাংলাদেশীত্ব–এই দুটি পরিচয় বা তত্ত্বকে বিরোধপূর্ণভাবে মুখোমুখি দাঁড় করানো আমাদের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী, আমাদের



www.nagorikpathagar.org

জন্যে ক্ষতিকারক। আমি তথা আমরা বাঙালি ছিলাম বলেই পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে (১৯৪৭-'৭১) প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে গিয়েছিলাম। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ভাষার স্বীকৃতি আদায় করার জন্যে রক্ত ও জীবন দিতে হয়েছিল (১৯৪৮-৫২)। পাকিস্তান নামক রাষ্টের সংগ্রামী সংগঠক যে রাজনৈতিক দল (মুসলিম লীগ) তার জন্ম হয়েছিল বাংলার কেন্দ্র ঢাকায়। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের প্রস্তাবকারী (১৯৪০) ছিলেন তৎকালীন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শের-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে ভোটের যখন প্রয়োজন হলো তখন বাংলার মুসলমানরাই ভোট দিল (১৯৪৬-৪৭, এত কিছু সত্ত্বেও '৪৭-এর আগস্টের পর, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কাছে বাংলা এবং বাঙালি হয়ে গেল অপাঙক্তেয়। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি প্রধানত মুসলমানদের আবাসভূমি হিসাবে সৃষ্ট হলেও এটা পৃথিবীর আর দশটি রাষ্ট্রের মতোই একটি রাষ্ট্র ছিল। এটি নামে ছিল ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান। কিন্তু কাজে কর্মে ছিল ইসলামের মূলনীতি থেকে বহুদূরে। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানের সামরিক নেতৃবর্গ, আমলাতন্ত্রের নেতৃবর্গ, একদল রাজনীতিবিদ ও কিছুসংখ্যক বুদ্ধিজীবী পাকিস্তান ও ইসলামকে সমার্থক করে ফেললেন। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমানদের জন্য, ভাল মুসলমান হিসাবে বসবাস করতে বা ইসলামের মূলনীতি বাস্তবায়ন করতে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের মধ্যেই থাকতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। বস্তুত ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের পূর্বাংশের মুসলমানদের জন্য স্বাধীন আলাদা রাষ্ট্র কল্পিত ও প্রস্তাবিত ছিল। কিন্তু, ১৯৪৬ সালে একান্তই ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ঐ প্রস্তাবকে সংশোধন করে পূর্ব ও পশ্চিম মিলিয়ে এক পাকিস্তানের কল্পনা ও প্রস্তাব করা হয়। এই প্রেক্ষাপটেই, পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে একদল রাজনীতিবিদ এবং বুদ্ধিজীবী প্রচার করতে লাগলেন যে, পাকিস্তান মানেই ইসলাম; পাকিস্তানের বিপদ মানে ইসলামের বিপদ। আমি কিশোর বয়সে চট্টগ্রাম বন্দরের হাইস্কুলে পড়তাম। বন্দরের স্কুলগুলোতে যথেষ্টসংখ্যক উর্দুভাষী (বিহারী) ছাত্র ছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানের প্রতি একাত্ম হয়ে তারা নিজেদের জন্মস্থান ভারতের বিহার ছেড়ে তৎকালীন পাকিস্তানে আসে। পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান যেহেতু বিহারের নিকট তাই তারা পূর্ব-পাকিস্তানেই আসে। তাদেরকে মুহাজির বলা হতো এবং শুরুতে তারা স্থানীয় জনগণের সহানুভূতি ও গঠনমূলক মূল্যায়ন পেয়েছিল। ঐ উর্দুভাষী ছাত্রদের সঙ্গে আমরা যারা বাঙালি বা স্থানীয় ছিলাম তাদেরকে উর্দুতে কথা বলতে হতো। প্রচারিত ছিল যে, এটাও পাকিস্তান খাতিরে করা। কিন্তু নামাজ কালামের দিকে মন থাকা তথা ধর্মানুরাগী হওয়া এক জিনিস এবং বাধ্য হয়ে সমবয়সী তথা সমপাঠী কারো সঙ্গে ভিন্ন ভাষায় কথা বলা আরেক জিনিস। ঐ উর্দুভাষী সমপাঠীরা কদাচিৎ বাংলা বলতে চেষ্টা করতেন।



www.nagorikpathagar.org

৩.

পাকিস্তানের তেইশ বছরে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানীগণ কর্তৃক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পরিচালিত অবিচার, অন্যায় ও শোষণের প্রেক্ষাপটে অত্র অঞ্চলের জনগণের মনে, বিশেষত শিক্ষিত জনগণের একটি অংশের মনে, পাকিস্তান নামক তত্ত্বের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে যায়। এবং যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানীগণ কথায় কথায় ইসলামের নাম ভাঙ্গাতো তাই অত্র অঞ্চলের শিক্ষিত জনগণের একটি অংশের মনে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে নিস্পৃহ ভাব এসে যায়। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যে বহু-মাত্রিক তফাৎ ও বৈষম্য ছিল সেগুলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছে, কোনদিন কমে নাই। এটি ছিল পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র তথা পাকিস্তানী জাতির জাতি-গঠন প্রক্রিয়ার দুর্বলতা। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান এবং ভারত শত্রুভাবাপন্ন ছিল। এবং শত্রুগণ একে অপরের বিবিধ দুর্বলতার সুযোগ নিবে এবং এই নেওয়াটাই স্বাভাবিক। এরকম পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের করণীয় হয় দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্যে চেষ্টা করা অথবা যে শত্রু দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে তার সঙ্গে বিবাদ করা। পাকিস্তানী শাসকগণ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য সৎ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণের পরিবর্তে সবকিছুতেই ভারতীয় মাত্রাতিরিক্ত ইন্ধন দেখা শুরু করলেন এবং দ্বিতীয় কর্মটিতে মন দিলেন বেশি। এর ফলে চব্বিশ বছরের মাথায় এসে আম-ছালা উভয়ই গেল। ১৯৭১ এর মার্চে আমাদের বয়স অল্প। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে রাজনীতি বুঝার পরিপক্ব বয়স মোটেই নয়। কিন্তু এতটুকু বুঝার বয়স এবং বুদ্ধি অবশ্যই ছিল যে, ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করাটাই ছিল পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলার দ্বিতীয় সর্বশেষ (সেকেন্ড লাস্ট) পদক্ষেপ। ১৯৭১-এর মার্চ মাসের ৭ তারিখের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পরেও যখন পাকিস্তানী শাসকগণ এবং পিপিপি বা পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি নামক রাজনৈতিক দলটি নিজেদের বিবেচনা ও আচরণ সংযত ও সংশোধন করলেন না, তখন পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখাটা দুষ্কর হয়ে উঠে। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ দিবাগত মধ্যরাত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত নিরস্ত্র জনগণের উপর এবং ঘুমন্ত সেনাবাহিনী-পুলিশ-ইপিআর এর বাঙালি সদস্যদের উপর অতর্কিত আক্রমণই ছিল পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলার সর্বশেষ পদক্ষেপ। তারপর বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো সেটার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল বিজয় এবং মুক্তি। বিজয় এবং মুক্তির কোন বিকল্প ছিল না।

৪.

১৯৭১-এর ২৫শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানী শাসকগণ এবং পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি রাজনৈতিক নেতাগণ কর্তৃক গৃহীত রাজনৈতিক পদক্ষেপসমূহ সম্ভবত চূড়ান্ত ছিল না অর্থাৎ প্রয়োজনে সংশোধন বা উন্নতি করা যেত। কিন্তু ২৫শে মার্চ ১৯৭১-এর পরবর্তী পদক্ষেপসমূহ ছিল অফেরৎযোগ্য, আক্ষরিক অর্থেই বন্দুকের নল থেকে বের



www.nagorikpathagar.org

হওয়া গুলির মতো কোনদিন আর ফেরত আনা যাবে না। ২৫শে মার্চ ৭১-এর দিবাগত রাত্রি তথা ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহর থেকে নেওয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক পদক্ষেপসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের মন থেকে পাকিস্তানের জন্য অনুভূতি বা মায়া প্রায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। ঐরূপ মানসিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রকে বহাল রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে চাইলেন পাকিস্তানী সামরিক জান্তা এবং এতদাঞ্চলেরই কিছু রাজনীতিবিদ। পাকিস্তানের ঐ সংকটকালে, পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদগণের তুলানায় পূর্বাঞ্চলের কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদ বেশি উৎসাহী ছিলেন। আজকে একাত্তরের আঠাশ বছর পর বর্তমানের পাকিস্তানে বসবাসরত ঐ সময়ের ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত নেতৃস্থানীয় সামরিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বসমূহ মুখ খুলতে শুরু করেছেন। বর্তমান পাকিস্তানের বয়োবৃদ্ধ অংশই ছিল ঐ সময়ের (১৯৭১) ঘটনাবলীর মধ্যমণি। ১৯৭১-সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উচপদস্থ জেনারেলগণ এখন পুস্তক লিখছেন এবং সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন। অনেক জেনারেলের লেখা বই আমার নিজেরই পড়ার সুযোগ হয়েছে। মোটামুটি একই সুরে, সকল জেনারেলই পাকিস্তানকে ভাঙ্গার জন্যে যুগপৎ দুইখানে বা দুইটি বিন্দুতে দোষারোপ করেন যথা পাকিস্তানের তৎকালীন রাজনীতিবিদগণকে এবং ভারতের দূরভিসন্ধিকে। রাজনীতিবিদগণের মধ্যেও তৎকালীন পিপিপি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোই সবচেয়ে বেশি দোষারোপিত হচ্ছেন। একাত্তর সম্বন্ধে লেখা এসব পুস্তক পড়ে আমার মনে দুইটি ধারণা জন্মে। প্রথম ধারণাটি হলো যে, তারা এখনও অর্ধেক সত্য বলছেন। কোন না কোন কিছুর ভয়ে বা শঙ্কায় পূর্ণসত্য এখনও প্রকাশ করছেন না। দ্বিতীয় ধারণাটি হলো এই যে, আসলেই পাকিস্তানের ১৯৭০-এর শেষাংশে-স্থিত সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র ও ক্ষমতালোভী রাজনৈতিকদল পূর্ব-পাকিস্তানের আশা ত্যাগ করেই ছেড়েছিল (ইংরেজীতে যাকে বলে রাইট-অফ)। যা হোক, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল ও নাগরিকগণকে বিভিন্ন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন এবং নাজুক সিদ্ধান্ত ছিল ১৯৭১ সালে, বিশেষত বাংলাভাষী তথা পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহের জন্যে ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের জন্য। তাদের জন্য প্রশ্ন ছিল আমরা কোন দিকে যাব----- পাকিস্তানকে রক্ষার পক্ষে থাকবো, নাকি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পক্ষে থাকবো? বেশির-ভাগ দল এবং ব্যক্তিবর্গ স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠান পক্ষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ঐ প্রতিক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। মাইনরিটি বা ক্ষুদ্রাংশ-দলসমূহ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিসমূহ পাকিস্তানকে রক্ষার পক্ষে অবস্থান নেয়। সেই মাইনরিটি বা ক্ষুদ্রাংশ-দলসমূহের ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে গৃহীত বা কার্যকর করা সকল পদক্ষেপই ১৬ই ডিসেম্বর '৭১-এর পর ভুল প্রমাণিত হলো। এই ভুলসমূহের সমন্বয় বা সংশোধন আজ পর্যন্ত পুরোপুরি হয় নাই। কিন্তু হওয়া একান্ত প্রয়োজন।



www.nagorikpathagar.org

৫.

একটি সাংসারিক উদাহরণ দেই। বিবাহিত স্বামী এবং স্ত্রীর নতুন সংসার। স্ত্রীর গর্ভে সন্তান এসেছে। পিতা চান না এখনই সন্তান হোক। স্ত্রীকে পাঠালেন চিকিৎসকের কাছে গর্ভপাত বা এবরশন করানো যায় কি না! ডাক্তার চেষ্টা করলেন, চেষ্টা করতে করতে দেখলেন যে কাজটা বিপজ্জনক এবং করানো সম্ভব নয়। তিনি স্বামীকে পরামর্শ দিলেন ঘটনাটি মেনে নেওয়ার জন্যে। পরামর্শ স্বামীর মনঃপুত হলো না। স্বামীর অনাগ্রহ এবং জোর-জুলুম এর মধ্যদিয়ে দশ মাস দশদিন কেটে গেল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো এবং কালক্রমে বড় হলো। এখন প্রশ্ন হলো, সন্তানের প্রতি পিতার কি দৃষ্টিভঙ্গি হবে বা পিতার প্রতি সন্তানের কি দৃষ্টিভঙ্গি হবে? সন্তানতো আর তার পিতাকে এই প্রশ্নও করতে পারে যে, "তুমিতো আমার জন্মই চাও নাই, আমার জন্য তোমার স্নেহ, মায়া ও মমতা প্রশ্নের উর্ধ্বে রাখা কি সম্ভব"। এখন পিতার উত্তর দিবার পালা। যদি পিতা বলে, "হ্যাঁ বাবা আমি তোমার জন্ম চাই নাই, কথাটা সত্যি। তার জন্য আমি দুঃখিত। বিভিন্ন সাংসারিক চাপের কারণে আমি ঐ সময় তোমার জন্ম চাইনি। আমি যদি ভুল করে থাকি তুমি আমাকে সাজাও দিতে পার অথবা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেও দেখতে পার। আমি দ্বিতীয়টাই আবেদন করি। কিন্তু, প্রিয় পুত্র, তুমি এখন আমার জীবনের অংশ, তুমি আমার বংশধর ও বংশ রক্ষার মাধ্যম। তোমার কল্যাণ ও নিরাপত্তাতেই আমার কল্যাণ ও নিরাপত্তা"। পিতা যদি পুত্রকে এ রকম বলে তাহলে সম্ভাবনা আছে কিছু বাদানুবাদের পর পিতা-পুত্রের মধ্যে সমঝোতা হবে। কিন্তু যদি পিতা তার মুরুব্বীয়ানা বজায় রাখে ও ভুল স্বীকার না করে তাহলে পুত্র পিতার থেকে দূরে সরে যাবে। তখন পুত্রের মা এবং পুত্রের ধাত্রী-মা এরাই হয়ে যাবে পুত্রের কাছে প্রিয়, ঘনিষ্ঠ।

৬.

গত দেড় বৎসর যাবৎ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের পরিচালনায় 'প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা' নামক ব্যক্তিও সমাজে আছে। 'প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা' শব্দটি আমার আবিষ্কারও নয় বা আমিই প্রথম ব্যবহার করছি না। উদাহরণস্বরূপ ২৮শে ফেব্রুয়ারি ৯৯ইং তারিখের দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার ভিতরের পৃষ্ঠায় একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের চাকরির বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য। চাকরি প্রার্থীদের বয়স সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ২৮ বছর, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য ৩২ বছর পর্যন্ত। পাঠক আজকে ২৬শে মার্চ ৯৯ ইংরেজিতে যে ব্যক্তির বয়স ৩২ বছর, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়স ছিল ৪-৫ বছর। ৪-৫ বছর বয়সের সক্রিয় ও প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা খোঁজা, মুক্তিযোদ্ধাগণকেই হাস্যাস্পদ করার নামান্তর। প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রস্তুত করার উপযুক্ত সময় ছিল ১৯৭২-৭৩-৭৪ এই সময়কাল। কিন্তু যেকোন কারণে করা হয় নাই, বা কোন না কোন সীমাবদ্ধতার জন্য করা সম্ভব হয় নাই। কেন করা হয় নাই বা সীমাবদ্ধতা কি ছিল, তার সঠিক উত্তর তৎকালীন কর্তৃপক্ষই দিতে



www.nagorikpathagar.org

পারবেন। ইদানিংকালে আর একটি বিকল্প তত্ত্ব উপস্থাপিত হচ্ছে যথা, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রস্তুত করার প্রয়োজন নাই, বরঞ্চ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীগণেরই তালিকা প্রয়োজন। এই দ্বিতীয় তত্ত্বে ধরে নেওয়া হচ্ছে বা এজিউম করা হচ্ছে যে ১৯৭১ সালের সকল বাঙালিই মক্তিযুদ্ধের সমার্থক বা সহায়ক বা পৃষ্ঠপোষক বা সক্রিয় ব্যক্তি ছিলেন যদি না তিনি বিরোধী হিসাবে নিজের পরিচয় তুলে ধরে থাকেন। এই দ্বিতীয় তত্ত্বটিতে স্বাভাবিকতা আছে। যারা সক্রিয় তারা অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধারা, বিভিন্ন প্রকারে বা প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন। যারা সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তাদের বাইরেও যে কয়েক লক্ষ পুরুষ ও মহিলা, কিশোর-কিশোরী বা যুবক-যুবতী পরোক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সাহায্য-সহায়তা করেছেন এই কথা সত্য। যা হোক, আলোচনার খাতিরে, সর্বমোট সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা যদি দুই লক্ষ ধরি, তাহলে তাদের মধ্যে বৃহদাংশ তথা শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ ছিলেন ঐ সকল সাধারণ ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিক, চাকরিজীবী যারা কোন রাজনৈতিকদলের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন না; কিন্তু ঘটনাবলী সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের পাঁচটি ব্যাটালিয়নের সদস্যগণ, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান পুলিশে চাকুরিরত বাঙালি সদস্যগণ, তৎকালীন ইস্ট-পাকিস্তান রাইফেলসের বাঙালি সদস্যগণ, তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে কর্মরত মফস্বলভিত্তিক 'মুজাহিদ' বাহিনীর বাঙালি সদস্যগণ এই শ্রেণী বা ক্যাটাগরিতে পরে। ১৯৭১-সালের ছাব্বিশে মার্চের পর জাতির ক্রান্তিলগ্নে এরা বিবিধ নিয়মে ও মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় এবং সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ৯ মাস যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে। বাকি ত্রিশ ভাগ ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের সঙ্গে বিভিন্ন মাত্রায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ। এদের মধ্য থেকে একটি অংশ সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হয় আর একটি অংশ রাজনৈতিক সাংগঠনিক মুক্তিযোদ্ধা হয়। সে সকল ব্যক্তিবর্গ ১৯৭১-সালের পূর্ব থেকেই গভীরভাবে রাজনৈতিক ভাবাপন্ন ছিলেন বা রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের মনের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য, সংগঠন, উদ্দেশ্য ইত্যাদি নিয়ে যে রকম উপলব্ধি ছিল বা থাকার কথা অন্যদের মনে সেইরূপ না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি এবং ঐ রূপ না হওয়াটাই স্বাভাবিক। বস্তুত একটি বাস্তব সত্য হলো, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পূর্ববর্তী চার মাস যাবৎ সময়ে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে তাদের আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং ২৫-শে মার্চ দিবাগত রাত্রের আক্রমণাত্মক নৃশংস ঘটনা যদি পাকিস্তান সেনাবাহিনী না ঘটাতো তাহলে হয়তো-বা, বহু লোকই তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার অবকাশ পেত না। দ্বিতীয়ত ৭ই মার্চ ১৯৭১-সালের বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীকে বড় ধরনের একটা পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত করে। অতএব ২৬-৩০শে মার্চ '৭১-এর মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি অংশ, তৎকালীন ইপিআর এর বাঙালি অংশ, তৎকালীন পুলিশের বাঙালি অংশ এবং জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক সচেতন



www.nagorikpathagar.org

নিরপেক্ষ অংশ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার অবকাশ পায়। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়া মানে যদিও কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেয়া ছিল না; কিন্তু মানে অবশ্যই ছিল মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনকারী তথা পরিচালনাকারী রাজনৈতিকদলের সাংগঠনিক নেতৃত্ব মেনে নেওয়া। ২৬শে মার্চের সাতদিনের ভেতরই মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধে রূপ নেয়।

৭.

৭ই মার্চ'৭১ এবং ২৬শে মার্চ '৭১ নিয়ে কয়েকটি কথা বলতেই হয়। ১৯৭১-এর ৭ই মার্চ আমার বয়স একুশ বছর ছয় মাস ছিল। তখন আমি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্যতম ব্যাটালিয়ন দ্বিতীয় ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টে চাকরিরত ছিলাম। অবস্থান ছিল বর্তমান গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে অবস্থিত ভাওয়াল রাজবাড়ি। সেই সময়ের মানসিকতা ও উপলব্ধি এবং পরবর্তী আঠাশ বছরের অনুভূতি ও উপলব্ধিকে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন। অতএব অনাকাঙ্ক্ষিত সম্ভাব্য মিশ্রণের জন্য দুঃখিত। আঠাশ বছর পূর্বে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে (ডি-ফ্যাক্টো) স্বাধীন বাংলাদেশের গোড়াপত্তন হয়। তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব পাকিস্তান নামক প্রদেশকে স্বাধীন ও মুক্ত করে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে শুধু একটা কথাই ছিল না যথা "আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম"। কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে আমাদের কাছে অর্থাৎ ভাষণের শ্রোতা বা ভাষণের লিখিত রূপের পাঠকের নিকট এই মর্মটি অনুভূত অবশ্যই হয়েছিল। সুস্পষ্ট বাক্যে এইরূপ ঘোষণাটি শুধু সময়ের ব্যাপার ছিল। এই ৭ই মার্চের ঘোষণার মাধ্যমেই সুস্পষ্ট স্বাধীনতা ঘোষণার জন্যে ক্ষেত্র শতকরা একশত ভাগ প্রস্তুত করা হয়েছিল। তিনি কেন সুস্পষ্ট করে ঐ মুহূর্তে স্বাধীনতার ঘোষণা করেন নাই সেটার সঠিক উত্তর আমাদের মতো তরুণদের পক্ষে বুঝা কষ্টকর ছিল। তবে সম্ভাব্য উত্তর হিসাবে কয়েকটি বিকল্প অনুমানের উল্লেখ করা যায়। **প্রথম সম্ভাব্য কারণ** এই হতে পারে যে, একটু সময় নিয়ে হলেও শান্তিপূর্ণভাবে তথা ন্যূনতম রক্তপাতের মাধ্যমে যদি স্বাধীনতা অর্জনের কাজটি হয়ে যায় ঐ কল্পনা বা অনুমান। এরই প্রাসঙ্গিক হলো যে, ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়ায় শতসহস্র মানুষের প্রাণহানির আশঙ্কা। দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ এই হতে পারে যে, তার ভাষণ থেকে ইঙ্গিতগুলির মর্ম উদ্ধার করে বিবিধ পেশার জনগণ কর্তৃক দেশব্যাপী প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের অবকাশ পাওয়া যাবে এই রূপ অনুমান বা কল্পনা। তৃতীয় সম্ভাব্য কারণ এই হতে পারে যে, বন্ধুসুলভ দেশগুলিকে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার আগাম-বার্তা জানানো এবং অবন্ধুসুলভ দেশগুলি কর্তৃক অসহযোগিতা ও সমালোচনা এড়ানোর জন্যে তিনি ইউনিলেটারাল ডিক্লারেশন অফ ইনডিপেন্ডেন্স তথা একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করার পদক্ষেপ নেন নাই। **চতুর্থ সম্ভাব্য কারণ** এই হতে পারে যে, স্বাধীনতার



www.nagorikpathagar.org

ঘোষণাটি সময় এবং সুযোগ বুঝে করা যাবে বা যদি সরকারের মনোভাব ও কর্মকাণ্ড গঠনমূলকভাবে বদলায় তাহলে আদৌ ঘোষণার প্রয়োজন নাও হতে পারে।

৮.

যাই কিছু বলি না কেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের মাধ্যমে সকল পেশার সকল মানুষের প্রতি সঠিক বার্তা পৌঁছাতে পেরেছিলেন বলে বোধ হয়। পূর্ব-পাকিস্তানে কর্মরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও সৈনিকগণ তাদের জন্য প্রযোজ্য বার্তাটি বুঝে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণটি সাধারণভাবে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগটি হলো দীর্ঘ। এই ভাগে পরিস্থিতি ও সার্বিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগ হলো সংক্ষিপ্ত এবং এই ভাগেই ঘোষণা ও নির্দেশাবলী আছে। বাংলাদেশের লক্ষ কোটি জনতার মতো আমরা বাঙালি সৈনিকেরাও যথাসময়ে এই ভাষণ শুনি তথা অবগত হই। আমি তার পূর্ণ ভাষণ থেকে শুধু তিনটি ক্ষুদ্র অংশ উদ্ধৃত করছি :

**ক) প্রথম উদ্ধৃতি :** "আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই **বাংলাদেশে** কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।---। পাঠক অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল করবেন যে বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

**খ) দ্বিতীয় উদ্ধৃতি :** "---তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সব কিছুই-আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো।-------"। পাঠক অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল করবেন যে এখানে গেরিলা যুদ্ধের ইঙ্গিত এবং সার্বিক প্রস্তুতির নির্দেশ দেওয়া আছে।

**গ) তৃতীয় উদ্ধৃতি :** "-----এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" পাঠক অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল করবেন যে, যুদ্ধ শুরু করার চূড়ান্ত অঙ্গীকার এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৯.

এ ভাষণের পর আগামী অর্থাৎ ৭ই মার্চের পরবর্তী দিনগুলির সম্ভাব্য করণীয় সকলের মানসপটে ফুটে উঠে। আমরা বাঙালি সৈনিকেরা অতীতের তুলনায় অধিক সাবধান হয়ে গেলাম। বিদ্যমান পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে আমাদের উপরস্থ কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত যেকোন আদেশ পালনের পূর্বেই আমরা বিশ্লেষণ করা শুরু করলাম। এর ফলে, আমরা



www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিরস্ত্র হয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে যাই। ১৯শে মার্চ '৭১ জয়দেবপুর বাজার ও রেল স্টেশনের সন্নিকটে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ঢাকায় অবস্থিত ৫৭ পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাহানযের আরবারের নেতৃত্বাধীন একটি সেনাদলের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণ ও দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের পক্ষ থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয়। উল্লেখ্য যে, সেনাদলটি জয়দেবপুরে গিয়েছিল, ভাওয়াল-রাজবাড়ীতে অবস্থিত দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের মূল অংশকে নিরস্ত্র করার জন্য। এই প্রতিরোধের কাজগুলি ছিল ৭ই মার্চ ভাষণের প্রত্যক্ষ ফল। আমরা যারা জয়দেবপুরে ছিলাম তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ২৬ এবং ২৭ মার্চে চট্টগ্রামের ঘটনাবলী বিশেষত চট্টগ্রাম মহানগরীর ষোলশহর নামক স্থানে অবস্থিত অষ্টম ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট এর উপ-অধিনায়ক তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীকালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া)-এর স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বেতার ভাষণ এবং অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্ট কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের কার্যকলাপের সঙ্গে সমন্বয় করে আমরাও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরলাম। বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্যান্য ব্যাটালিয়ন যেগুলো যশোর, সৈয়দপুর ও কুমিল্লাতে ছিল তাদের জন্যও অনুরূপ অনুভূতি প্রযোজ্য। যশোরে অবস্থিত প্রথম ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের তৎকালীন বাঙালি অধিনায়ক লেফটেনেন্ট কর্নেল রেজাউল জলিল কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপারগতা বা বিলম্বের প্রেক্ষাপটে বাঙালি ক্যাপ্টেন হাফিজ উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে সৈনিকগণ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। সৈয়দপুরে অবস্থিত তৃতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পরে, তৎকালীন ক্যাপ্টেন আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। কুমিল্লায় অবস্থিত চতুর্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন একজন অবাঙালি লেফটেনেন্ট কর্নেল। চব্বিশ মার্চ ৭১-এ এখানে উপ-অধিনায়ক হিসাবে যোগ দেন তৎকালীন মেজর খালেদ মোশাররফ। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে এবং তার পরবর্তী জ্যেষ্ঠ বাঙালি অফিসার মেজর শাফায়াত জামিলের পরিচালনায় এ ব্যাটালিয়ন তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়।

১০.

'৭১-এর ২৬শে মার্চের পর যে যেখানে ছিল সে সেখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং যোগ দেয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহ করে যারা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় তাদেরও প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল জনগণকে যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা, গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ সংগঠন করা। নিয়মিত বা কনভেনশনাল যুদ্ধ করার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একটি সেনাবাহিনীর ব্যক্তিবর্গের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে অনিয়মিত যুদ্ধ তথা আন কনভেনশনাল বা গেরিলা যুদ্ধের সঙ্গে একাত্ম হওয়া সম্ভব হয়েছিল ৭ই মার্চের ভাষণের প্রেরণার কারণে ও ভাষণ পরবর্তী মানসিক প্রস্তুতির কারণে।



www.nagorikpathagar.org

১১.

সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, ইপিআর ও তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের আমলাগণের মধ্য থেকে ব্যক্তিবর্গ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ায়, মুক্তিযুদ্ধ অভাবিত বেগ ও সাংগঠনিক শক্তি পায়। অত্যন্ত বিনীতভাবে বলতে চাই যে, সেনাবাহিনীর ব্যক্তিবর্গ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মতো রাজনীতি বিষয়ে জ্ঞানী বা পারদর্শী ছিলেন না। না থাকাটাই স্বাভাবিক। মুক্তিযোদ্ধাগণের মধ্যে শতকরা নিরান্নব্বই ভাগ ছিল তৃণমূল পর্যায়ের। আমি (তৎকালীন সেকেন্ড লেফটেনেন্ট ইবরাহিম) ছিলাম দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তথা নবগঠিত (এপ্রিল'৭১) তিন নম্বর সেক্টরের একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমিও ছিলাম তৃণমূল পর্যায়ের। তৃণমূল পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধাগণ মুক্তিযুদ্ধের স্থায়িত্ব বা যুদ্ধক্ষেত্রের সাংগঠনিক বিন্যাস বা যুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক রূপ কি হবে এসব নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। দেশব্যাপী ও যুদ্ধরত তৃণমূল পর্যায়ের সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাগণের সামনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্ব-আরোপিত দায়িত্ব ছিল শত্রুকে সশস্ত্রভাবে কাবু করা। প্রাক্তন সেনা অফিসারগণ মুক্তিযুদ্ধে থাকায়, রাজনৈতিক নেতৃত্বের পক্ষে, মুক্তিযোদ্ধাগণকে সাংগঠনিকভাবে বিন্যস্ত করা, অকল্পনীয়ভাবে সহজ হয়। আজকে ১৯৯৯ সালে বলা অত্যন্ত সহজ যে, সেই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানকারী পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যগণের মন-মানসিকতায় পাকিস্তানী ছাপ ছিল। কিন্তু আঠাশ বৎসর আগে এরাই ছিল সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের প্রধান স্তম্ভ।

১২.

একটি দেশ সৃষ্টি করা, পরিচালনা করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা চাট্টিখানি কথা নয়। পৃথিবীর যেকোন কাজের মধ্যে এটি অন্যতম জটিল কাজ। স্বাধীন বাংলাদেশের জীবন-যাত্রার প্রণালী কেমন হবে, মতাদর্শ কি হবে ইত্যাদি খুবই জটিল বিষয়। সম্পূর্ণ মুক্তিযুদ্ধটি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক নেতৃত্বে পরিচালিত হলেও সকল মুক্তিযোদ্ধাই না ঐ দলের সদস্য ছিলেন না হয়েছেন। কিন্তু একটি মাত্র ইস্যুতে সকলেই একমত ছিল এবং সেটি ছিল পাকিস্তান সরকার, পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও তাদের সহচরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র ও সার্বিক যুদ্ধ করে এই দেশকে স্বাধীন করতে হবে। স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর দেশ চালানোর ভার পুনরায় রাজনীতিবিদদের। মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল মাত্র ৯ মাস হওয়ার কারণে সমগ্র বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরকে, প্রতিটি পরিবারকে সমানভাবে মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয় নাই। কেন মুক্তিযুদ্ধ মাত্র ৯ মাস ছিল তার বহু কারণ আছে। তবে সে আলোচনায় এখন যাবো না। বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে কয়েকটি নাম তার মধ্যে পাকিস্তান এবং ভারত অন্যতম। ভারতের সক্রিয় সাহায্য ছাড়া মুক্তিযুদ্ধ কোনদিনই ৯ মাসের মাথায় সফলভাবে শেষ হতো না। দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের সশস্ত্র বিজয়ে ভারতের সামরিক বাহিনীর জীবন ও রক্তদান এবং অন্যান্য বিবিধ ত্যাগ স্মরণীয়। কিন্তু



www.nagorikpathagar.org

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, পাকিস্তান তথা পাকিস্তান সেনাবাহিনী মনে করতেন যে তারা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হেরে গেছেন এবং সমানভাবেই দুঃখজনক হলেও সত্য যে ভারত ও ভারতীয় সামরিক বাহিনী মনে করতেন যে তারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমার দৃষ্টিতে উভয়েই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে অবমূল্যায়ন করেছেন। তবে তাদের জন্য এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীতে সকলেই নিজের স্বার্থ দেখে। মনে হয় বাংলাদেশই অন্যতম জাতি যারা জন্মের আঠাশ বছর পরেও বিভক্ত। গ্রামের ভাষায়, বাপ-চাচাদের দোষে সন্তানেরা দূষিত। মুক্তিযোদ্ধা বা অমুক্তিযোদ্ধা উভয়েই একটি জায়গায় ব্যর্থ.... সেটি হলো '৭১ পরবর্তী খাঁটি বাংলাদেশী প্রজন্মের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি। ১৯৭১ সালের বিজয় এবং পরাজয়ের নায়কগণ বা বিশিষ্ট চরিত্রগণ তাদের কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার জন্যে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে তথা সন্তানদের বিভক্ত রাখা উচিত নয়। বাপ মুক্তিযোদ্ধা ঐ আনন্দে যদি সন্তান বিভোর থাকে এবং গঠনমূলক আর কিছু না করে তাহলে দুঃখজনক। অপরপক্ষে, বাপ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল তাই সন্তানও যদি নিজে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী (অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টির বিরোধী) হয় তাহলে সন্তান মারাত্মক ভুল করবে, অথবা অন্য দশজন মিলে যদি সেই সন্তানকে দোষারোপ করে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী বানিয়ে ফেলে তাহলে সেই দশজনও ভুলই করবে।

১৩.

ইতিহাসের উপর কতটুকু নির্ভর করবো বা শুধু ইতিহাস নিয়েই কি পরে থাকবো নাকি সামনের দিকে আগাব এটি এই মুহূর্তে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। ইতিহাসে অ্যাসেট (পরিসম্পদ বা হিতকর বৈশিষ্ট্য) এবং লায়াবিলিটিস (দায়-দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা) থাকে। **১৯৭১ পরবর্তী তথা স্বাধীন বাংলাদেশের প্রজন্মকে একতাবদ্ধ হতেই হবে.... এর কোন বিকল্প নাই**। এ প্রসঙ্গে আমার যে মানসিকতা তার সঙ্গে দ্বিমত হওয়ার লোক বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার ভাষার প্রয়োগ অশুদ্ধ বা অভিব্যক্তির প্রকাশ অপরিপক্ব হতে পারে; কিন্তু আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত। ১৫ই মার্চ ৯৯ইং তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার ৬নং পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বিখ্যাত সাংবাদিক আবেদ খানের কলাম থেকে একটি উদ্ধৃতি দিতে চাই। আমাদের দেশে কেউই যে অপ্রিয় সত্য কথা শুনতে চায় না ঐ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন : '.... এখানে একটি চালু রেওয়াজ হল, তুমি আমার পক্ষে শতবাক্য প্রয়োগ করলে আমি সেটাকে আমার প্রাপ্য বলে ধরে নেব, আর তুমি আমার বিপক্ষে একটি বাক্য প্রয়োগ করলে আমি তোমাকে ধরে নেব প্রতিপক্ষের গুপ্তচর হিসেবে....'। একই তারিখের একই পত্রিকার মধ্যখানে, 'ধন্যবাদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল' এই শিরোনামে খুলনার জনৈকা হাসিনা খাতুনের একটি চিঠি দৃষ্টি আকর্ষণীয়ভাবে ছাপানো হয়েছে। ঐ চিঠির সর্বশেষ অংশটি উদ্ধৃত করছি : '.... অথচ বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের সাধারণ মানুষ '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ করেছিল একটু ভালো থাকার আশায়। দেয়ালে পিঠ



www.nagorikpathagar.org

ঠেকে গেছে। সামনে এগুনো ছাড়া পথ নেই। আর আপনাদের মতো বুদ্ধিজীবীরাই তো সে সঠিক পথের প্রদর্শক।' এই প্রবন্ধের পাঠক, যারা '৭১ পরবর্তী প্রজন্ম, তাদের প্রতি আমার বক্তব্য ..."হে কিশোর ও তরুণগণ, তোমরা ইতিহাসের লায়াবিলিটিসকে ছুঁড়ে ফেলে দাও। সংসারের অতীত বা বর্তমান মায়া-মমতা যেন তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তাকে ধূসরিত না করে। রক্তক্ষয়ী এক মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তোমাদের দেশের জন্ম ২৬শে মার্চ '৭১। স্বাধীন বাংলাদেশকেই তোমাদের একমাত্র অ্যাসেট বা পুঁজি বানাও। তোমাদেরকে যদি এ পৃথিবীতে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে শুধুমাত্র তোমাদের বাপ-চাচাদের নাম ভাঙিয়ে পারবে না। তোমাদের নিজেদের স্বকীয়তা ও মূল্য দিয়ে পৃথিবীর অন্য দেশের নাগরিকগণের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বেঁচে থাকতে হবে। পৃথিবীতে আরও দেশ আছে যেগুলো আমাদেরই মতো মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন হয়েছে যেমন ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া, কেনিয়া, জিম্বাবুয়ে ইত্যাদি। ওরা কেমন করছে সেদিকে তাকাতে হবে। আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা তাদের কাজ ছিল তোমাদের হাতের তালুতে স্বাধীনতা তুলে দেওয়া, আমরা সেটা করেছি। তোমাদের কাজ সেই স্বাধীনতা ও স্বাধীন মাতৃভূমিকে রক্ষা করা এবং সেটি থেকে উপকার নেওয়া। আমাদের ত্যাগ ও রক্তদানকে মূল্যহীন করবে না। এখনও সময় আছে, আগামী শতাব্দীর শুরুতেই নতুন করে শপথ নিয়ে দেশ গড়ার কাজে লেগে যাও।"

দৈনিক ইনকিলাব ২৬/০৩/১৯৯৯ইং



www.nagorikpathagar.org

# মুক্তিযুদ্ধ : কী পেয়েছি কী পাইনি

১৯৯৩-এর মে থেকে ১৯৯৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত আমি বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমীর কমান্ড্যান্ট বা অধ্যক্ষ ছিলাম। ওখানে প্রতি ৬ মাসে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের একটা করে ব্যাচ যেতো। উদ্দেশ্য ছিল দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর ওরিয়েন্টেশন কোর্স করা। বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমীতে যতোগুলো কমান্ড্যান্ট ছিলেন, আমি ছিলাম তাদের মধ্যে ১৩ নম্বর। প্রথমজন ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। ১৩ নম্বরে আমিও ছিলাম একজন মুক্তিযোদ্ধা। ভবিষ্যতে আর কোনো মুক্তিযোদ্ধা আসবেন কিনা সন্দেহ, যদি না ওই বিজ্ঞাপনটির মতো ৩২ বছর বয়সের মুক্তিযোদ্ধা কেউ হন। যা হোক ওখানে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ক্লাস নেয়ার সময় একটি প্রশ্ন আমি করতাম, বলুন তো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে কী বোঝায়? যারা ওখানে যেতেন তারা সবাই ২-৩ বছর চাকরি করা প্রশাসন ক্যাডারের অফিসার। খুব ভালো না হলেও ছাত্রসমাজের ভেতর তারা ছিলেন মোটামুটি উন্নত। একেকটা ব্যাচে থাকতেন ৫০-৬০ জন করে। সাদা কাগজে তারা উত্তর লিখে দিতেন। এদের মধ্যেই যারা পরিসংখ্যানে পড়াশোনা করতেন, উত্তরগুলো তাদের দিতাম বিশ্লেষণ করার জন্য। দেখা যেতো, উত্তরগুলো ১৪-১৫ রকমের হয়েছে। অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রকৃত মর্ম ছাত্রসমাজের মধ্যে সঠিকভাবে ছড়ায়নি।

প্রথমে আমাদের চিন্তা করতে হবে অর্থনৈতিক মুক্তি নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল পাকিস্তানী রাষ্ট্রের শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়া। উন্নতভাবে সবাই আমরা বাঁচতে চেয়েছি। কিন্তু সেটা আমরা পাইনি। সে সময়ে পাকিস্তানের চেয়ে অর্থনৈতিকভাবে আমরা ছিলাম অনেকখানি পিছিয়ে। কেন? কারণ আমাদের সবকিছুই তারা ২৪ বছরে নিয়ে গেছে। কিন্তু গত ২৬ বছরে তো আমরা এ থেকে উদ্ধার পাইনি।

আমাদের প্রধান সমস্যা হলো আমরা আড্ডাবাজ। আর দাঙ্গাবাজরা তো রয়েছেই। আমরা কোনো শৃঙ্খলা মানি না। গাড়ি চালাতে গেলে যে হলুদ রেখা টপকানো যায় না, সেটা মানা তো দূরের কথা, কংক্রিটের দেয়াল পর্যন্ত রাখা যায় না। এ অস্থিরতার উৎস কোথায়? বঞ্চনা থেকে। সবাই ভাবে, অন্যজন নিয়ে যাচ্ছে আমি কেন পাবো না? পোস্ট অফিসের বা বাসে ওঠার লাইন থেকে সর্বত্র খারাপ হবে। বাংলাদেশে এখন মানুষ খুন করা পাখি শিকারের চাইতেও সহজ হয়ে গেছে। '৭০ সালে জিন্নাহ হলে ছুরি দিয়ে বদিকে মারার ঘটনাটা ছিল আলোড়ন সৃষ্টিকারী। এখন পিস্তল দিয়ে মেরে বস্তাবন্দি করে ফেলে রাখা হয়। কিছু হয় না। আইন-শৃঙ্খলা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে।



www.nagorikpathagar.org

জাতীয় জীবনের আলোচনা-সমালোচনা থেকে কিছু কিছু জিনিস বাদ দিতে পারলে গঠনমূলক কাজগুলো সামনে আসে। এখন তাই দরকার ভারতবিরোধী আর পাকিস্তানবিরোধী মানুষের মধ্যে সমঝোতা। পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি। তাতে ভারত আমাদের অবশ্যই সাহায্য করেছে। কিন্তু কথা হলো, পাকিস্তানের সেই নিপীড়নমূলক আচরণের জন্য আমরা আর কতো কথা বলবো? এ বিষয়টা আমাদের সমাজকে বিভক্ত করে রেখেছে বলে আমার মনে হয়।

সিরাজুল ইসলাম স্যারের কথায় আসি। তিনি ঠিকই বলেছেন। নেতৃত্বের দিকে বিভক্তিটা ঘটছে। নিচের স্তরের একটা লোকও এর মধ্যে নেই। তার কাছে যে কাপড়টা আসছে, সেটা বাংলাদেশেরই তাঁতের কাপড়। ওপরের দিকে যারা আছেন তারা জানেন, কোনটি আমদানীকৃত কাপড় আর কোনটি নয়? অর্থাৎ পাকিস্তানবিরোধী আর ভারতবিরোধী মনোভাবটা পরিবর্তন করতে হবে। ভারতে তো পাকিস্তানবিরোধী কিংবা বাংলাদেশবিরোধী মনোভাব নেই। পাকিস্তানও তো ভারতবিরোধী কিংবা বাংলাদেশবিরোধী মনোভাব নিয়ে বসে থাকছে না। তারা ঠিকই এগিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সকল দেশ নিয়েই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। ওআইসি'র কর্মকাণ্ড সবার প্রিয় না হলেও তাদের ৪৪টি দেশকে তো বিশ্বের কোনো দেশ অবহেলা করতে পারছে না। মুক্তিযুদ্ধের সময় তারা আমাদের সমর্থন করেনি, বরং বিরোধিতা করেছে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে স্বাধীনতার ৪ বছর পরে। এ স্বীকৃতির জন্য বঙ্গবন্ধুকে লাহোর পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যদি বলতেন, 'তোমরা আমাদের সমর্থন দাওনি, আমিও তোমাদের সঙ্গে নেই', তাহলে বাংলাদেশ পৃথিবীর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। সবদিকে ভারসাম্য রেখে চলার জন্যই বঙ্গবন্ধু ওই কাজটা করেছিলেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ভালো করার জন্য বিভেদের মনোভাব আমাদের দূর করতে হবে। নিজেদের যে দুর্বলতাগুলো আছে সেগুলো স্বীকার করতে হবে।

কথায় কথায় রাজনীতিবিদরা বলেন, আমরা হাজার বছরের সংগ্রামী জাতি, বীরের জাতি। কিন্তু কোনোদিন কেউ এ কথা বলেন না, আদমজী জুট মিলে যে কোটি কোটি টাকা লোকসান দেয়া হচ্ছে সেটা কিভাবে দূর করা যায়? আলোচনার শুরুতে সামরিক বাহিনীর কথা উঠেছিল। আদমজী জুট মিল আর পিডিবিতে যতো লোকসান হয়েছে তা যোগ করলে সেটা সেনাবাহিনীর বাজেটের থেকে বেশি হবে। এটা কি আমাদের জাতীয় চরিত্রের কোনো ইতিবাচক দিক? আমরা কি আজীবন সবক্ষেত্রে লোকসান দিয়ে যাবো? কোনো জায়গায় যে আমরা চুরি বন্ধ করতে পারছি না, তার জন্যে কে দায়ী? পাকিস্তান না ভারত? এ আত্মসমালোচনাটা আমাদের থাকতে হবে। আমাদের এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হলে নেতৃত্বে যারা আছেন তাদের কাজ করতে হবে।

আমি একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। আমার জীবনের বিনিময় মূল্য ছিল বন্দুকের একটা গুলি। কিন্তু সেই কথাই শুধু জপে গেলে তো আর কয়েকদিন পর আমরা জাতীয় জাদুঘরের সামগ্রী হয়ে যাবো। সমাজের এক অংশকে শত্রু ভেবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে



www.nagorikpathagar.org

যাওয়া যাবে না, বন্ধু ভেবেই এগিয়ে নিতে হবে। দেশে হাজার রকমের লোক থাকবে। মওলানা থাকবেন, ডাক্তার থাকবেন, কবিরাজ থাকবেন, বৈদ্য থাকবেন। এদের মধ্যে ঝগড়া বেঁধে থাকলে তো হবে না। সমাজের এ বিভেদটা কাটাতে হবে। আমি মনে করি, আক্রমণকে সমঝোতায় পরিণত করতে মিডিয়ার একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

'৪৭ সালে আমার জন্ম হয়নি। আমার বাবা কিংবা শ্বশুরের কাছে সে সময়ের কথা শুনেছি। জমিদার বাড়ির লোক ছিলেন না। সে সময় জমিদারদের দাপট ছিল খুব। জমিদার বাড়ির সামনে মাথায় ছাতা দেয়া যেতো না, জুতা পরে হাঁটা যেতো না, ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ একটা প্রেক্ষাপটের কারণে '৪৭ সালে পাকিস্তান হয়েছিল। সে প্রেক্ষাপট কী ছিল, ইতিহাস থেকে তা আমরা জানি। '৪৭ সালের পর যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলো নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে '৪৭ পূর্ব প্রেক্ষাপটকে আমরা অস্বীকার করলে আজ থেকে ২০ বছর পর এ রকম একটা কথা উঠবে যে, মুক্তিযুদ্ধের আগের বাংলাদেশ সৃষ্টির যে প্রেক্ষাপট সেটাও ভুল ছিল। আমরা যদি আরেকজনের ত্যাগ, কষ্ট, নির্যাতনের সম্মান করতে না শিখি, আমাদের বাপ-দাদার আমলের প্রসঙ্গটাকে অস্বীকার করি, আমার বংশধরও তাহলে আমাকে অস্বীকার করবে।

ইতিহাসকে এখন ইতিহাসবিদদের কাছে রেখে দিয়ে আমাদের প্রয়োজন ভবিষ্যতের দিকে চোখ দেয়া। ভবিষ্যতে দেশের কী হবে, সেটি নিয়ে সবার মধ্যে একটা নিস্পৃহ ভাব। সবাই এখন ব্যস্ত টাকার রাজনীতিতে। ৫ বছর পর পর যে ভোটের জন্য সবাই লাইনে দাঁড়াবে ওখানেও টাকা। এ টাকার রাজনীতি দিয়ে একুশ শতকে বাংলাদেশকে দাঁড় করানো যাবে না। বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই। মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য কি এই ছিল যে, যারা ধনী হবে তারাই আমার ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করবে? এর উত্তর যদি হয় 'না', তাহলে এর বিরুদ্ধে তো আমাদের আন্দোলন করতে হবে। আমি তো টাকার হাতে আমার ভাগ্যকে ছেড়ে দিতে চাইনি। আমার আবেদন হচ্ছে, প্রচার মাধ্যমের পক্ষ থেকে আপনারা এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিন। পরিশ্রমের দিকে দেশকে নিয়ে যেতে পারলে হয়তো একটা উন্নতি আসতে পারে।

আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে একটা কথা বলি। কোরআন শরিফের প্রথম বাণী ছিল, পড়ো। সেই পড়ালেখা থেকে যে মেয়েদেরকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে, এ প্রশ্নটা কেউ তুলছে না। জ্ঞানের আলোয় সবাই উদ্ভাসিত হলে অসহিষ্ণুতাটা কমবে, সন্ত্রাস কম হবে। আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। সমাজে তাদেরও স্বাগতম জানাতে হবে। ব্যবস্থাটা এখানে ঠিক নেই বলে তারা এ রকম করছে। বিদেশে তো আমাদের মানুষরাই উৎপাদনশীল কাজ করছে। মহিলাদের কথা আলোচনায় এসেছে। জনসংখ্যার অর্ধেক যেহেতু নারী, আমি মনে করি, সব জায়গায় যে কোনো মূল্যে মহিলাদের শতকরা ৫০ ভাগ নিয়োগ দেয়া উচিত। আমি শুনেছি, কোনো জায়গায় শতকরা ৩৫ ভাগ নারী থাকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নাকি বৈপ্লবিক একটা পরিবর্তন আসে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গাগুলোতে এখন মেয়েদের সংখ্যা বাড়ানো উচিত।



www.nagorikpathagar.org

আর একটি যে কথা আমি বলতে চাই তাহলো, রাজনীতিবিদদের ওপর সাধারণ মানুষের বিশ্বাস একেবারে কমে গেছে। তারা রাজনীতিবিদদের আর বিশ্বাস করে না। টেলিভিশনে তাদের দেখে হাসে। তাদের মধ্যে নেতৃত্ব দেয়ার কেউ নেই। হরতালের ব্যাপারটাই ধরুন। প্রচার মাধ্যমে জনমত গড়ে তোলার কারণেই কিন্তু হরতাল দেয়ার আগে রাজনীতিবিদরা এখন চিন্তা করে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে এখন নানা কথা উঠছে। মুক্তিযুদ্ধ এখন রাজনীতি। এটাই হচ্ছে বাস্তব। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের একটা আবেগ আছে। কিন্তু নতুন প্রজন্মের কাছে এসব কিছু নেই। তাদের মধ্যে হয় এখন এটা নতুনভাবে তৈরি করতে হবে, নইলে এ বাস্তবতা থেকেই নতুন জীবন শুরু করতে হবে। নতুন প্রজন্মকে অন্ততপক্ষে আমাদের একটা ভালো ভবিষ্যৎ দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। সবচাইতে হতাশাজনক হলো, ওদের সামনে কোনো ভালো উদাহরণ নেই। আমাদের দেশে যদি কিছু ত্যাগী, সৎ, আদর্শবাদী লোক থাকতো, তাহলে তার দিকে তাকিয়ে নতুন প্রজন্ম উৎসাহ পেতো।

এখন সবাই শুধু সংক্ষিপ্ত রাস্তা খোঁজে। সস্তায় হাততালি পেতে চায়। জামিলুর রেজা চৌধুরী স্যার দেশে ৫ হাজার কম্পিউটার প্রোগ্রামার তৈরির কথা বলছেন। তিনি হয়তো চান আমাদের দেশে বেকারত্ব ঘোচাবার জন্য সফ্‌টওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠুক। এখন যদি এটা একটা শ্লোগান হয়ে যায় যে, '১০ হাজার প্রোগ্রামার চাই।' তাহলে আমরা কোনো দিনই লক্ষ্যে পৌছতে পারবো না। এসব সস্তা শ্লোগান থেকে বের হয়ে আসল কাজ আমাদের করতে হবে।

যা হোক, ঘুরেফিরে একটা কথাই আমি শেষ পর্যন্ত বলবো, সবকিছু আপনারা শিক্ষায় বিনিয়োগ করুন। শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাতে পারলে হয়তো আজ নয়, কিন্তু কয়েক বছর পর আমরা এর ফল পাবো।

দৈনিক প্রথম আলো ২৬/০৩/১৯৯৯ইং



www.nagorikpathagar.org

# বিজয়ে পরাজয়ের দুশ্চিন্তা

শোষক ও শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ কি শেষ হয়েছে? নাকি স্বাধীন বাংলাদেশে গত ২৮ বছরে এ যুদ্ধ শুরুই হয়নি? নাকি আমরা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি ইতোমধ্যেই? সময়ের পরিক্রমায় নতুন শতাব্দী এসেছে। তাৎক্ষণিক পঞ্জিকাভিত্তিক সমন্বয়ের কারণে 'যুগান্তর' যদিও যুগসন্ধিক্ষণে বেরুচ্ছে, তথাপি যুগান্তর ও যুগান্তরে দর্শন কালের দাবি, সময়ের চাহিদা। সময় আসছে বিভিন্ন চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সমন্বয় করার। শিক্ষায়তনগুলোতে ইতিহাস পড়তে আগ্রহী ছাত্রের সংখ্যা কমলেও জাতি হিসেবে আমরা এখনও দারুণ ইতিহাসপ্রেমী রয়ে গেছি। ব্যাকরণের ভবিষ্যৎ আর ত্রিমাসিক ইতিহাসের বা কাল বর্ণনার 'ভবিষ্যৎ' এবং অতীতের মধ্যে সমন্বয় করতে হয়। ক্ষুদ্র উদাহরণ দিয়ে শুরু করা যাক।

১.

শতাব্দীর শেষ বিজয় দিবস ছিল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা গোনা যায়। পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা নিয়ে 'আতিশয্য-প্রভাবিত' উৎসাহ বিদ্যমান। বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর শতকরা ৬০ ভাগের বয়স ৪০ বছরের নিচে (অর্থাৎ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে যে ব্যক্তির বয়স ছিল ১১ তার এখন বয়স ৪০)। জনগোষ্ঠীর ৩০ ভাগের বয়স ৪০-৬০ বছরের মধ্যে (অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধকালে তাদের বয়স ছিল ১১ থেকে ৩১ বছরের মধ্যে)। জনগোষ্ঠীর অবশিষ্ট ১০ ভাগের বয়স ৬০ বছরের উর্ধ্বে। এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকের কাছে মুক্তিযুদ্ধ এখন নিখাদ ইতিহাস। গত ২৯ বছর এই ইতিহাস রচনা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক বহু হয়েছে এবং তাতে বাস্তবতার তুলনায় আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে বলেই অনুভূত। গত ২৯ বছর যাবৎ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র তথা জাতিগঠনে আদর্শ ও নীতির তুলনায় ব্যক্তি ও ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে বললেও অত্যুক্তি হবে না।

২.

মুক্তিযুদ্ধ অবশ্যই বিচ্ছিন্ন কোনও একদিনের ঘটনা নয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে প্রথম ঐতিহাসিক তারিখ ১৯৫২-এর ২১শে ফেব্রুয়ারি। আমাদের বয়সীরা যখন মায়ের কোলের শিশু, সেই সময় তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কই স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রথম প্রেক্ষাপট। আজ সমগ্র বিশ্ব স্বীকার করছে ২১শে ফেব্রুয়ারির মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য। ১৯৫২ সালের পরে আরও বহু



www.nagorikpathagar.org

ঘটনা ঘটেছে। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে পূর্ব পাকিস্তান নামক প্রদেশের জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানীরাই ছিল শাসকের ভূমিকায়। তারা দেশের শাসনকার্যটি কল্যাণমূলকভাবে মোটেই পালন করতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী তথা বাঙালিদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ও দাবি আদায়ের আন্দোলন অত্যন্ত স্বাভাবিক। ১৯৬০ সালের পর থেকে এই আন্দোলন ধীরে ধীরে গতি অর্জন করতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। ১৯৬৬ থেকে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব এসে যায় তৎকালীন আওয়ামী লীগের হাতে। ১৯৬৮ থেকে এই আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে চিহ্নিত হন তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা (ও পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু) শেখ মুজিবুর রহমান। পৃথিবীর ইতিহাসে যেকোনও মহৎ অর্জনের পেছনে দীর্ঘ সংগ্রামের পটভূমি আছে। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট হিসাবে ১৯৫২-১৯৭০ সালকে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। এই সময়কালের শেষ ৩ বছরের আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। কিন্তু যেকোন কারণেই হোক বা পরিস্থিতিতেই ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৬ তারিখের প্রথম প্রহরে সৃষ্ট মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রথম ঘটনা রাজধানী ঢাকাতে হয়নি এবং বঙ্গবন্ধুকে ঘিরেও হয়নি। এটি হয়েছিল চট্টগ্রামে। ৭ই মার্চ ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ কার্যত সমগ্র জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে কিন্তু স্বাধীনতার যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা তাতে ছিল না। তবে ১৯৭১-এর মার্চ মাসে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে চাকরিরত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা মাঝারি পর্যায়ের অফিসারগণ যেমন ছিলেন সতর্ক তেমনি ছিলেন সক্রিয়। বহুদিনের লালিত স্বাধীন দেশের চিন্তা, বঙ্গবন্ধুর ভাষণের উজ্জীবনী প্রেরণা ইত্যাদির ফলে তারা নিজেদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বহু গোপন বৈঠকে মিলিত হন। আলোচনা চালান। তখনকার পরিস্থিতি ছিল গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে যেন একটি উত্তপ্ত বারুদের স্তূপ, শুধু একটি দেশলাইয়ের প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটেই ২৬শে মার্চ ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথম প্রকাশ্য ঘোষণা আসে রেডিওর মাধ্যমে এবং সে ঘোষণা আসে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের পক্ষ থেকে। তাকে সাহায্য করেছিলেন চট্টগ্রামের স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ। এই ঘোষণার অন্তত দুটি ভাষ্য পাওয়া যায়, যার একটি ভাষ্য অবশ্যই ছিল বঙ্গবন্ধুর নামে। আর একথাও ঠিক যে, যদি বিগত ২০ বছরের (১৯৫২-৭০) সংগ্রামী প্রেক্ষাপট না থাকত তাহলে ২৬শে মার্চ সকাল বেলা তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও বা মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান জানালেও মুক্তিযুদ্ধ শুরু হত কিনা বা স্বাধীনতা আসত কিনা সন্দেহ। একটি সাংসারিক উদাহরণ দেয়া যাক। কোনও কিছু ভাজার আগে তাওয়া বা সসপেন অবশ্যই গরম করে নিতে হয়। রুটি সেকার আগে তাওয়া গরম না করলে রুটি কাঁচা থেকে যাবে। গরম তাওয়ায় রুটি দিলে ভালো সেকা হবে এবং রুটি ফুলে উঠবে। ১৯৫২ থেকে ১৯৭১-এর মার্চ সময়কালে তাওয়া যথাযথভাবে গরম হয়েছিল বলেই ২৬শে মার্চ '৭১-এর সকালে রুটি সেকা সহজ হয়েছিল। অন্যদিকে তাওয়া যদি অধিককাল থেকে গরমই হতে থাকে,



www.nagorikpathagar.org

কোনও কিছু সেকা না হয় তাহলে ধোঁয়া উঠতে শুরু করবে। পিয়াজু বা বেগুনি ভাজার আগে তেল গরম করতে হয়। যদি সময়মতো কাঁচা পিয়াজু বা কাঁচা বেগুনের টুকরো তেলের মধ্যে না দেয়া হয় তাহলে অধিক গরম হয়ে যাওয়ার কারণে তেল পুড়ে ধোঁয়া বেরুবে। ২৬শে মার্চের সকাল বেলা ছিল ঐ মাহেন্দ্রক্ষণ, যে সময় উত্তপ্ত তেলে কাঁচা পিয়াজু বা কাঁচা বেগুনের টুকরা দিতেই হবে। না দিলে আশা-ভরসা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। শহীদ জিয়াউর রহমান আসলে ঠিক সেই গুরুদায়িত্বটিই পালন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু বা জিয়া উভয়ই বাঙালি জাতির জাতীয় স্বার্থে এই কাজ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমানের যে মানসিক প্রস্তুতি সেটিতেও নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল এবং তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান যে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা দিলেন সেটিই ছিল বাঙালি জাতির কাঙ্ক্ষিত মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১-এর মার্চের বঙ্গবন্ধু এবং মেজর জিয়া উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। অন্য কথায়, ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতিতেই একজন বড় শরিক অপরজন ছোট শরিক। কিন্তু গত ২৪ বছর যাবত আমরা বাঙালিরা এই দুই মরহুম নেতাকে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করিয়েছি। এটা মস্ত অন্যায় এবং জাতি গঠনের জন্য ক্ষতিকর। আমাদের এই বিভক্তি বন্ধ করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ সৃষ্টিতে উভয়েরই অবদান আছে– কম আর বেশি। আমরা এ দুই নেতার কাছ থেকেই দেশ গঠনের প্রেরণা নিতে পারি। আমি মনে করি, মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর বাঙালি জাতির তথা বাংলাদেশীদের প্রথম পরাজয়ের কারণ কিন্তু এই বিভক্তিতেই নিহিত।

৩.

এ দেশের শত সহস্র শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত যুবক, কৃষক, শ্রমিক মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হলেও রাজনৈতিক দল ও মত নির্বিশেষে (মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম ব্যতীত) সকল মতাদর্শের বাঙালি জনগোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধ চলেছে ৯ মাস। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রণক্ষেত্র ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ। সমগ্র বাংলাদেশের ভূখণ্ডকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি সেক্টরকে আবার উপভাগ করে সাব-সেক্টর করা হয়। প্রতি সেক্টরের ভৌগোলিক এলাকা বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত থেকে শুরু হত এবং অভ্যন্তরে বিস্তৃত ছিল। প্রত্যেক সেক্টরে একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন এবং সাব-সেক্টরসমূহে ছিলেন সাব-সেক্টর কমান্ডার। সেক্টরে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তাদের বলা হত সেক্টর ট্রুপস এবং তাদেরকে কর্মের ভিত্তিতে দুই রকমের ভাগ করা ছিল। এক দলকে বলা হত নিয়মিত বাহিনী, আরেক দলকে বলা হত মুক্তিফৌজ বা গেরিলা। নিয়মিত বাহিনীর সদস্যরা সংঘবদ্ধভাবে প্রথাগত নিয়মে সীমান্ত বা তার নিকটবর্তী এলাকায় যুদ্ধ করতেন। মুক্তিফৌজ বা গেরিলারা দেশের অভ্যন্তরে অনিয়মিত তথা গেরিলা যুদ্ধ করতেন। গেরিলা যুদ্ধে কোন সম্মুখ বা পশ্চাৎ বলে কিছু থাকে না। মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে সনাতন পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য



www.nagorikpathagar.org

মুক্তিবাহিনীর একটা অংশকে ব্যাটালিয়ন, ব্রিগেড ইত্যাদি আকারে পুনর্গঠিত করা হয়। তিনজন জ্যেষ্ঠ সেক্টর কমান্ডারের নেতৃত্বে ব্রিগেড সমপর্যায়ের ফোর্স গঠন করা হয়। তৎকালীন লে. কর্ণেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ময়মনসিংহ-সিলেটের উত্তরে সংগঠিত হয় 'জেড ফোর্স, তৎকালীন লে. কর্ণেল সফিউল্লাহ্র নেতৃত্বে আগরতলার উত্তরে সংগঠিত হয় 'এস ফোর্স' এবং তৎকালীন লে. কর্ণেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে আগরতলার দক্ষিণে সংগঠিত হয় 'কে ফোর্স'। একই সময়ে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে, তৎকালীন ভারতীয় সরকারের আগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায়, মুক্তিবাহিনীর সমান্তরালে, গোপনে, মুজিবনগরে অবস্থিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, মুক্তিযুদ্ধের তৎকালীন প্রধান সেনাপতি ওসমানীর কমান্ডের বাইরে আলাদা একটি বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনীর নাম ছিল বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স, সংক্ষেপে বিএলএফ। সাধারণ লোকের মুখের ভাষায় এটার নাম ছিল মুজিব বাহিনী। এই বাহিনীর সর্বোচ্চ কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন ৪ জন (সকলেই তখন ছিলেন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা)। এই বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য বা মনোনীত হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল প্রার্থীদের খাঁটি ছাত্রলীগ কর্মী হতে হবে এবং নেতৃত্বের প্রতি থাকতে হবে নিঃশর্ত আনুগত্য। সর্বশেষ কাঙ্ক্ষিত শর্ত ছিল, প্রদত্ত পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তার জন্য সহায়তাকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। বিএলএফ তথা মুজিব বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সক্রিয় হয়। তাদের সকল সামরিক পরিকল্পনা এবং কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল এস.এস. ওবান।এখানে আমি যে কথাটা বলতে চাই, সেটা হল যে মুক্তিযুদ্ধকালেই এ ধরনের বিভক্তি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এক ধরনের পরাজয়ের গ্লানি বয়ে আনে। ১৯৭২-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ছিল শতকরা একশ ভাগ মুক্তিযোদ্ধা নিয়ে গঠিত। তার বিপরীতে দাঁড় করানো হয়েছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে, যারাও ছিল শতকরা একশত ভাগ মুক্তিযোদ্ধা। এই বিভক্তি তথা পরাজয়ের গ্লানি আমরা দীর্ঘ ২৯ বছর যাবৎ বহন করে চলেছি। আর করতে চাই না। বিভক্তি আর কাম্য নয়। এই পরাজয়ের গ্লানি থেকে মুক্ত হতেই হবে।

৪.

পাকিস্তানের ২৩ বছরের শাসনকালে দেশে যে শিল্পায়ন হয়েছিল তার একটা ক্ষুদ্র অংশ হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে। ২৩ বছরে পাকিস্তানে জন্ম নিয়েছিল ২২টি ধনকুবের পরিবার। এই পরিবারগুলো কর্তৃক স্থাপিত কিছু শিল্প মাত্র পূর্ব পাকিস্তানে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের মেহনতী কৃষকের সোনার ফসল পাট, চা এবং অন্যান্য দ্রব্য যথা চামড়া বিক্রি থেকে লব্ধ অর্থ চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। সমগ্র পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পূর্ব পাকিস্তানের অবদান ছিল বেশি। কিন্তু জাতীয় বিনিয়োগের তিন ভাগের এক ভাগ বিনিয়োগ হত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে। এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিকার চাইতেই আন্দোলন ঘনীভূত হয়ে স্বাধীনতার দাবিতে



www.nagorikpathagar.org

পর্যবসিত হয়। স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু শোষণ কি বন্ধ হয়েছে? মুক্তিযুদ্ধ ছিল শোষণ এবং শোষকের বিরুদ্ধে। মুক্তিযোদ্ধারা আজও বেঁচে আছেন। শোষক ও শোষণের বিরুদ্ধে কি মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে? নাকি স্বাধীন বাংলাদেশে গত ২৮ বছরে এই যুদ্ধ শুরুই হয়নি? নাকি আমরা এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি ইতিমধ্যেই? ঋণখেলাপ কি পরোক্ষভাবে শোষণের পর্যায়ে পড়ে না? নভেম্বর '৯৯-এর দৈনিক অর্থনীতি পত্রিকায় প্রকাশিত এক হিসাব মোতাবেক বাংলাদেশের ২০ জন শীর্ষ ঋণখেলাপির কাছে ২,৬৬,৯১০ লাখ বা ২৬৬৯.১০ কোটি টাকা পাওনা। এই টাকা যদি খেলাপি অবস্থায় না থাকত তাহলে এ টাকা দেশের গরিব জনগণের মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করা যেত। এটাও এক ধরনের শোষণ। গত ২৯ বছর যাবৎ অব্যাহতভাবে এই শোষণ চলে আসছে। দেশে আজ কি সমস্যা? চাঁদাবাজি, রাহাজানি, ছিনতাই, চুরি, খুন, ধর্ষণ, চোরাচালান, নকল, ভেজাল ইত্যাদির মধ্যে কোনটিকে প্রধান বলব?

৫.

প্রতিবছর এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষা অথবা মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষাসমূহ শুরু হলে দেখা যায় কি হারে নকল হচ্ছে এবং কি হারে পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হচ্ছে। শত শত নয়, বহিষ্কৃতদের সংখ্যা হাজার হাজার। ছাত্র সমাজের এক বৃহৎ অংশ মনে করে নকল করা তাদের অধিকার, নকল প্রতিরোধ করা এবং নকলকারীকে ধরা যেন অপরাধ। ৩০ বছর পূর্বে নকল করাটা ছিল নিষিদ্ধ ও দারুণ গোপন এক দুঃসাহসের কাজ। অথচ এখন নকল করাটাই স্বাভাবিক, না করাটাই হচ্ছে ব্যতিক্রম। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী পরীক্ষায়ও নকলের প্রবণতা নিম্নস্তরের তুলনায় কোনক্রমেই কম নয়। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা নকলের রাহুগ্রাসে আক্রান্ত। শিক্ষক সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং সংবাদপত্র নকলবিরোধী সংগ্রামে অংশীদার। সমাজের অবশিষ্ট বা বৃহত্তর অংশ এই বিষয়ে সোচ্চার নয়। ফলে দেশব্যাপী ছাত্ররা আজ এক অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন। নকলের মাধ্যমে পাস করা ডিগ্রিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ চাকরি লাভের প্রতিযোগিতাকে জটিল করেছে। এই অবৈধ পন্থায় পাস করা কেউ যখন শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেয় তখন জাতীয় ক্ষতি মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রথমত, এ ধরনের অশিক্ষিত ব্যক্তিরা ছাত্রদের যথার্থ বিদ্যা ও জ্ঞানদানে ব্যর্থ; দ্বিতীয়ত, সকল প্রতিরোধ কাজেও তারা এগিয়ে আসতে পারে না। কারণ, অসৎ কাজ দমনে তাদের নৈতিক মনোবল থাকে না। উঁইপোকা যেমন কাঠ খায় তেমনি নকলবাজরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে চলেছে। এটা গোটা জাতির জন্য অবমাননাকর।

৬.

চোরাচালান এখন দৃশ্যত বৈধ কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছে। চোরাচালানিরা সীমান্ত এলাকা এবং দেশের অভ্যন্তরে উভয় স্থানেই পুরোপুরি সংগঠিত। বিভিন্ন পেশা এবং পোশাকের সরকারি কর্মচারী বা কর্মকর্তাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশ সচেতন ও



www.nagorikpathagar.org

প্রতিরোধকামী হলেও বৃহত্তর অংশের সক্রিয় আগ্রহের কারণে তাদেরই চোখের সামনে দিয়ে চোরাচালান অব্যাহতই রয়েছে। ২৭শে নভেম্বর '৯৯ 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এণ্ড পিস স্টাডিজ' নামক একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে 'সিরডাপ' মিলনায়তনে একটি গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ছিল 'বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার আঙ্গিকসমূহ: অর্থনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা'। ঐ আলোচনায় বাংলাদেশ রাইফেলস বা বিডিআর (যারা সীমান্তে ব্যক্তিগতভাবে চোরাচালান প্রতিরোধে সচেষ্ট থাকে)-এর সাবেক মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এজাজ আহমেদ চৌধুরী বলেন, বিডিআর যেসব চোরাচালানিকে ধরে বা নাগাল পায় তারা হচ্ছে 'গাছের আগার মতো', কোনক্রমেই শিকড় নয়। গাছের শিকড় রাজধানীতে, সমাজের ও ক্ষমতার উচ্চমহলে। তিনি আরও বলেন, সীমান্ত এলাকার জনগণের বেকারত্বও চোরাচালানের অন্যতম কারণ। তিনি দুঃখের সাথে আরও বলেন যে, গত ৩০ বছরেও চোরাচালান দমন সংক্রান্ত আইনগুলো যুগোপযোগী করা সম্ভব হয়নি। কেন হয়নি তার অনেক কারণ থাকতে পারে। কিন্তু অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে সমাজের উচ্চস্তরের প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি চোরাচালানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বড় বড় চোরাচালানের কিস্তি ধরা পড়ে মাঝে মাঝে। সংবাদপত্রে শিরোনাম হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ সংবাদপত্রেরই কেসগুলো মনিটর বা ফলোআপ করার সামর্থ্য নেই। ফলে পাঠক সমাজ তথা দেশের নাগরিকগণ চোরাচালানের বড় বড় ঘটনার শেষ পরিণতি জানতে পারে না। চোরাচালানের জন্য কেউ কোন শাস্তি পেল কিনা সেটাও জানা যায় না।

৭.

দেশে অনেক সমস্যা। তা সত্ত্বেও অনেক ভালো কাজের উদাহরণও আছে। অধ্যাপক ইউনুসের দূরদর্শিতায়, সাংগঠনিক দক্ষতায় ও নেতৃত্বে গ্রামীণ ব্যাংকের মডেল এবং তত্ত্ব বিশ্বব্যাপী পরিচিত ও প্রশংসিত। পৃথিবীর সকল স্থান থেকে তাকে সম্মান দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশের আইসিডিডিআরবি কর্তৃক উদ্ভাবিত ওরাল রিহাইড্রেশন স্যালাইন বা খাবার স্যালাইন বিগত তিন দশকের মধ্যে বিশ্ব চিকিৎসা জগতে এক বিস্ময়কর অবদান। তবে এগুলো হচ্ছে বেসরকারি পর্যায়ের কৃতিত্ব। অন্যদিকে বাংলাদেশের সরকারগুলোর প্রশাসনে বা জনউন্নয়নে বড় রকমের কোন কৃতিত্ব নেই। সরকার অন্তত একটা বড় সমস্যাও যদি সমাধান করতে পারত তাহলে বিশ্বের কাছে সেটা উদাহরণ হতে পারত। নগরের ফুটপাত আমরা আজও মুক্ত করতে পারলাম না। মহানগরগুলোর অলিগলির কথা বাদ দিলেও প্রধান সড়কগুলোতে পর্যন্ত জানজট কমাতে পারছি না। দেশের প্রধান মহাসড়কগুলোতে যানচলাচলে শৃঙ্খলা আনতে পারছি না। আগামী ১০ বছরে গাড়ির চাহিদা কতটা বাড়বে এখন পর্যন্ত তা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়ে আমরা বাণিজ্যিক এলাকায় নির্মাণ কাজের অনুমতি দেই। এ ব্যাপারে কারও কোনও জবাবদিহিতা নেই। আমরা সময়ের কাছে পরাজিত। ১৯৪৯-৭০ পর্যন্ত



www.nagorikpathagar.org

সময়কালে আমরা আমাদের অর্থনীতি ও রাজনীতি মোটকথা সমাজের যাবতীয় দোষের জন্য ব্রিটিশের শোষণকে দায়ী করেছি। ইতিহাসকে দায়ী করা সবচেয়ে সোজা। ১৯৭২ থেকে নিয়ে প্রথম এক যুগ পাকিস্তানি শাসনকে দায়ী করেছি। তারপর থেকে পূর্ববর্তী সরকারকে দায়ী করা শুরু হয়েছে। শুধু ভাত খাওয়ার এবং ভোট দেয়ার জন্য তো বেঁচে থেকে লাভ নেই। বাঁচতে হলে মানুষের মতো বাঁচতে হবে। মাথা উঁচু করে বাঁচতে হবে। প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত পৌনঃপুনিক সতর্কবাণী এবং পত্রিকার হেডলাইন দিয়ে সমস্যা উতরানো যাচ্ছে না। আরও কিছু জোরালো প্রচেষ্টা দরকার। এটা ভেবে আমি খুবই পীড়িত হই যে অন্যায়, শোষণ ও অসত্যের কাছে আমরা যেন এক পরাজিত জাতি।

৮.

মঙ্গলবার ৩০শে নভেম্বর ১৯৯৯ সন্ধ্যা ৮.১০ মিনিটে টেবিলে বসে যখন এই নিবন্ধ লিখছি তখন বিবিসি টেলিভিশনে সংবাদ হচ্ছিল। এক পর্যায়ে দেখলাম পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক গুজমাও জাকার্তা সফরে এসে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ওয়াহিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। সম্মানিত পাঠকগণ জানেন, বিগত দুই দশকের অধিক সময় ইন্দোনেশিয়া পূর্ব তিমুরকে দখল করে রাখে ও শাসন করে। এখন থেকে মাত্র দুই মাস আগে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে পূর্ব তিমুরে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে তারা স্বাধীনতা লাভ করে। গত ২০ বছর যাবৎ পরিচালিত পূর্ব তিমুরবাসীর সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা গুজমাও ছিলেন ইন্দোনেশিয়া সরকারের দৃষ্টিতে এক নম্বরের রাষ্ট্রদ্রোহী এবং সে কারণে তিনি প্রায় এক দশককাল বন্দীও ছিলেন। পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতার পর তিনি ইন্দোনেশিয়ার জেলখানা থেকে মুক্ত হন। অর্থনীতি, ইতিহাস ও ভূ-রাজনীতির বাস্তবতার নিরিখে, প্রেসিডেন্ট ওয়াহিদ এবং গুজমা, ঐ বৈঠকে সমস্বরে বলেন, 'পাস্ট ইজ পাস্ট, উই হ্যাভ টু লুক টু দি ফিউচার'; অর্থাৎ অতীত অতীতই এখন আমাদের সামনের দিকে তাকাতে হবে। পৃথিবীর সকলেই ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছে। আমরা যে তাকাচ্ছি না তা নয়, কিন্তু সেটা কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়। এখানেই নেতৃত্বের প্রয়োজন। ইংরেজিতে কথা আছে 'এ স্টেট্সম্যান লুকস অ্যাট দি নেক্সট জেনারেশন হোয়াইল এ পলিটিশিয়ান লুকস অ্যাট দি নেক্সট ইলেকশন; মানে, একজন রাষ্ট্রনায়ক তথা জননায়ক পরবর্তী প্রজন্মের কথা চিন্তা করেন, কিন্তু একজন রাজনীতিবিদ পরবর্তী নির্বাচনের কথা চিন্তা করেন। আমাদের প্রেক্ষাপটে জেনারেশনের কথা তো বাদই দিলাম, এমনকি ইলেকশনের কথাও বাদ দিতে বাধ্য হচ্ছি; কারণ আমরা বাই-ইলেকশন নিয়ে ব্যস্ত! একুশ শতকে নতুন করে জীবনযুদ্ধ শুরু করতে হবে। তার জন্য চাই উপযুক্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রনায়কোচিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব।

দৈনিক যুগান্তর ০১/০২/২০০০



www.nagorikpathagar.org

# একের ভেতর চার ও স্বাধীনতা দিবসের অন্যান্য ভাবনা

প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবস এলেই বিশেষভাবে মনে পড়ে মুক্তিযুদ্ধের কথা, সহমুক্তিযোদ্ধাদের কথা এবং অনিবার্যভাবেই প্রসঙ্গ এসে যায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে কি পাওয়ার কথা ছিল, কি পেয়েছি, কি পাই নাই সেসব কথা। আমি একটি বেসরকারি গবেষণা সংস্থার থিংক ট্যাঙ্কের সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকেই জড়িত। গত বছর ১০ এপ্রিল এই সংস্থার উদ্যোগে একটি গোলটেবিল বৈঠক আয়োজিত হয়েছিল। ১১ এপ্রিল প্রধান পত্রিকাসমূহে এর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি'। পরের দিনে ৭টি বাংলা দৈনিকে প্রকাশিত সংবাদের শিরোনাম আমি উল্লেখ করছি। দৈনিক সংবাদ : 'সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের জন্য দায়ী রাজনীতিবিদ, আমলা ও ব্যবসায়ীদের অসুস্থ প্রতিযোগিতা'। ভোরের কাগজ : '২৭ বছরে সবচেয়ে মারাত্মক অবনতি ঘটেছে শাসন ব্যবস্থায়।' মানবজমিন : 'মানুষের স্বার্থে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ।' যায় যায় দিন : 'বড় বিষয়গুলোতে সমঝোতা হলে এই দুর্ভাগ্য হতো না।' ইনকিলাব : 'স্বাধীনতার ফল ভোগ করছে জনবিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী, জনগণ রয়েছে বঞ্চিত।' দৈনিক সংগ্রাম : '২৮ বছরে জাতির প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থতার জন্য রাজনৈতিক অদূরদর্শিতাই দায়ী। এখন প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যের।' প্রথম আলো : 'স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী রাজনৈতিক অদূরর্শিতা ও অনৈক্য।' সুধী পাঠক, শিরোনাম থেকেই বুঝতে পারছেন যে, আলোচনা কোন ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। ওই আলোচনা সভায় আমি একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম এবং ওই প্রবন্ধের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ দুই/তিনটি পত্রিকায় হুবহু উদ্ধৃত করেছিল। আমি ওই ক্ষুদ্র অংশটি পুনরায় উদ্ধৃত করছি। 'এখন সময়ের ডাক হচ্ছে জাতীয় সমঝোতার। সব ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর অংশ যার যার ভুলগুলো স্বীকার করুক। প্রয়োজনে এই ভুলের জন্য ক্ষমা চাক। এরপর আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করব। কারণ মানুষেই ভুল করে। ভুলের জন্য অনুশোচনা ও ক্ষমা প্রার্থনায় কোন লজ্জা নেই।' এখন থেকে সাড়ে ১১ মাস পূর্বে যে নতুন শতাব্দীর কথা বলছিলাম, আমরা সেই নতুন শতাব্দীর প্রায় তিন মাস শেষ করছি। কিন্তু জাতীয় সমঝোতার কোনও লক্ষণ নেই। আমি নিজেও বুঝি সমঝোতা অর্জন কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়।

সমঝোতার প্রধান বিষয়গুলো কিন্তু বস্তুগত বা অভ্যাসগত নয়। এগুলো বিশ্বাস ও অনুভূতি সম্পর্কিত। এই প্রবন্ধের শিরোনামে লেখা আছে একের ভিতর চার। প্রশ্ন হচ্ছে সেই এক কি জিনিস, সেই চার কি জিনিস। উত্তর হচ্ছে-সেই এক হচ্ছে আমি আর চার হচ্ছে আমার চার পরিচয়। সেই চার পরিচয় কি? আমি বাঙালি, আমি বাংলাদেশী,



www.nagorikpathagar.org

আমি মুসলমান এবং আমি মুক্তিযোদ্ধা। আমার কোনও একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী বন্ধু হলে বলতেন : আমি হিন্দু, আমি বাঙালি, আমি বাংলাদেশী, আমি মুক্তিযোদ্ধা। আমার প্রজন্মের অনেকেই এবং পরবর্তী প্রজন্মের সকলেই মুক্তিযোদ্ধা নয়। তাদের জন্য প্রযোজ্য তিন পরিচয়। যথা-হিন্দু অথবা মুসলমান, অবশ্যই বাঙালি এবং বাংলাদেশী। আমাদের জাতীয় জীবনে সমঝোতার অন্যতম অন্তরায় হচ্ছে বাঙালি না বাংলাদেশী এই নিয়ে বিতর্ক এবং হিন্দু এবং মুসলমান বলা যাবে কি যাবে না এই নিয়ে বিবাদ। অতএব পরিচয়গুলোর ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আমার জন্ম চট্টগ্রামের এক গ্রামে : তখন ছিল নিভৃত অনগ্রসর বর্তমানে বর্ধিষ্ণু। আমি যখন জন্মগ্রহণ করি তখন রেওয়াজ মোতাবেক বাড়ির আঙিনায় দাঁড়িয়ে আজান দেয়া হয়েছিল এবং আমার কানের মধ্যে ফুঁ দিয়ে আজানের বাণী ও কলেমা পড়া হয়েছিল। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজকে এবং আমাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছিল যে, আমি মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি। জন্মে আমার কোনও হাত ছিল না। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহতায়ালার হুকুমেই আমার পিতা-মাতার ঘরে আমি জন্মেছি এবং আনন্দের সঙ্গে এ পর্যন্ত ওই বিশ্বাস নিয়ে আছি। বুদ্ধি হওয়ার পর, লেখাপড়া করার পর বিশ্বাসের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। আমাদেরই গ্রামের দক্ষিণাংশে ছিল বড় হিন্দুপাড়া। ওই পাড়ায় জন্মগ্রহণ যারা করত তাদের জন্মের সময় উলুধ্বনি দিয়ে কাঁসা বাজিয়ে মন্ত্র জপে তাদেরকে হিন্দুধর্মে বরণ করা হত এবং তারা খুশি মনেই সেই বিশ্বাস নিয়ে বড় হয়েছেন, বেঁচে আছেন, যাবতীয় জাগতিক কর্মে অংশগ্রহণ করছেন। হিন্দু হই বা মুসলমান হই, সৃষ্টিকর্তা কিন্তু কাউকেই আলো-বাতাস এবং প্রকৃতির মায়া-মমতা দিতে কার্পণ্য করেননি।

জন্মের পর এক-দেড় বছর পর্যন্ত দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলতাম। তারপরে প্রথম যে কোন শব্দগুলো উচ্চারণ করা শিখেছিলাম সেটা মনে নেই। তবে নিজের সন্তানদের এবং শত শিশুকে দেখে অনুমান করি যে, প্রথম শব্দটি হয়ত 'মা' ছিল বা 'আম্মা' ছিল। তার পরের শব্দ হয়ত বা 'পানি', 'আব্বু', 'বসা', খাওয়া' ব্যথা পেলে 'উঁহু করা ইত্যাদি সম্পর্কীয় ছিল। ধীরে ধীরে বাংলা ভাষা রপ্ত করলাম এবং শিশু বয়সে মাতৃভাষা রপ্ত করাটা এত স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া যে, এটা পর্যবেক্ষণ করা খুবই কঠিন। যদিও এই বয়সেও আমি বলতে পারব না যে, আমি আমার মাতৃভাষা পুরোপুরি রপ্ত করতে পেরেছি। মাতৃভাষার কারণে আমি বাঙালি। আমি জন্মগতভাবে বাঙালি এবং বাঙালি হওয়ার জন্য আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়নি। সৃষ্টিকর্তাই আমাকে বাঙালি বানিয়েছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যেটাকে আমরা ধর্মীয় বিশ্বাস বলি সেটা (মুসলমানদের পরিভাষায় ঈমান) এবং মাতৃভাষা-এই দুটির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার কিছু ছিল না এবং এ দু'টোর ওপর আমার জন্মগত অধিকার আছে। অতএব এই দুটি নিয়ে কোনও বিবাদের অবকাশ নেই।

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এসব বাঙালি এবং কিছু অবাঙালি মিলে একদা ছিলাম পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত পাকিস্তানী হিসেবে। পাকিস্তানের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক



www.nagorikpathagar.org

কাঠামোতে আমরা সুবিচার পাইনি। পুঞ্জিভূত ক্ষোভ, বেদনা এবং প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে ২৩ বছর পেরিয়ে যায়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষি জনগণ সংঘবদ্ধ হতে থাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে এবং অধিকার আদায় করতে। বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের আহ্বান তৎকালীন মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা ইত্যাদির প্রেক্ষাপটে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করাটা কারও জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না। পাকিস্তানীদের প্রতি ক্ষোভ ও প্রতিবাদের অংশ হিসেবে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছেন। স্বজন হারানোর প্রেক্ষাপটে প্রতিশোধের সংকল্প নিয়ে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছেন। দেশের মানুষের ও মাটির টানে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছেন অনেকেই। মুক্তিযোদ্ধারা অনেক প্রকারের যথা- রাজনৈতিক মুক্তিযোদ্ধা, সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা, পরোক্ষ মুক্তিযোদ্ধা ও সমর্থক মুক্তিযোদ্ধা। কয়েক লাখ লোক যেমন-মুক্তিযোদ্ধা ছিল সে রূপ বহু লোক মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার অবকাশ থাকা সত্ত্বেও তাতে যোগ দেয়নি (তাদের মধ্যে অনেকেই এখন ভীষণ সোচ্চার) অতএব, মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া বা না যাওয়াটা ছিল কোন ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছাধীন। আমি মুক্তিযোদ্ধা সেটা আমার জন্য আনন্দের এবং গৌরবের বিষয়। কিন্তু আমার আনন্দ এবং গৌরব অন্যের জন্য বিষাদ বা নির্যাতনের কারণ যেন না হয় সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। যারা মুক্তিযোদ্ধা নন তার কারণে তারা হিন্দু বা মুসলমান হওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না। তারা বাঙালি হওয়ার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন না। মুক্তিযুদ্ধ আমরা কেন করেছিলাম? এই প্রশ্নের তত্ত্বীয় দার্শনিকভিত্তিক উত্তর দেয়া যাবে। অর্থনেতিক কারণের ভিত্তির ওপর দীর্ঘ উত্তর দেয়া যাবে। এসব উত্তর পাঠক সমাজের কাছে অতি পরিচিত। মোদ্দা কথা হল, আমরা নতুন দেশ করতে চেয়েছিলাম। পাকিস্তান থেকে বিছিন্ন হয়ে স্বাধীন হতে চেয়েছিলাম এবং নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন করতে চেয়েছিলাম। আমাদের নতুন দেশের নাম মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই স্থির করা হয়েছিল। লাখ লাখ মুক্তিযোদ্ধা বা কোটি কোটি অমুক্তিযোদ্ধা সম্মেলনে বসে নতুন দেশের নাম স্থির করে নাই। নতুন দেশের নাম স্থির করেছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং তার সঙ্গের ছাত্র এবং রাজনৈতিক নেতৃবন্দ। আপামর ছাত্র-জনতা তাদের প্রাণের উষ্ণ অনুভূতি দিয়ে নতুন দেশের নামকে বরণ করেছিল। সেই দেশের নাম বাংলাদেশ। আমরা যদি এতদঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালি বা অবাঙালি না হতাম তাহলে কখনওই বাংলাদেশের মানুষ হতাম না। বাঙালি হয়েছিলাম বলেই তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে অন্যায় এবং অবিচারের শিকার হয়েছিলাম। সেইজন্যই মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। আর সেই জন্যই বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এ কারণেই বাংলাদেশী। যে বাংলাদেশের জন্য আমরা লড়াই করলাম, লাখ লাখ লোক প্রাণ দিল সেই বাংলাদেশের পরিচয়ে বাংলাদেশী হতে কেন লজ্জা আমি বুঝি না। বাঙালি এবং বাংলাদেশী এই দুই পরিচয় একে অপরের পরিপূরক। স্ববিরোধী নয়। যারা এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে তারা অকল্যাণের কাজ করে। তারা ধ্বংসাত্মক কাজ করে। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই গর্বিত যে, আমি একজন বাঙালি মুসলমান। আমি খুবই গর্বিত যে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবার মতোই আমি একজন বাংলাদেশী। আমি আনন্দিত এবং গর্বিত যে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা।



www.nagorikpathagar.org

১০-১২ দিন আগে সংবাদপত্রে দেখলাম আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভিয়েতনামে সরকারি সফরে গিয়ে বক্তব্য রাখছেন। তারা সমঝোতা এবং সহযোগিতার কথা বলছেন। চার মাস আগে আমি বিবিসির এক সংবাদে দেখলাম পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা জানানান গুজমাও ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান ওয়াহিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন এবং উভয়েই বলেছেন যে, এখন সামনের দিকে তাকানোর সময়। অথচ, পাঠক জানেন যে, ইন্দোনেশিয়া প্রায় ২০ বা ২২ বছর পূর্বতিমুর দখল করে রেখেছিল। ১২ বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে হাজার হাজার পূর্বতিমুরি প্রাণ দিয়েছে। আট মাস নয় বরং আট বছর ইন্দোনেশিয়ার জেলে আটক ছিলেন জানানান গুজমাও। সেই গুজমাও পূর্বতিমুর স্বাধীন হওয়ার একমাস পরে সমঝোতার কথা বলেছেন। এখন থেকে ১০ দিন পূর্বে ১৯৭১ ও ১৯৭৫-এর আমেরিকা ও বাংলাদেশের আন্তঃসম্পর্ক প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ বললেন, 'এখন সামনের দিকে তাকানোর সময়।' এ কথাটা কি আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না? আমার উত্তর হচ্ছে অবশ্যই পারে যদি আমরা চাই। আমরা চাচ্ছি না কেন? সে প্রশ্নের উত্তর অনেক দীর্ঘ এবং অপ্রিয়।

৩০ বছরকে একটি প্রজন্মের মেয়াদ ধরা হয়। সেই হিসেবে স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা ১৯৭১ -এর পরে এখন তৃতীয় প্রজন্মের জন্ম হচ্ছে। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম এবং যারা মুক্তিযুদ্ধ করে নাই তাদের মধ্যকার সংঘাতের কারণে কি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হতেই থাকবে? এই বিভেদ কি পরিহার করার কোনও উপায় নেই? আমার উত্তর হচ্ছে, আছে। আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে সম্মানের সঙ্গে। এখন সংগ্রাম করতে হবে কিভাবে পৃথিবীর দরিদ্র দেশ না হওয়া যায়, কিভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ না হওয়া যায়, কিভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ না হওয়া যায়, কিভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে অদক্ষ না হওয়া যায়। এখন সময় এসেছে নিজেদের গত ৩০ বছরের অকর্মণ্যতা, অদক্ষতা ও দুর্নীতির জন্য অনুশোচনা করা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের কারণে বাংলাদেশ যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার থেকেও অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আমেরিকার কারণে দক্ষিণ ভিয়েতনাম, জাপানের কারণে কোরিয়া ইত্যাদি। সেই কোরিয়া এবং ভিয়েতনাম এখন কোথায়? অন্যকে দোষ দেয়ার প্রবণতা বন্ধ করে সময়ের আয়নায় নিজেদের চেহারা একবার দেখা উচিত। আমার মনে হয় এতে উপকার হবে। নতুন শতাব্দিতে এমনিতেই মানুষ ভবিষ্যৎমুখী। যুব সমাজের একটা অংশের মধ্যে উন্নতির আগ্রহ দর্শনীয়। বেঁচে থাকার জন্য তারা সংগ্রাম করতে আগ্রহী। যারা বয়স্ক তাদের উচিত কনিষ্ঠদের সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়া। পল্টন ময়দানের গরম গরম বক্তৃতার বদলে এই কথাগুলো সুন্দরভাবে ওয়েব সাইটের মাধ্যমে বলা। তাহলে ইতিহাসও লেখা হবে, সামনের দিকেও এগুনো যাবে।

দৈনিক যুগান্তর ২৬/০৩/২০০০ইং



www.nagorikpathagar.org

# সামনে অন্ধকার সিঁড়ি আলো জ্বলবে কবে?

বিজয় দিবস মানে গৌরবের দিবস, স্মৃতি রোমন্থনের দিবস এবং কিঞ্চিৎ হলেও আত্মমূল্যায়নের দিবস। অতএব, আমার এ নিবন্ধটি ঐ তিনটি বিষয়কে স্পর্শ করবে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বা সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য 'গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড' বা বীরত্বের জন্য খেতাব দেয়া হয়। সর্বোচ্চ খেতাব হচ্ছে বীরশ্রেষ্ঠ। সাতজন যোদ্ধা এ উপাধি পেয়েছিলেন, তবে প্রত্যেকের ক্ষেত্রে উপাধিটি ছিল মরণোত্তর। বীরশ্রেষ্ঠ উপাধি পাওয়ার মতো সাহসিকতা দেখিয়েও জীবিত থাকবেন বা আছেন–এমনটি না হওয়া কিছুটা আশ্চর্যজনক এবং অবশ্যই এই অভাব মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ও গৌরবকে ম্লান করে। জ্যেষ্ঠতার দিক থেকে দ্বিতীয় উপাধি হচ্ছে বীরউত্তম। মুক্তিযুদ্ধের বেশিরভাগ সেক্টর কমান্ডারই এই উপাধিতে ভূষিত হন। এরা ছাড়াও কতিপয় মুক্তিযোদ্ধা এই উপাধি পেয়েছেন কিন্তু তাদের সংখ্যা অনেক কম।

খেতাবের জ্যেষ্ঠতায় তৃতীয়টি হচ্ছে বীরবিক্রম। বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এ খেতাব পেয়েছেন। কিন্তু সে সংখ্যাও আশানুরূপ নয়। খেতাবের মধ্যে কনিষ্ঠ হচ্ছে বীরপ্রতীক। সর্বমোট তিনশ'রও বেশি মুক্তিযোদ্ধা এ উপাধি পান। কিন্তু এ সংখ্যাও অতি নগণ্য। গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বা মাধ্যমে সচেতন মুক্তিযোদ্ধারা এ কথা বারবার বলে এসেছেন, মুক্তিযুদ্ধকালের ক্রটিপূর্ণ বা দুর্বল পর্যবেক্ষণ-পদ্ধতি ও রিপোর্টিং পদ্ধতির জন্য বহুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার অসীম সাহসিকতাপূর্ণ কর্মকাণ্ড কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত হতে পারেনি। তাই বিশেষত গণবাহিনীর সদস্যদের বা দেশের ভেতরে শহরে-গ্রামেগঞ্জে যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধারা বহুসংখ্যক খেতাব পাওয়ার মতো কাজ করে থাকলেও খেতাব পাননি। তবে হ্যাঁ, আত্মসম্মানে বলীয়ান মুক্তিযোদ্ধারা কেবল এ কথা মনে করেই সন্তুষ্ট যে, আমরা তো খেতাবের জন্য মুক্তিযুদ্ধে যাইনি।

খেতাব নিয়ে আরও একটি বিতর্ক, হালকা হলেও মাঝে-মধ্যে শোনা গেছে। সেটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতার জন্য খেতাব এবং মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ অন্যান্য এলাকায় সামরিক অপারেশনে সাহসিকতার জন্য প্রদত্ত খেতাব। স্বাধীনতার পর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, খেতাবগুলো হবে অভিন্ন। সাহসের প্রকৃতি এবং জীবনের মূল্য অভিন্ন হলেও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ও আবেগ অন্যান্য অপারেশন সংশ্লিষ্ট গৌরব ও আবেগ থেকে ভিন্নতর। এখন (২০০০ সাল) ব্যক্তিগত পরিচয় ও স্মৃতিশক্তির কারণে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা গেলেও কয়েক বছর পর এই পৃথকীকরণ অসম্ভব হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে এখনও কর্মরত আছেন অল্প কিছুসংখ্যক



www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তি,যারা মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত এবং বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তি যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অপারেশনে খেতাবপ্রাপ্ত। এ বিষয়ে দেশবাসীর কাছে আলাদাভাবে চিহ্নিত হওয়ার নিয়ম আর নেই এবং বোধকরি করার অবকাশও নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উদাহরণ মাত্র সেখানে সেনা সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধের সময়ের মতোই কষ্ট করেছেন এবং প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে কর্তব্য পালন করেছেন। এর কোন বিকল্প ছিল না। সাহসী ব্যক্তিদের সম্মান জানানোরও বিকল্প নেই। তবে শুধু উপাধিগুলো ভিন্নতর হতে পারত।

১৯৭১ সালের ১৪ এপ্রিল মাধবপুরে শত্রুর বিরুদ্ধে সুবেদার আবদুল করিম অথবা মে মাসের ২০ তারিখে সকাল ৬টায় তেলিয়াপাড়া চা-বাগানে নায়েব সুবেদার আবদুল মালেক অথবা জুন মাসের ১৬ তারিখে বিকেল ৫টায় রাজনগর গ্রামে ল্যান্স নায়েক মোহাম্মদ মোস্তফা যে সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন,অনুরূপ সাহসিকতা পার্বত্য চট্টগ্রামেও প্রদর্শিত হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর '৭১-এ আমরা বিজয় অর্জন করে স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়েছি। পার্বত্য চট্টগ্রামে সেই স্বাধীনতার পতাকাকে এবং স্বাধীন দেশের মাটিকে রক্ষা করেছি।

একটি উদাহরণ দিই : ১৯৮২ সালের ২১ ও ২২ জুনে রাত আনুমানিক ৩টা ৪৫ মিনিটে শান্তিবাহিনী আমাদের রাঙ্গামাটি জেলার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত আন্ধারমানিক সীমান্ত ফাঁড়ির বা বিওপির ওপর সশস্ত্র আক্রমণ করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা ফাঁড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। বিওপির বিডিআর জোয়ানরা যত শীঘ্র সম্ভব পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ব্রিটিশ প্রস্তুত ৬টি এলএমজির মধ্যে ৪টি বিকল হয়ে যায়। ওই সময় ঘটনাক্রমে জনৈক সিপাহী আরমোরার (নম্বর ২২৯৫৯) মোস্তাফিজুর রহমান নিয়মিত ত্রৈমাসিক হাতিয়ার পরিদর্শনের জন্য আন্ধারমানিক বিওপিতে উপস্থিত ছিলেন। (অর্থাৎ মোস্তাফিজ ওই বিওপির নিয়মিত সৈনিক ছিলেন না।) প্রচণ্ড গোলাগুলির মধ্যেও মোস্তাফিজ নিজ কর্তব্যে সচেতন থেকে সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রত্যেকটি পোস্টে গিয়ে বিকল হাতিয়ারগুলো সচল করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এভাবে কয়েক ঘণ্টা অবিরাম উভয় পক্ষের গোলাবর্ষণের এক পর্যায়ে বিডিআর জোয়ানদের বরাদ্দকৃত গুলি শেষ হয়ে যায়। তখন সিপাহী আরমোরার মোস্তাফিজ নিজের আগ্রহে, অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে গুলি-ভাণ্ডার থেকে গুলির বাক্স মাথায় নিয়ে পোস্টগুলিতে পৌঁছে দিতে থাকেন। একপর্যায়ে শান্তিবাহিনীর একজন সদস্য মোস্তাফিজের মাথায় গুলি করে। মোস্তাফিজ তৎক্ষণাৎ শাহাদাত বরণ করেন।

বিডিআরের তৎকালীন রাঙ্গামাটির সেক্টর কমান্ডার, রাঙ্গামাটির তৎকালীন ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর রশিদ খান, চট্টগ্রামের তৎকালীন জিওসি মেজর জেনারেল মান্নাফ এবং তৎকালীন সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদ– প্রত্যেকেই তাকে বীরউত্তম উপাধিদানের সুপারিশ করেছিলেন। আমি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রণাঙ্গনের সব শহীদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সব শহীদের প্রতি এই বিজয় দিবসে সম্মান জানাচ্ছি।



www.nagorikpathagar.org

এই যে সাহসিকতা– স্বাধীনতা অর্জন ও স্বাধীনতা রক্ষায় এটা তুলনাহীন। কিন্তু এটুকু বললেই কি যথেষ্ট'?

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পত্রিকা দৈনিক যুগান্তর। জনসমক্ষে এটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখ মঙ্গলবার। আমি সেই তারিখের পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত তিনটি সংবাদ বা শিরোনামের ওপর মন্তব্য করব। প্রধান শিরোনাম ছিল–'সামনে অন্ধকার সিঁড়ি : সংঘাতের পথে এগিয়ে চলেছে দেশ।' প্রথম পৃষ্ঠারই দ্বিতীয় কলামে ছোট্ট শিরোনাম ছিল– 'রাজউক শুধু স্বপ্নের কথাই শোনাচ্ছে।'প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে নিচে আরও একটি শিরোনাম ছিল– 'ক্ষমাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীদের এখনও বিচার সম্ভব।' প্রথম আলো লিখেছিল–'সীমাহীন রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশের প্রাণশক্তিটুকু নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ প্রতিপক্ষের প্রতি পোষণ করছেন গভীর অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা। সংঘাতের পথ ছেড়ে সমঝোতার পথে আসার আগ্রহ রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছে বলে জনগণ আর বিশ্বাস করতে পারছে না। দেশের মঙ্গলের কথা, দুঃখী মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের কথা, তরুণদের কর্মসংস্থানের কথা ভেবে দেখার অবসর নেই তাদের.....। রাজনীতিতে অবিশ্বাস,অস্থিরতা ও সংঘাতের নির্মম অভিজ্ঞতা নিয়েই নতুন শতাব্দীর প্রথম মাসটি অতিক্রান্ত হল। অন্ধকার বিদীর্ণ করে আলোর রেখা নেই। অভয়বাণী উচ্চারণ করে বেহাল জাতির হাল ধরার কেউ নেই। ১২ কোটি বাঙালির সব চাওয়া-পাওয়া,সব স্বপ্ন যেন ঘন কুয়াশায় হারিয়ে গেছে। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আশার আলোকবর্তিকা জ্বালবার কথা কেউ বলছেন না। শুধু শোনা গেল : 'সাবধান! সামনে অন্ধকার সিঁড়ি।' রাজউক কর্তৃক জনগণকে স্বপ্নের কথা শোনানোর একটি দীর্ঘ সংবাদও যুগান্তর করেছিল। আমি এ মুহূর্তে এটি রূপক অর্থে নিতে চাই। ঢাকার পল্টন ময়দানই বলুন, চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দান বা খুলনার শহীদ হাদিস পার্কটির কথাই বলুন, এসব জায়গায় স্থাপিত রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বহু স্বপ্নের কথা নেতৃবৃন্দ দেশবাসীকে শুনিয়েছেন এবং শোনাচ্ছেন গত ২৯ বছর ধরে। সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে দেশবাসী নেতৃবৃন্দের জন্য মিছিল করেছে, শ্লোগান দিয়েছে, বুকের রক্ত দিয়েছে, ভোট দিয়েছে এবং তাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নেতৃবৃন্দ কিন্তু জনগণকে দেখানো স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি। নেতৃবৃন্দ যে চেষ্টা করেন না তা নয়; কিন্তু সেই চেষ্টা পর্যাপ্ত নয় এবং সেই চেষ্টা রাজনৈতিক ও ব্যক্তিস্বার্থে কলুষিত। রাজনীতি একটি পেশা এবং সেই পেশার ভোক্তা ও সেবাগ্রাহক হচ্ছে দেশের জনগণ। কিন্তু জনগণের সার্বিক সমস্যার মূল্যায়ন নেতৃবৃন্দ কোন সময়েই করেন না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের মূল্যবান সময়ের কিছু অংশ প্রতিপক্ষের নিন্দায়, কিছু অংশ কাটে ইতিহাস চর্চায়, কিছু অংশ কাটে নিজের নির্বাচনী এলাকার ভোট ঠিক রাখতে, হয়তো কিছু অংশ কাটে দুষ্টের লালন-পালনে, কিছু অংশ কাটে দেশবাসীকে স্বপ্নের আশ্বাসের বুলি শোনাতে, কিছু অংশ কাটে মিছামিছি জনতুষ্টিতে এবং ক্ষুদ্র একটি অংশ কাটে



www.nagorikpathagar.org

প্রশাসনে বা জনকল্যাণে। এরকম প্রহসন আর কতদিন চলবে? কোনক্রমেই কি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আলোকবর্তিকা নিয়ে কেউ জাতির সামনে দাঁড়াবে না অন্ধকার সিঁড়িকে আলোকিত করতে? এরকম কেউ কি এই ভূখণ্ডে নেই? আমার মনে হয় আছে। সবাই মিলে যদি একটু খোঁজ করি, তাহলে হয়তো তার সন্ধান পেতেও পারি। একদলে না থাক, সব দল খুঁজলেও তো দু-চারজন করে পেতে পারি। পেতেই হবে, না হলে আমরা বঙ্গোপসাগরে হারিয়ে যাব। এর জন্য সামনের দিকে তাকাতে হবে, পেছনের দিকে নয়। বাংলাদেশে বর্তমানে যাদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছর তাদের জিজ্ঞেস করুন, তারা কি চায়? তারা ইতিহাসের জন্য সময় কতটুকু ব্যয় করতে এবং ভবিষ্যৎ আবিষ্কারের জন্য সময় কতটুকু দেবে? অসমাপ্ত কোন কিছুই ভাল নয়।

বিদেশী লেখক লরেঞ্জ লিফ্থ শুলফ 'বাংলাদেশ আনফিনিশ্ড রিভলিউশন' নামে একটি বই লিখেছেন। এ বইয়ের প্রেক্ষাপট হচ্ছে, কর্নেল তাহের, জাসদ ও সৈনিক রাজনীতি এবং ১৯৭৫-৭৭-এর ঘটনাবলী। কিন্তু আমি এটাকে বলতে চাই আনফিনিশড ক্রিয়েশন। যদি আমাদের বিজয় পুরোপুরি আমরা অর্জন করতাম– তাহলে সে মূল্য আমরা রক্ষা করতে পারতাম। মাত্রার চেয়ে বেশি আদর করলে বাপের জায়গা চাচার দখল করে নেয়ার সম্ভাবনা থাকে। নিরীহ গ্রামবাসী যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী নয়, কিন্তু তারাও সংকটে পড়লে প্রয়োজনে রুখে দাঁড়াতে পারে। শত্রুকে করতে পারে পরাস্ত। কিন্তু যদি তারা তা না পারে তবে তো সমস্যা থাকবেই। সেক্ষেত্রে সমস্যাবলীর দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসার চিন্তা আমাদের করতেই হবে। দেশে যদি একটি গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, পরিস্থিতি যদি হয় সোমালিয়া, কঙ্গো, ভিয়েতনাম বা আফগানিস্তানের মতো তখন কি হবে? কিন্তু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষতো এমন কখনও চাইতে পারেন না। এ পথে কি শান্তি আসতে পারে? 'যুদ্ধ করব' 'যুদ্ধ করব' বলা খুব সহজ, কিন্তু আসলে করাটা কঠিন। ১৯৭১ তার প্রমাণ। আরও যারা যুদ্ধে যেতে পারত তাদের অনেকেই কিন্তু যায়নি। অনেক বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তি সময়ক্ষেপণ করেছেন এবং রণাঙ্গন থেকে দূরে থেকেছেন। বাঙালি ভাইয়েরা বলি আর বাংলাদেশী ভাইয়েরা বলি, চিন্তা করুন- এই কল্পিত যুদ্ধের বিকল্প হচ্ছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মতো নতুন কোন পন্থা বাস্তবায়ন করা। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বকে পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত, পরিশীলিত করে জাতীয় সরকারের রূপ ও কাঠামো নির্মাণ করা যায় কিনা তাই চিন্তা করুন।

এই রচনায় যে তৃতীয় বিষয়টির ওপর আলোচনা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে। তবে, বিযয়টিকে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করাই ভাল। ওই জন্য এ মুহূর্তে আর করছি না। দেশবাসীর প্রতি বিজয় দিবসের সম্ভাষণ এবং ১১ দিন পর সমাগত পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা।

দৈনিক যুগান্তর ১৬/১২/২০০০



www.nagorikpathagar.org

# গৌরবের মুক্তিযুদ্ধ ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা

১ জানুয়ারী ২০০১ প্রথম আলো পত্রিকার ৭নং পৃষ্ঠায় মেজর জেনারেল মঞ্জুর রশিদ খানের লেখা 'গাড়ি ভাঙচুর ও একটি অভিজ্ঞতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়তে পড়তে মনে হলো, জনগণের উদ্দেশে বা ছাত্রদের উদ্দেশে কেনো বড়মাপের নেতাকে গত ১০ বছর কোনো জনসভায় বলতে শুনিনি (তথা বলেছেন বলে পত্রিকায় পড়িনি) যে, গাড়ি ভাঙচুর করবে না, এতে দেশের ক্ষতি, দশের ক্ষতি। দেশের ভিতরে যেকোনো ব্যক্তি কর্তৃক একটি গাড়ি কেনা হয় বাংলাদেশী টাকায়, কিন্তু গাড়িগুলো বিদেশ থেকে যখন আমদানি হয় তখন তার মূল্য পরিশোধিত হয় কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে। গাড়ির যত খুচরা জিনিস এগুলোও বিদেশ থেকে আমদানি হয় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে। অতএব ঢাকা মহানগরীর রাজপথে গাড়ি ভাঙার অপর নাম বাংলাদেশের কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পানিতে ফেলা। বিশিষ্ট উচ্চ স্থানীয় নেতৃবর্গ প্রায়ই বলেন যে, তারা জনগণের ভোটের ও ভাতের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করছেন। তাহলে গাড়ি যেন না ভাঙে, অর্থাৎ গাড়ি ভাঙার আক্রমণ থেকে নিরীহ গাড়ি মালিকদের রক্ষা পাওয়ার যে অধিকার সেজন্য কি কেউ সংগ্রাম করবেন না ? আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। এর জন্য সরকারের রয়েছে বিভিন্ন বিভাগ ও বাহিনী। সাধারণ একজন নিরীহ নাগরিক তার নিরাপত্তার জন্য আইনত সরকারকে দায়ী করতে পারে। উন্নততর বা সভ্যতর কোনো দেশে এরকম হলে এতদিনে অবশ্যই সরকারকে বিবাদী করে ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করা হতো। আমাদের দেশে জান ও মান হারানোর ভয়ে এটা কেউ করেন না।

সকালে উঠে দু'একটি পত্রিকায় চোখ না বুলালেই নয়। প্রথম আলো উল্টো-পাল্টা করতে গিয়েই মেজর জেনারেল মঞ্জুর রশিদের নিবন্ধটি পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও রাষ্ট্রদূত ফারুক চৌধুরীর লিখিত 'নতুন বছরের দুর্ভাবনা' নিবন্ধটিও পড়লাম। দুটো নিবন্ধেই জাতীয় আঙ্গিকে কিছুটা আত্মসমালোচনার সুর আছে, আক্ষেপ ও অভিমানের সুর আছে। আমি ফারুক চৌধুরীর নিবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদ থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করছি : "অথচ কোনো কারণই ছিল না আমাদের এই দুঃসহ অবস্থায় নিপতিত হওয়ার। বন্যার জলে ভেসে এসে পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদয় হয়নি বাংলাদেশের। বাংলাদেশের ইতিহাস এই ভূখণ্ডের মানুষের হাজার বছরের অনুভূতি-অভিজ্ঞতার ইতিহাস। এই হাজার বছরে আমাদের জাতীয়তাবোধের স্রোতধারা কখনো দুর্বল ক্ষীণকায় অবয়বে, কখনো বা 'দারুণ রোষে' গর্জে উঠে অবশেষে আত্মপ্রকাশ করেছিল সার্বভৌম বাংলাদেশের মোহনায়। সব কিছু পেয়েও



www.nagorikpathagar.org

আমরা যেন তলিয়ে না যাই, হারিয়ে না পড়ি....এই রইল একজন প্রবীণ নাগরিকের ঈদ-উল-ফিতর আর বর্ষশেষে নতুন বছরের ঐকান্তিক মোনাজাত।"

ফারুক চৌধুরী নিজেও মুক্তিযোদ্ধা, আমিও মুক্তিযোদ্ধা। এ দেশের দুর্দশায় যারা ব্যথিত তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা। কী রকম দেশের জন্য কী রকম সমাজের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম এবং গত ৩০ বছরে কী রকম দেশ বা সমাজ পেলাম সেটাই বারবার প্রশ্ন করি। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাসে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা কতজন ছিলেন জানি না। হয়তো-বা দেড় থেকে ২ লাখের মধ্যে হবে। অস্ত্র ছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন হবেন হয়তো-বা আরো ২ থেকে ৪ লাখ। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দোয়া করেছেন, পরোক্ষভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন এমন হয়তো বা হবেন ৪০ থেকে ৫০ লাখ। এই তিন প্রকারের ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে কতজন সরাসরি গত ৩০ বছর বাংলাদেশের ভাগ্যোন্নয়নের সঙ্গে জড়িত আছেন বা ছিলেন?

আর ১৫ দিন পর আমেরিকার প্রশাসন বদলে যাবে। চার সপ্তাহ আগে থেকে বুশ সাহেব প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ২৯ বছর আগে, ১৯৭১-এর ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহের বাংলাদেশের কথা চিন্তা করুন। মহানগরীর তোপখানা রোডে এখন যেখানে সচিবালয়, সেখানেই সচিবালয় ছিল (দু'একটি অতি উচ্চ দালান ছাড়া) তখনকার আমলেও প্রাদেশিক সরকারের সচিব ছিলেন, যুগ্ম সচিব ছিলেন, উপসচিব ছিলেন এবং সেকশন অফিসার (এখনকার সহকারী সচিব) মহোদয়গণ ছিলেন। ডিসেম্বরের ১৬ তারিখ, বৃহস্পতিবার একটি কার্যদিবস ছিল। ওইদিন সকাল ৯টায় যারা এই সচিবালয়ে গিয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের কর্মকর্তা ও কর্মচারী হিসেবে, শুক্রবার ১৭ ডিসেম্বর সকালে কাগজ-কলমে-পরিচয়ে ওনারাই হয়ে গেলেন বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা ও কর্মচারী। কারো প্রতি বিদ্বেষ বা অসম্মান জানানোর জন্য নয়, উদাহরণস্বরূপ কথাটি বললাম। পুলিশ, সামরিক বাহিনী, অন্যান্য পেশার প্রশাসন– সব ক্ষেত্রের জন্যই এ কথাটা কম-বেশি প্রযোজ্য। অতএব, ফারুক চৌধুরীর কামনার বাংলাদেশ বা আমার প্রার্থনার বাংলাদেশ কোন পথে আসবে? শুধু মোনাজাতে কি হবে?

ফারুক চৌধুরী আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। ১০/১২ বছর আগে এক কঠিন দায়িত্ব পালনকালে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছিলাম। তিনি সম্মানিত। আমার মনে হয়, আমাদের আরো কিছু কথা খোলামেলাভাবে বলতে হবে এবং তাঁর মতো প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও বর্ষিয়ান নাগরিকদেরই এ প্রক্রিয়ার সূচনা করতে হবে। বন্যার জলে বাংলাদেশ ভেসে আসেনি কিন্তু বাংলাদেশকে বন্যার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এই স্রোতধারা ক্রমশ বেগবান হচ্ছে। অমুক ভারতপন্থী বা অমুক পাকিস্তানপন্থী-এটাই শুনছি কিন্তু বাংলাদেশপন্থীরা কই ? সময় এসেছে বাংলাদেশপন্থীদের ঘুম থেকে জেগে ওঠার।

ঈদের আগে দুটো ভিন্ন খবর পড়েছিলাম। একটি খবরে ছিল জনৈক মন্ত্রী (বা প্রতিমন্ত্রী) কোনো এক অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায়



www.nagorikpathagar.org

চিহ্নিত রাজাকারের নাম দেখে তালিকাটি ছিঁড়ে ও ছুঁড়ে ফেলে দেন। দ্বিতীয় খবরটি ছিল, অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক দৈন্য লাঘব করার উদ্দেশ্যে মাসে মাসে কিছু ভাতা দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে একটি তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ভাতা প্রদান শুরু হয়েছে। বছরের শেষ দিন ৩১ ডিসেম্বরের একটি জাতীয় দৈনিকে আরেকটি সচিত্র সংবাদ ছিল এসব ভূমিহীনের ঠাঁই মিলেছে' এবং ছবিতে দুজন শ্মশ্রুমণ্ডিত অন্ততপক্ষে পঞ্চাশোর্ধ্ব মুক্তিযোদ্ধাকে দেখা যায়। যারা আশ্রয়ণ প্রকল্পে ঠাঁই পেয়েছে। এগুলো সবই টুকরো খবর। টুকরো খবর দিয়ে দেশ ও সমাজের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব না। মুক্তিযোদ্ধারা দেশ ও সমাজের জন্য কী করতে পারবে বা নিজেদের উন্নতি ও সচ্ছলতার জন্য কী করতে পারবে সেটিও একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন। উত্তর কখনই গভীরভাবে খোঁজা হয়নি। যেকোনো ভালো কিছুই যেহেতু একদম না করার থেকে দেরিতে করাও ভালো, তাই এ রকম একটি মূল্যায়ন বা অনুসন্ধান অবশ্যই করা উচিত এবং করা যায়।

ইদানীংকালে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন ১১টি সেক্টরের মধ্যে ১০টি ছিল সক্রিয়। সেক্টর কমান্ডারগণের মধ্যে কয়েকজন মৃত্যুবরণ করেছেন, কয়েকজন বেঁচে আছেন। মুক্তিযুদ্ধ তথা দেশের ইতিহাসে সেক্টর কমান্ডারগণের একটি বিশেষ অবস্থান আছে এবং সে কারণেই দেশ ও জাতির প্রতি তাদের একটি দায়বদ্ধতা এখনো থেকে যায়। সেক্টর কমান্ডারগণের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন কর্নেল কাজী নুরুজ্জামান। ১৯৪৬ সালে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া ব্যক্তিত্ব জনাব নুরুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে অবসরপ্রাপ্ত মেজর ছিলেন। ২৯-৩০ মার্চে পায়ে হেঁটে এবং যখন যা পেয়েছেন তার আশ্রয় নিয়ে তিনি ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ পৌঁছে তৎকালীন মেজর শফিউল্লাহর সঙ্গে যোগ দেন। পরবর্তীকালে নুরুজ্জামান সেক্টর কমান্ডার হন, মাঝে মধ্যে পত্রপত্রিকায় লেখেন কিন্তু কখনো কর্নেল কথাটি লেখেন না। সব সেক্টর কামন্ডারের মতো তিনিও বীরোত্তম খেতাব পেয়েছিলেন, কিন্তু এদিকে তাঁর আগ্রহ কোনোদিনই ছিল না। তাই নামের পাশে ওই কথাটিও লেখেন না। দেড় দশক আগে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এখন বয়সের ভারে ও অসুস্থতার কারণে অনেক কিছু করতে না পারলেও তাঁর মনোবল অনেক উচ্চ। তাঁর আগ্রহ ও প্রেরণায় কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা চেষ্টা করছে নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে যদি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি পুনর্মিলনী করা যায়। বহু মুক্তিযোদ্ধা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে জড়িত, বহু মুক্তিযোদ্ধা পরোক্ষভাবে জড়িত, আবার কেউ কেউ কোনো না কোনো দলের সমর্থক। কিন্তু বেশির ভাগ মুক্তিযোদ্ধা এখনো নির্দলীয়। জনাব নুরুজ্জামান চেষ্টা করছেন সবাইকে নিয়ে, অরাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আঙ্গিকে একান্তভাবেই মনের উৎফুল্লতা ও দেশপ্রেম উজ্জীবিত করার জন্য একটি পুনর্মিলনী আয়োজন করতে। বহু মুক্তিযোদ্ধা আছেন যারা গত ৩০ বছর যাবৎ কষ্টে আছেন, যাদের মধ্যে পারস্পরিক কোনো পুনর্মিলন নেই—



www.nagorikpathagar.org

এদের কথা চিন্তা করেই জামান সাহেব এ কষ্টের কাজে নেমেছেন বলে আমি মনে করি। ফ্রিডম ফাইটারস কাউন্সিল বা সংক্ষেপে এফএফ কাউন্সিল নামে একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও নির্দলীয় সংগঠনেরও তিনি প্রধান। ১৯৭১ সালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তথা ওই সরকারের প্রধান সেনাপতির অধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল মুক্তিযোদ্ধাই এই এফএফ কাউন্সিলের সদস্য হওয়ার অধিকারী। এই সংগঠনের মাধ্যমেই তিনি এ পুনর্মিলনী আয়োজন করতে চাচ্ছেন। তিনি ভালো সাড়াও পেয়েছেন বলে জানি। তবে কাজটা ঝামেলার এবং খরচের। অতএব সামলানোটা কষ্টসাধ্য হবে। আমি অনুমান করি, দেশব্যাপী ছড়ানো-ছিটানো মুক্তিযোদ্ধাগণ বিশেষত মহানগরীসমূহে অবস্থানকারী সচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাগণ বর্ষীয়ান নেতৃস্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা জনাব জামানের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন। আমরা তাঁর সাফল্য কামনা করি।

জনাব জামানের আরো একটি চিন্তার কথাও সম্মানিত পাঠকদের জানাতে চাই। রাষ্ট্রীয় সম্পদ দিয়ে তহবিল সৃষ্টি করে অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের কী পরিমাণ এবং কতদিন সচ্ছলতা দেওয়া যাবে-সেটা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। মুক্তিযোদ্ধাগণ নিজেরা কি নিজেদের জন্য সম্মিলিতভাবে কিছু করতে পারেন না?

মাত্র ২০-২২ বছর আগে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাগানো গাছগুলো এখন কত-বড় সেটা সবাই দেখছেন। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এনজিও ব্র্যাক ২৭ বছরে কত বড় হয়েছে সেটা সবাই দেখছেন। ২৩ বছরে গ্রামীণ ব্যাংক কত বড় হলো এবং কত লাখ ব্যক্তি এর থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপকার পাচ্ছেন এটাও সবাই দেখছেন। '৭২ সালে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট করা হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের উন্নতির জন্য। বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান এই ট্রাস্টের অধীনস্থ করা হয়েছিল, যাতে করে লভ্যাংশ দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মঙ্গল করা যায়। কালক্রমে এই উদ্দেশ্য সরলরেখা থেকে বহুদূরে সরে গিয়েছে। অনেকগুলো উপাত্ত এর জন্য দায়ী। তবে সবচেয়ে বড় উপাত্ত হলো অপেশাদার আমলাতান্ত্রিক ম্যানেজমেন্ট। যেকোনো শিল্পে বা ব্যবসায় বা কর্মকাণ্ডে যদি কারো শ্রম বা টাকা পয়সা বিনিয়োগ না হয় তাহলে সেটার প্রতি আন্তরিকতা আসে না। বিনামূল্যে পাওয়া জিনিস যে রাস্তায় আসে সেই রাস্তায়ই চলে যায়। যেকোনো জিনিস বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য যে ব্যক্তি কষ্ট করে, ওই জিনিস বা প্রতিষ্ঠান রক্ষা করার জন্যও তার আন্তরিকতা বেশি হয়। আমাদের দেশে গড়পরতা দেশপ্রেমের সচেতনতার মাত্রা এত উপরে নয় যে, দেশের জিনিসকে আপন মনে করে রক্ষা করবে, বরঞ্চ বেশির ভাগই 'কোম্পানির মাল দরিয়া মে ঢাল'—এই প্রবাদে বিশ্বাস করে চলেন।

যা হোক, আসল কথায় ফিরে আসি। যদি '৭২ বা '৭৪ বা ' ৭৭ বা '৮০ বা '৮৪-তেও মুক্তিযোদ্ধাদের সদস্য করে কোনো সমবায় গড়ে তোলা হতো বা মুক্তিযোদ্ধাদের পুঁজি নিয়ে কোনো শিল্প গড়ে তোলা হতো তাহলে আজকে ২০০০ সালে এসে



www.nagorikpathagar.org

মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রের কাছ থেকে ভিক্ষা চাইতে হতো না। মুক্তিযোদ্ধারা নিজেদের পরিশ্রমেই একটি শিল্পশক্তি ও সামাজিক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারতেন। কর্নেল নুরুজ্জামান ভাবছেন যে, কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা যারা এখন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি, কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা যারা মেধাবী সংগঠক ও উদ্যোক্তা এবং বহুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা যারা অর্থনৈতিক ও মেধার মানে সাধারণ—এরূপ ব্যক্তিবর্গ যদি একত্রিত হয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যতের লভ্যাংশের একটি অংশ দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে যেতে পারে।

দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সহস্র সহস্র মুক্তিযোদ্ধাও অতি নগণ্য বা নামেমাত্র বিনিয়োগ দিয়ে এতে জড়িত থাকতে পারেন। এ প্রক্রিয়ায় বিনোয়োগকারী বা অবিনিয়োগকারী উভয় প্রকারে মুক্তিযোদ্ধারা উপকৃত হতে পারেন। বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন তবুও চিন্তা করতে দোষ কী? বা চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী? আমার মনে হয়, জনাব জামান চেষ্টা করলে তাঁকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য অনেকেই এগিয়ে আসবেন। মুক্তিযোদ্ধা হলেই যে সবার বিশ্বাসভাজন হবেন এমন কথা নেই, কিন্তু জনাব জামান এখনো মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বিশ্বাসভাজন আছেন।

দৈনিক প্রথম আলো ০৬/০১/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

# শহীদ বদিউজ্জামান, সেলিম এবং অজানাদের স্মৃতি ভোলা যায় না

ডিসেম্বর মাস এলেই মনে আসে বিজয় দিবসের কথা। এর পিঠেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধা শহীদের কথা। দুদিন আগে ৩ ডিসেম্বর ছিল শহীদ লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান বীর প্রতীক-এর মৃত্যু দিবস। অবশ্যই ওই দিনে সমগ্র বাংলাদেশে আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন, এমনকি আমার সাহচর্যের কয়েকজনও আমার সামনেই শহীদ হন। তবু শুধু বদিউজ্জামানের নামটি মনে এল দুটি কারণে। প্রথম কারণ, ১৯৭০ সালে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমি কাকুলে কমিশন পূর্বক প্রশিক্ষণের সময় বদিউজ্জামান এবং আমি সহপাঠী ছিলাম। দ্বিতীয় কারণ, ৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যার একটু আগে যখন বদিউজ্জামান শহীদ হন সেদিন তিনি ছিলেন রেল লাইনের পূর্ব পাশে বিন্যস্ত 'বি' কোম্পানির অধিনায়ক এবং আমি ছিলাম রেল লাইনের পশ্চিম পাশে বিন্যস্ত 'সি' কোম্পানির অধিনায়ক। বদিউজ্জামান এবং আর এক মুক্তিযোদ্ধা লে, সেলিমের স্মৃতিচারণ করে সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধার প্রতি আমি সম্মান জানাচ্ছি।

বদিউজ্জামান ১৯৪৯ সালে গোপালগঞ্জ জেলার কাশিয়ানী থানার নাটো গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা একজন পুলিশ অফিসার ছিলেন। ছাত্রজীবনে বদিউজ্জামান তুখোড় ছাত্রনেতা ছিলেন। একাত্তরের মার্চ মাসে পাকিস্তানিরা তাকে রংপুর সেনানিবাসে আরো বাঙালি অফিসার ও সৈনিকের সঙ্গে আটক করে। জুন মাসে তিনি পালাতে সক্ষম হন এবং বহু জায়গা ঘুরে, নির্দেশমতো আগস্টে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন।

আমরা ছিলাম দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অংশ। এটি ছিল 'এস ফোর্সের অংশ এবং এস ফোর্স ছিল একটি ভারতীয় পদাতিক ডিভিশনের অধীন। আমরা অবস্থান নিয়েছিলাম আখাউড়া রেল স্টেশনের অল্প উত্তরে আজমপুর স্টেশন চতুর্পাশ জুড়ে। আমাদের মুখ ছিল আখাউড়ার দিকে। আখাউড়াতে তখন প্রতিরক্ষা অবস্থানে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১২ এফএফ রেজিমেন্ট। মজার ঘটনা ছিল, ১২ এফএফ রেজিমেন্টের তৎকালীন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল কাইয়ুম তার দুবছর আগে মাত্র আমাদের দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টেরই অধিনায়ক ছিলেন। ওই ডিসেম্বরে আমাদের অধিনায়ক মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী এক সময় কর্নেল কাইয়ুমের অধীনেই চাকরি করেছিলেন।

তখন মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্ব। ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তি বাহিনী সম্মিলিতভাবে দেশের সম্পূর্ণ সীমান্তে হানাদার দখলদার বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাচ্ছিল। ৪ ডিসেম্বর অতি প্রত্যুষে ১২ এফএফ রেজিমেন্ট গোলা-বারুদ ও সাজ-সরঞ্জাম সব ফেলে আখাউড়া



www.nagorikpathagar.org

থেকে পলায়ন করে। পলায়নের সময় খণ্ডযুদ্ধে কিছু পাকিস্তানি সৈনিক মারা যায়। আরো কিছু পাকিস্তানি সৈনিক মারা যায় তিতাস নদী পার হতে গিয়ে। আখাউড়ার পশ্চিম পাশ দিয়েই বয়ে গেছে তিতাস নদী। ওই সময়ে অস্ত্র হাতে সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৩০ হাজারের বেশি ছিল। দেশের ভেতরে যুদ্ধরত সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যাও অর্ধ লাখের কাছাকাছি ছিল। লে. বদিউজ্জামানের নাম কলমে নিয়েছি কিন্তু আরো শত-সহস্র মুক্তিযোদ্ধা প্রাণ দেওয়ার জন্যই প্রস্তুত হয়ে যুদ্ধরত ছিল। অথচ গত দুতিন বছর আগে হঠাৎ করে ঢাকা শহরে ক্ষমতাসীন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বলা শুরু করলেন যে, অস্ত্র হাতে নিলেই মুক্তিযোদ্ধা হওয়া যায় না। কী হাতে নিলে হওয়া যায় ( যথা ঔষধের শিশি, বা সুই-সুতা দিয়ে ফুল তোলা রুমাল) এ কথা ওই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা বলেননি। আমার বন্ধু বদির কবর আজমপুরের কাছেই রামধননগর গ্রামের অধিবাসী আলী আমজাদ খানের বাড়ির পাশেই অবস্থিত। বদির সৌভাগ্য যে, গত ৩০ বছর যাবৎ শত-সহস্র মুক্তিযোদ্ধার শরীরের এবং সুনামের অপমৃত্যু দেখার জন্য সে বেঁচে নেই। তার বড় ভাই এবং ছোট ভাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যথাক্রমে একজন ব্রিগেডিয়ার এবং মেজর পদবিতে এখনো চাকরি করছেন। তৎকালীন বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রদত্ত খেতাব 'বীরপ্রতীক' লেফটেন্যান্ট বদিউজ্জামান স্মরণে ঢাকা সেনানিবাসের একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। বগুড়া সেনানিবাসে স্থাপন করা হয়েছে লেফটেন্যান্ট শহীদ বদিউজ্জামান প্যারেড গ্রাউন্ড। শহীদ বদিউজ্জামানকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে পারিবারিক পৃষ্ঠাপোষকতায় বোন হীরা নওশের (কণ্ঠশিল্পী ; এর তত্ত্বাবধানে প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে স্মরণসভা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লেফটেন্যান্ট 'শহীদ,বদিউজ্জামান স্মৃতি' পদক প্রদান করা হয়, যার মাঝে মরেও অমর হয়ে আছেন ইবনে ফজল বদিউজ্জামান। সন্তান হারানোর শোকে মা এবং বাবা দুজনই এ জগৎ ছেড়ে চিরবিদায় নিয়েছেন। অন্তহীন ব্যথা নিয়ে বর্তমানে শহীদ বদিউজ্জামানের তিন ভাই ও তিন বোন বেঁচে আছেন।

আমাদের দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টে আর একজন কোম্পানি অধিনায়ক ছিলেন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট সেলিম। রাজশাহীতে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি ছোট ভাই আনিসকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যান। দুর্দান্ত সাহসী ছিলেন। বয়সে আমার থেকে দুবছরের ছোট হলেও পুরো যুদ্ধকালটাই বন্ধুর মতো হয়ে গিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে, ঢাকা মহানগরীর মিরপুরে রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ৩০ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে লে, সেলিম শহীদ হন। ঢাকার মগবাজারে তার নামে স্কুল আছে।

ওই সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বেশির ভাগের বয়স ছিল ১৫ বছরের উপরে এবং ৩০ বছরের নিচে। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছিল, স্বাধীনতার কামনা ছিল, দেশের জন্য প্রাণ দেয়ার অঙ্গীকার ছিল। পৃথিবীর সকল যোদ্ধার মতো মুক্তিযোদ্ধারাও যুদ্ধ



www.nagorikpathagar.org

করেছিল দেশকে স্বাধীন করার জন্য, দেশবাসীকে স্বাধীন করার জন্য। তারা চেয়েছিল ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে সকলেই যেন বাংলাদেশে সুন্দরভাবে শান্তিতে বসবাস করতে পারে। পৃথিবীতে সার্বিকভাবে উন্নত একটি দেশ পেতে চেয়েছিল। আমরা দুঃখিত, যোদ্ধাদের কাজ যোদ্ধারা করলেও নেতারা ব্যর্থ। তাই আজ বাংলাদেশের এই দুরবস্থা। এরকম চলতে দেওয়া যায় না। মুক্তিযোদ্ধা এবং অমুক্তিযোদ্ধা এই বিভেদে যেমন আমি আগ্রহী নই, অনুরূপ অন্ধের মতো, বোবার মতো, অসহায়ের মতো ধুঁকে ধুঁকে মরতেও আগ্রহী নই। বাংলাদেশের প্রতি প্রেম আছে, জনগণকে ভালোবাসে এমন শক্তির ঐক্য প্রয়োজন। সৎকাজে বিশ্বাস করতে হবে, অসৎ কাজে নিরুৎসাহিত করতে হবে, তাহলেই আল্লাহও এই উদ্যোগে সহায়তা দেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশের মুক্তিযোদ্ধারা গত ৩০ বছর বিভিন্ন ষড়যন্ত্র, বঞ্চনা ও ধোঁকাবাজির শিকার হয়েছে। ১৯৭২ সালের শুরুতেই সরকারি সিদ্ধান্তে মুক্তিযোদ্ধারা ছোট ছোট গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর ভেতরে যারা ছিল তারা নিজেরা যেমন একাধিক ষড়যন্ত্রমূলক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে, তেমনি তাদের অনেকে বিভিন্ন বিদ্রোহমূলক বা বিশৃঙ্খলামূলক কর্মকাণ্ডে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক বা আবেগতাড়িত হয়ে হোক, জড়িত হয়ে পড়ে। সামরিক বাহিনীর ৯৫ ভাগ মুক্তিযোদ্ধা এখন অবসরে। সামরিক বাহিনীর বাইরের ৯৫ ভাগই অসুস্থতা ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জড়িত হয়ে এখন মুমূর্ষু। তাদের বহুজনের কাছেই চেতনার থেকে যাতনা বড়। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি নিঃশর্ত সম্মান দেখানোর একটা মাধ্যম হচ্ছে, তাদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন এবং যথাসম্ভব যেন ভিক্ষুক না হয় সেটি নিশ্চিত করা। তুলনামূলকভাবে সচ্ছল মুক্তিযোদ্ধারা সরকারি সহযোগিতায় বাকিদের জন্য কিছু করতে পারে। কিন্তু অতীতেও দেখা গেছে যে যায় লঙ্কা সেই হয় রাবণ। তাই সাধু সাবধান।

দৈনিক প্রথম আলো ০৫/১২/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

## ২. ধর্ম ও জীবন

## প্রসঙ্গ : বিশ্বশান্তির জন্য বিশ্বজনীন প্রার্থনা-সভা

প্রার্থনা করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ মাত্রই প্রার্থনায় অভ্যস্ত। পবিত্র গ্রন্থ 'কোরান'-এ একশ'টির বেশি আয়াত বা বাক্য আছে যেগুলো প্রার্থনা ও প্রার্থনা করা সম্পর্কিত এবং পৃথিবীতে বর্তমানে প্রচলিত সব ধর্মে এই প্রার্থনা করা হয় অদৃশ্য, মহাশক্তিধর সৃষ্টিকর্তার কাছে, বিবিধ নিয়মে ও নামে। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্ম যেহেতু পরম শক্তিশালী সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির সার্বিক নিয়ন্ত্রক কোন অদৃশ্য শক্তি তত্ত্বেও বিশ্বাস করে না তাই তাদের প্রার্থনা তত্ত্বটি ভিন্নতর। তবে শান্তির জন্য প্রার্থনা বা কামনা তাদের প্রার্থনার অভিধানে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। পৃথিবী নামক গ্রহে মানুষের যত বয়স, প্রার্থনা-তত্ত্বের বয়সও তত। এটা হচ্ছে ব্যক্তি পর্যায়ে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সমষ্টিগত পরিচয় দেয়ায় অভ্যস্ত হল, যথা : পরিবার, পাড়া, মহল্লা, বংশ, গোত্র, জাতি ইত্যাদি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বিভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত হয়। সব ধর্মেই কোন না কোন পদ্ধতিতে প্রার্থনা করা বিধিবদ্ধ ছিল। একই ধর্মের অনুসারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন জায়গায়, প্রার্থনার পদ্ধতিতে ছোটখাটো ব্যতিক্রম করলেও প্রার্থনার মূল দর্শন বা তত্ত্বে এক থাকত। এই কথাটা এখনও খাটে। মহান সৃষ্টিকর্তা সবাইকেই একই রকম যত্নের সঙ্গে ও একই রকম মায়া-মমতায় সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সব রকমের সুযোগ-সুবিধা, যথা– আলো, বাতাস, পানি, মাটির উৎপাদন ক্ষমতা, ফুলের সৌরভ সব মানুষের জন্য সমানভাবে প্রয়োজ্য। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি নির্বিশেষে সৃষ্টিকর্তা সব মানবজাতিকে লালন-পালন করেন। পবিত্র কোরানের পঞ্চম সূরার (সূরা আল মায়েদা) দ্বিতীয় আয়াতের দ্বিতীয় অংশ এখানে বাংলায় উদ্ধৃত করছি। "... তোমাদিগকে মসজিদুল হারামে প্রবেশে বাধা দেওয়ার কারণে কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদিগকে যেন কখনোই সীমা লংঘনে প্ররোচিত না করে; সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পর সাহায্য করিবে এবং পাপ ও সীমা লংঘনে একে অন্যের সাহায্য করিবে না: আল্লাহকে ভয় করিবে, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।" এই আয়াতে কোরানপাক এমন একটি মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞজনোচিত ফয়সালা দিয়েছে যা সমগ্র বিশ্বব্যবস্থার প্রাণস্বরূপ।

এই প্রশ্নটি হচ্ছে, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রসঙ্গে। বয়স্ক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তো বটেই, কিশোর বয়সের স্কুলছাত্রও এটা বোঝে যে, সমাজে বাস করা মানেই একজন আরেকজনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা। এই কথাটা অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্মতত্ত্ব সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সম্মানিত প্রায় সব পাঠকই স্বীকার করবেন যে, মৃত্যুর পরও মানুষ



www.nagorikpathagar.org

জীবিতদের শুভেচ্ছার প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে। তাছাড়াও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কথাটা পরিবারসমূহের মধ্যে, গ্রামসমূহের মধ্যে, জাতিসমূহের মধ্যে এবং দেশসমূহের মধ্যে প্রযোজ্য। তবে, এই কথার একটা ভিন্ন দিক তথা নেতিবাচক দিকও আছে। স্থানীয় পর্যায়ে, জাতীয় পর্যায়ে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেশির ভাগ অপরাধ ও মন্দ কাজও পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাই মন্দ কাজসমূহকে প্রতিহত করার জন্য সৎ কাজপন্থী বা কল্যাণকামীগণের পারস্পরিক সহযোগিতা ও একতা অপরিহার্য। পবিত্র কোরানে ৪৯ নম্বর সূরার (সূরা : আল হুজুরাত) ১৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে : "হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি এক পুরুষ ও এক নারী হইতে, পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করিয়াছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাহাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হইতে পার। তোমাদিগের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।" অন্যত্র পবিত্র কোরানের তৃতীয় সূরার (সূরা : আল ইমরান) ১১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন : "তাহারা আল্লাহ এবং শেষ দিনে বিশ্বাস করে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎকার্যে নিষেধ করে এবং তাহারা সৎকার্যে প্রতিযোগিতা করে। তাহারাই সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত।" অনুরূপ, চতুর্থ সূরার (সূরা : নিসা) ১১৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন : "তাহাদের অধিকাংশের গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে দান-খয়রাত, সৎকার্য ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় তাহার পরামর্শে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কেহ উহা করিলে তাহাকে মহাপুরস্কার দিব।"

বর্তমান বিশ্ব ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট দুর্যোগ সমানহারে মানবজাতিকে কষ্ট দিচ্ছে। পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের ক্রমাবনতি, সহ্য-শক্তির ঘাটতি, অন্য ব্যক্তি বা জাতির প্রতি সম্মানের অভাব ইত্যাদি উপাত্ত এসব দুর্যোগের জন্য দায়ী। এর থেকে নিরাপদ থাকতে হলে অর্থাৎ সমাজে এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করতে হলে, নিজেদের যেমন চেষ্টা করতে হবে তেমনই পরম শক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনাও করতে হবে। মুসলমান হিসেবে আমাদের প্রার্থনা অবশ্যই কোরান ও হাদিস কর্তৃক স্বীকৃত পন্থার মাধ্যমে হতে হবে। বর্তমান সময়ে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে সব মানুষই দুর্যোগের কবলে। পবিত্র নগরী জেরুজালেমের সঙ্কটে ভৌগোলিকভাবে এক এলাকার অধিবাসী হলেও তিনটি ভিন্ন বিশ্বাসের মানুষ জড়িত। সঙ্গে সঙ্গে একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী, পৃথিবীব্যাপী কোটি কোটি মানুষ মানসিকভাবে জেরুজালেম সঙ্কটের সঙ্গে জড়িত। আফ্রিকা মহাদেশের রুয়ান্ডা এবং বুরুন্ডি নামক দুইটি দেশের জনগণ বিশ্বাসে এক হলেও অন্য বিবিধ কারণে নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে লিপ্ত। বিগত শতাব্দীর আশির দশকে ইরান এবং ইরাকের যুদ্ধও একই প্রকৃতির উদাহরণ। ইউরোপের কসোভো বা ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে জনগণের মধ্যে সংঘাতের উদাহরণটিও একই প্রকৃতির। এইডস নামক মরণব্যাধির জন্য দায়ী



www.nagorikpathagar.org

হচ্ছে মানুষের মধ্যকার সামাজিক ও পারিবারিক নৈতিকতার লংঘন ও যৌনাচার। তাই পৃথিবীতে যদি শান্তি স্থাপন করতে হয়, তাহলে মানুষকে সম্মিলিত চেষ্টা করতে হবে এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

সম্মিলিত চেষ্টা ও প্রার্থনার ইতিহাস আমাদের অঞ্চলে নতুন হলেও পৃথিবীর জন্য নতুন নয়। শান্তি স্থাপনের জন্য যুগে যুগে মানুষ চেষ্টা করে আসছে। অতি সুপরিচিত নোবেল পুরস্কারের কথাই ধরুন না। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যতগুলো পুরস্কার দেয়া হয় তার মধ্যে সবচেয়ে নামী এবং দামি পুরস্কার হল নোবেল পুরস্কার। যে পাঁচটি কর্মক্ষেত্রে অবদানের জন্য পুরস্কারের দাতা ও উদ্যোক্তা মি. আলফ্রেড নোবেল নির্ধারণ করে গেছেন তার মধ্যে 'শান্তি' অন্যতম। ১৯০১ সাল থেকে নিয়ে ২০০০ সাল পর্যন্ত এই একশ' বছরে কারা কারা পুরস্কার পেল সে সম্পর্কিত তথ্য আকর্ষণীয়। ৪২টি ভিন্ন ভিন্ন বছরে একজন করে ব্যক্তি শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান এবং ২১টি ভিন্ন ভিন্ন বছরে যৌথভাবে দুইজন করে ব্যক্তি এই পুরস্কার পান (তার মধ্যে একবার, ১৯৭৩ সালে দুইজনের মধ্যে একজন পুরস্কার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন)। ১২টি ভিন্ন ভিন্ন বছরে কোন না কোন সংস্থা এই পুরস্কার পায় এবং দুটি বছরে যৌথভাবে দুটি করে সংস্থা এই পুরস্কার পায়। দুইটি ভিন্ন বছরে যৌথভাবে একজন ব্যক্তি ও একটি সংস্থা এই পুরস্কার পায়। উনিশটি ভিন্ন ভিন্ন বছরে কাউকে শান্তি পুরস্কার দেয়া হয়নি। নোবেল পুরস্কার প্রতিষ্ঠা করে মি. আলফ্রেড নোবেল যে দানপত্র রচনা করেছিলেন সেখানে উল্লেখ ছিল, যারা বিগত বছরে মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় উপহার করবেন তারাই নোবেল পুরস্কার পাবেন। যারা নোবেল পুরস্কার পাবেন তাদেরই মধ্য থেকে এক বা একাধিক লোক শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পাবেন। ব্যাখ্যা ছিল এই যে, "জাতিসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের উন্নয়ন বা সৈন্যবাহিনীসমূহের অবলোপন বা হ্রাস অথবা শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য যিনি বা যারা বিগত বার মাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা সর্বাধিক কাজ করেছেন তাকে বা তাদের শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দেয়া হবে।" শান্তি স্থাপনের জন্য সম্মিলিত চেষ্টার কথা বললাম, এখন সম্মিলিত প্রার্থনার বা ইন্টারফেইথ প্রেয়ারের কথা বলি। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো নগরীতে 'ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়নস' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই পার্লামেন্ট অধিবেশনে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ভিন্ন ধর্মের অনুসারী ব্যক্তিবর্গরা সম্মিলিত প্রার্থনায় যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালে 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব ফেইথস্'-এর চূড়ান্ত অধিবেশনে বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়েছিল। ১৯৫৩ সালে ব্রিটেনের বর্তমান রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সিংহাসন আরোহনকালে রাণী আবেদন করেছিলেন যেন সব ধর্মের লোক তার জন্য প্রার্থনা করেন। ওই মর্মে 'ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অব ফেইথস্'-এর ব্যবস্থাপনায় প্রার্থনার আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯৫৮ সালে একটি অ্যাংলিকান চার্চে এরূপ প্রার্থনা সভা আয়োজন করা হয়। ১৯৬১ সালে আমেরিকাতে অবস্থিত ইহুদি ধর্মের একটি উপাসনালয়ে এ রকম প্রার্থনা সভার আয়োজন করা হয়। ১৯৭১ সালে একটি ক্যাথলিক চার্চে এরূপ



www.nagorikpathagar.org

আয়োজন করা হয়। ১৯৭২ সালে প্রথমবারের মতো একজন মুসলমান (নাম আলহাজ শেখ এম তোফায়েল) এরূপ বহুধর্মী প্রার্থনা সভায় সম্পৃক্ত হন। ক্রমান্বয়ে আরও বহু সংস্থা বা জনগোষ্ঠী এ ধরনের বহুধর্মী প্রার্থনায় সম্পৃক্ত হয় এবং বর্তমানে মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে, ন্যূনতম সমঝোতা না থাকলে বহুধর্মী প্রার্থনা সভা অবাস্তব। সমাজের সর্বস্তরে সুপরিচিত গার্ল গাইডস এবং গার্ল স্কাউটসের আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তাদের প্রার্থনার কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। ১৯৭২ সালে গাইড আন্দোলনে প্রায় সাত মিলিয়ন সদস্য ছিল। তাদের মধ্যে ধর্মীয় আঙ্গিকে সমঝোতার স্বীকৃত ভিত্তিমূলই ছিল : "নিজের বাইরে একটি শক্তি এবং মানুষের থেকে বেশি শক্তিশালী একটি শক্তির অস্তিত্ব"... এই তত্ত্বে বিশ্বাস। এত কিছু বলার পরও আমি বলতে বাধ্য যে, বিভিন্ন ধর্মের মধ্যকার কিছু না কিছু ব্যক্তি অবশ্যই বহুধর্মী প্রার্থনাকে সন্দেহের চোখে দেখেন এবং ভবিষ্যতেও হয়তো দেখবেন। এখানে বহুধর্মী প্রার্থনা বলতে কোনক্রমেই এটা বুঝানো হচ্ছে না যে, সব ধর্মের লোকেরা কোন একটি ধর্মের আচার বা রেওয়াজ বা প্রথা অনুসরণ করবেন। বরঞ্চ, সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে আন্তরিকতা প্রকাশ করে কিন্তু নিজ নিজ ধর্মের ভাষায় বা প্রথায় প্রার্থনাটি করা হবে। ইতিহাসের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যায়। একবার ইয়েমেন থেকে একদল খ্রিষ্টান ধর্মযাজক আমাদের নবী হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। আলাপকালে নামাজের সময় হয় এবং মুসলমানগণ নামাজের জন্য প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। এই সময় খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরাও ঈশ্বরের আরাধনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমাদের নবী (সঃ) খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের মদিনার মসজিদে আরাধনার সুযোগ দেন। নবী (সঃ)সহ মুসলমানরা কাবামুখী হয়ে নামাজ আদায় করেন। অপরদিকে, খ্রিষ্টান ধর্মযাজকগণ জেরুজালেমে তাদের ধর্মস্থান অভিমুখী হয়ে প্রার্থনা শেষ করেন।

বাংলাদেশে ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতিবছর 'হাক্কানী আঞ্জুমান' নামক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় বহুধর্মী প্রার্থনা সভা বা 'মালটিফেইথ প্রেয়ার'-এর বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। উদ্যোক্তাগণ ইসলামী রীতিনীতিতেই এটা পরিচালনা করেন, কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের অবকাশ রেখে। শান্তি স্থাপনের জন্য চেষ্টা করতে আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে নির্দেশ আছে, যেমনটি আছে সৎকাজ করার জন্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বা যেমনটি আছে আল্লাহর পথে আসার জন্য, আহ্বান করার জন্য। এই উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান আউলিয়া ও ইসলাম ধর্মের প্রচারক, সুফি হযরত মাওলানা আজানগাছী (রহঃ) কর্তৃক শতাব্দীর অধিককাল আগে প্রতিষ্ঠিত হাক্কানী আঞ্জুমানের বাংলাদেশ অধ্যায় বিগত ৫ বছর যাবৎ ঢাকা মহানগরীতে বহুধর্ম বা বিশ্বজনীন প্রার্থনা সভা বা মালটিফেইথস্ প্রেয়ারের আয়োজন করে আসছে। এ বছর ১ ডিসেম্বর তারিখে জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে আয়োজিত সভাটি হচ্ছে ষষ্ঠ বার্ষিক সভা। এরূপ সভার প্রধান প্রার্থনাই হচ্ছে– বিশ্বের সবার জন্য শান্তি কামনা।



www.nagorikpathagar.org

এরূপ সভার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যকার বিভিন্ন ধর্মবলম্বীদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধির অবকাশ সৃষ্টি হচ্ছে এবং অতি সঙ্গত কারণেই আশা করা হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ সবাই পাচ্ছেন। শেষ করার আগে বলতে চাই, সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ ছাড়া শান্তি ও সমৃদ্ধির কল্পনা করা বৃথা। অনুগ্রহপূর্বক ইংল্যান্ড বা বিলাতের জাতীয় সঙ্গীতের কথা খেয়াল করুন। "God save our gracious Queen. Long live our noble Queen. God save the Queen ... Not on this land alone. But be God's mercies known from shore to shore. Lord, make the nations see that we in unity should form one family the wide world over."

বাংলা মানে অনেকটা এ রকম 'গড বা সৃষ্টিকর্তা আমাদের রাণীকে রক্ষা করুন, আমাদের রাণী দীর্ঘজীবী হউন, সৃষ্টিকর্তা রাণীকে রক্ষা করুন। শুধু আমাদের এই ভূমিতে নয়, বরং মহাসমুদ্রসমূহের এক তীর থেকে আরেক তীর পর্যন্ত এই ভূমি সেখানে সৃষ্টিকর্তার দয়া যেন সিঞ্চিত হয়। হে প্রভু জাতিসমূহকে দেখাও যে একতাবদ্ধভাবে সমস্ত পৃথিবীতে আমরা এক পরিবার।' সহৃদয় পাঠক অনুগৃহপূর্বক খেয়াল করুন যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যখন তার কোন গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শেষ করে তখন শেষ বাক্যে তিনি বলেন, 'গড ব্লেস আমেরিকা' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা আমেরিকাকে আশীর্বাদ করুক। আমাদের দেশে আমরা যখন গুরুত্বপুর্ণ বক্তব্য শেষ করি তখন আমরাও বলি : কারও কারও ভাষায়, 'বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হউক, বা কারও কারও ভাষায় 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ'। সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ ছাড়া আমাদের দেশ দীর্ঘজীবী হতে পারবে না– এটা আমার বিশ্বাস। তাই আসুন, আমরা প্রার্থনা করি। অন্ততপক্ষে এই পবিত্র রমজান মাসে মুসলমান পাঠকগণ আমদের নবী (সঃ)-এর অনুসরণে প্রার্থনা করতে পরি : "হে আল্লাহ আপনি শান্তি বর্ষণকারী, আপনার থেকেই শান্তি বর্ষিত হয়, আপনার দিকেই শান্তি ফিরে যায়, হে আল্লাহ আপনি আমাদিগকে শান্তির সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখুন, শান্তির ঘরে আমাদিগকে প্রবেশ করান।"

দৈনিক যুগান্তর ০১/১২/২০০০ইং



www.nagorikpathagar.org

# মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামরিক নেতৃত্ব

পৃথিবীর সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি অশান্ত এবং অনিশ্চিত। আমাদের নিকটবর্তী ঘটনাস্থল কাশ্মীর নিয়ে বিবদমান পক্ষগুলো শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনায় বসতে সম্মত হয়েছেন। কাশ্মীর শুধু একটি ভূখণ্ড নয়। কাশ্মীরের জনগণের ধর্মবিশ্বাস এবং অনুভূতি এখানে ধর্তব্যের বিষয়। অপরপক্ষে অনেক দিন আলোচনা চলার পর, বিগত আট মাস ধরে ফিলিস্তিন এবং ইসরাইলের মধ্যকার সম্পর্ক ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সামাজিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের কিছু কিছু কর্মকাণ্ড বিতর্কিত অবস্থায় আছে। যথা ক্লোনিং পদ্ধতিতে যে কোন প্রাণী-শিশু বা মানব-শিশু জন্ম দেয়া। প্রগতির নামে হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা বিবাহ নামক সামাজিক প্রথা পাশ্চাত্য সমাজে প্রশ্নের সম্মুখীন। প্রগতি ও মুক্তচিন্তার নামে সমকামিতা এবং সমকামীদের মধ্যে বিবাহ করাতে বৈধতা দেয়া হচ্ছে। আমাদের নিজেদের দেশের ভেতর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অশান্ত এবং ভবিষ্যৎ অত্যধিক বিপদসংকুল বলেই প্রতীয়মান। আমাদের দেশেও জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে এবং বিশ্বাসের প্রয়োগ ও অভ্যাস নিয়ে বিতর্ক ও বাদানুবাদ আশংকাজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এরকম পরিস্থিতিতে মহামানবদের জীবন আদর্শ বিশ্লেষণ করা এবং সেখান থেকে যথাসম্ভব শিক্ষা গ্রহণ করা একটি কাম্য বিষয়।

যুগে যুগে সৃষ্টিকর্তা মানবজাতির উপকারার্থে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন বিভিন্ন জাতির প্রতি। আমরা যারা বিশ্বাস করি তাদের মতে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হলেন সর্বশেষ নবী এবং রাসূল। যারা নিজেদের মুসলমান বলে তাদের প্রথম ঘোষিত বিশ্বাসই হচ্ছে এই যে-এক আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ (সা:) তার প্রেরিত রাসূল'। ঘোষিত মূল বিশ্বাসের বাইরে ব্যাপক বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম বক্তব্য হচ্ছে, ক. রাসূলুল্লাহকে (সা:) সৃষ্টি না করলে বাকি কোন কিছুই আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টি করতেন না। খ. আল্লাহ্তায়ালা তার সমস্ত সৃষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছেন। গ. যে পবিত্র কোরআন আমাদের চলার পাথেয়, সেই কোরআনের বাস্তব প্রয়োগের উদাহরণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিজের জীবন এবং সমসাময়িক সমষ্টিগত জীবন। ঘ. মোহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রেরিত সর্বশেষ নবী ও রাসূল। অতএব আমাদের নিজেদের বিশ্বাস এবং অনুভূতিকে যদি দৃঢ় করতে হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন এবং কর্মকাণ্ডকে বিশ্লেষণ করা এবং যথাসম্ভব অনুসরণ করা অপরিহার্য। বিশ্লেষণ এবং অনুসরণ উভয় কাজই নির্লিপ্তভাবে যন্ত্রের মত শুধু একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও করা যায় আবার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়েও করা যায়। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অবশ্যই কাম্য।



www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর মানুষ স্বীকার করুক বা না করুক মুসলমানদের কাছে রাসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) জীবনই হচ্ছে সর্বপ্রথম অনুকরণীয়। আজকে ২০০১ সালে, যুগ পরিক্রমার এমন একটি ক্রান্তিলগ্নে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি যেখানে আমাদের সমাজের একটি অংশের মতে প্রথমত, ধর্মীয় আলোচনা বা ধর্মানুভূতির প্রকাশ অকাম্য এবং 'সাম্প্রদায়িকতা' হিসাবে বিশেষায়িত এবং দ্বিতীয়ত ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে যে কোন আলোচনা অধিকতর সমালোচিত। সমালোচনাকারী কারা'? আমাদেরই সমাজের ব্যক্তিবর্গ। যখন বলি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) আমাদের নবী এবং রাসূল, তখন সব মুসলমান পুরুষ এবং নারীর জন্য কথাটি বলা হয়। মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্মীয় জ্ঞানে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছেন, রাসূল (সাঃ) কিন্তু তাদের রাসূল নন! যারা জন্মগতভাবে মুসলমান কিন্তু কালক্রমে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন তারা এ বিষয়টি প্রকাশ করেন না বলে সমস্যা জটিলতর। কারণ তারা মুসলমান হিসাবে দাবি করছেন। কিন্তু অমুসলমানদের মতো বক্তব্য রাখছেন। সব ধরনের সমালোচনা নিরসনের অন্যতম উপায় হচ্ছে সঠিক বিষয়ে যথাসম্ভব জ্ঞান অর্জন। অতএব যে কোন মুসলমান পুরুষ না নারী যিনি লেখাপড়া শিখেছেন, আর কাণ্ডজ্ঞান ও বিশ্লেষণ শক্তি আছে তারই অপরিহার্য কাজ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনী জানা, বিশ্লেষণ করা, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ উদ্ভাসিত করা এবং অনুসরণ করা। আমরা যদি না-ই জানি তার জীবনটা কেমন ছিল তাহলে আমরা তাকে অনুসরণ করব কিভাবে'? জ্ঞানের জগতের বিভিন্ন ডিসিপ্লিন বা বিষয় আছে যথা-রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, ভূগোল, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রত্যেক ডিসিপ্লিন বা বিষয়ের বড় বড় পণ্ডিতদের রচনা পড়া এবং হৃদয়ঙ্গম করা যেমন ওই বিষয়ের ছাত্রদের জন্য অপরিহার্য, তেমনি 'ডিসিপ্লিন অব লাইফ' বা জীবন-বিষয়ে প্রধান রচয়িতা, প্রধান বিজ্ঞানী ও প্রধান তাত্ত্বিক মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী পড়াও মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য। আমরা রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে প্লেটোর বই পড়ি, ইতিহাসে টয়েনবির বই পড়ি, নৃ-তত্ত্ব পড়তে গিয়ে ডারউইনের বই পড়ি, অর্থনীতিতে ম্যালথাস পড়ি, কিন্তু ধর্মতত্ত্বে কোন বই পড়তে আগ্রহী নই। কোন বিষয়ে লেখাপড়া না করে বা নিদেনপক্ষে ন্যূনতম জ্ঞান অর্জন না করে ওই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা অসৌজন্যমূলক বৈকি। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কেই যেখানে কোরআন এবং হাদিসের পাতায় পাতায় রয়েছে জটিল বিষয়ের সমস্যা সমাধানকল্পে বিস্তর বর্ণনা অথবা গবেষণার ইঙ্গিত, তখন আমরা ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ না থেকে রাসূলের (সাঃ) মহান আদর্শের দিকে ধাবিত হতে পারি। বাংলাভাষায় উচ্চারণ এবং অনুবাদসহ পবিত্র কোরআন বা ব্যাখ্যাকৃত হাদিস গ্রন্থও প্রচুর পাওয়া যায় এবং বাঙালি কর্তৃক বাংলা ভাষায় লেখা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনী গ্রন্থও যেহেতু অনেক অতএব, এ প্রসঙ্গে জ্ঞান অর্জনে প্রয়োজন শুধু আগ্রহের। একদিকে, ধর্মের অনুসারীদের মধ্য থেকে অপ্রয়োজনীয় গোঁড়ামি বা অবৈধ প্রথাসমূহ দূর করা, অন্যদিকে সমালোচকদের অযৌক্তিক সমালোচনার উত্তর দেয়ার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বিশ্বাস এবং জ্ঞানের।



www.nagorikpathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পুরো জীবনের কোন একটি আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করতে গেলেও বৃহৎ আলোচনা করা যায়। তিনি পরিবারের প্রধান ছিলেন, তিনি ধর্ম প্রচারক ছিলেন, তিনি সমাজসেবক ও সমাজ-সংগঠক ছিলেন, তিনি রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন এবং তিনি একজন সেনাপতি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জাগতিক প্রথা নিরক্ষর এবং প্রথাগত বিদ্যায় শিক্ষাবিহীন ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বারা তার জীবনের কর্মকাণ্ড দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অতি উজ্জ্বল অনুকরণীয়। নেতৃত্বের উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নেতৃত্বের পূর্ণ বিকাশ শুরু হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেহেতু একজন সৈনিক ছিলাম সেহেতু এই ক্ষুদ্র রচনায় সৈনিক জীবন সম্বন্ধেই আলোকপাত করছি। তাছাড়া বিগত এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পর থেকে পরবর্তী প্রায় দেড় মাস বাংলাদেশের সংবাদপত্রসমূহে অন্যতম শিরোনাম ছিল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত সমস্যা, ভারতের রৌমারী আক্রমণ ও এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনা। তাই একজন সৈনিক হিসাবে দেশরক্ষা এবং সৈনিকের কর্তব্যের প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহর জীবনী আলোচনা করা অতি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধু নেতৃত্বই দেননি, অসীম সাহস নিয়ে লড়াই করেছেন নিজেও। যিনি নবুয়ত প্রাপ্তির পর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের কারণে স্থির বসে থাকার দীর্ঘ অবকাশ পাননি, তিনি কিভাবে তার অনুসারীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, শত্রুদের মোকাবেলা করার কৌশল শিখিয়েছিলেন, সেটা অনুকরণ করেই আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারি। যুদ্ধের ময়দানে মহানবী (সাঃ)-এর অসীম সাহসিকতা আমাদের প্রেরণা হতে পারে। সাহসের ব্যাপারে বোখারি শরিফের হাদিসে উল্লেখ আছে, 'হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (সাঃ) সর্বাপেক্ষা সুশ্রী, সাহসী এবং দানশীল ছিলেন। এক সময় মদীনাবাসী ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লে নবী (সা:) ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সবার আগে অগ্রসর হয়েছিলেন।'

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সব যুদ্ধ বা অভিযানে অতুলনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা সহকারে পরিকল্পনা করেছেন এবং পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করেছেন। তার যুদ্ধের পরিকল্পনাগুলো ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু বাস্তব এবং স্থান ও কালের সঙ্গে উপযোগী। অধীনস্থ দলনেতা বা সেনাপতিদের পক্ষে এগুলো বুঝতে সুবিধা হতো, যুদ্ধক্ষেত্রে পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এগুলো পরিবর্তনও করা যেত। সাধারণত মহানবী (সাঃ)-এর রণকৌশল ছিল প্রতিরক্ষামূলক। তবে প্রয়োজনবোধে কখনও কখনও তিনি যুদ্ধে আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ড শত্রুর তুলনায় অধিকতর তৎপরতার সঙ্গে সংঘটিত করতেন। তার যুদ্ধ পরিকল্পনা তিনি গোপন রাখতে পারতেন এবং সেনাদলকে অভ্যান্ত যুক্তিসঙ্গভাবে স্থান ও কাল মোতাবেক বিন্যাস করতেন। আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় স্বীকৃত অনেকগুলো যুদ্ধের নীতি বা 'প্রিন্সিপলস অব ওয়ার'-এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো সারপ্রাইজ (চমক), স্পিড (গতি) এবং মবিলিটি (দ্রুত ও স্থান উপযোগী চলাচলের অবকাশ)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)



www.nagorikpathagar.org

নিজ পরিকল্পনায় এই তিনটি উপাত্তের খুব খেয়াল রাখতেন। যুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক অস্ত্র বা মাধ্যমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটিকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গোপন সংবাদদাতা তথা গোয়েন্দা বাহিনী সংগঠিত করেছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে শত্রুর ভূখণ্ডে অভ্যন্তরে বা শত্রুর অবস্থানের পেছনে লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণের জন্য বিশেষ দল সংগঠন করেছিলেন (যেগুলো আধুনিক যুগে গেরিলা বা কমান্ডো বাহিনীর সঙ্গে তুলনা করা যায়)। যুদ্ধের নীতিমালার মধ্যে অন্যতম অপরিহার্য নীতি হলো যুদ্ধের কারণে বিশ্বাস (ইংরেজিতে বলা যায় 'ফেইথ ইন দ্য কজ')। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে নিয়মে তার উম্মত তথা অনুসারীদের প্রেরণা দিতে পেরেছিলেন এবং যতটুকু উজ্জীবিত করতে পেরেছিলেন, ওইরকম ইতিহাসে তার আগে বা পরে কেউ পারেননি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদেশে মুসলমান যোদ্ধারা যে কোন কিছু করতে এবং হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকতেন। পবিত্র কোরআনের চতুর্থ সূরা ১০৪, ১২২ এবং ১৭৪ নম্বর আয়াত এবং নবম সূরার ১১১ নম্বর আয়াতে এ বিষয়ে খুবই উদ্দীপক বক্তব্য রয়েছে।

যুদ্ধ ছাড়াও সার্বিক প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মহানবী (সাঃ)। কুরাইশদের অত্যাচারে তিনি যখন বাধ্য হলেন নিজ দেশ, নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করতে, তখন সঙ্গী আবু বকরকে (রাঃ) সঙ্গে নিয়ে বের হয়ে গেলেন এবং মক্কার দক্ষিণে সওর পাহাড়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে উটকে একটু থামিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহর সকল মৃত্তিকা থেকে আমার নিকট পবিত্রতম হচ্ছে হে মক্কা তোমার মৃত্তিকা। আল্লাহর নিকটেও তুমি প্রিয়। আমার দেশবাসী যদি আমাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য না করত তাহলে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করতাম না।' সুতরাং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কেউ যদি শত্রুর মোকাবেলা করে তাহলে সেটি ন্যায় হিসাবেই বিবেচিত হবে।

সীমান্ত পাহারার ফজিলত সম্পর্কে বুখারি শরীফের হাদিস 'হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করিম (সাঃ) বলেন, আল্লাহর .... উদ্দেশ্যে একদিন সীমান্ত .... ও তার সমস্ত সম্পদ ......... চাবুক পরিমাণ জায়গা পৃথিবী.......সম্পদরাশি হতে উত্তম। আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের উদ্দেশ্যে বান্দার একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা পৃথিবী ও তার সকল সম্পদরাশি অপেক্ষা উত্তম'। সঙ্গত কারণেই আমাদের দেশের বিডিআর জওয়ানদের সাম্প্রতিক ভূমিকা ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্লেষণ করলে অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। সীমান্তে বিডিআররা নিজের দেশের মাটি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নিজের জীবনবাজি রেখে শত্রুকে পরাস্ত করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পবিত্র কোরআনেও যুদ্ধ বা যুদ্ধকালীন পরিবেশে সাহস ও মনোবল অটুট রাখার জন্যই সব সময় তাগিদ দেয়া হয়েছে। 'যখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে কাফেরদের মোকাবেলা করবে তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। যে কেউ লড়াইয়ের ময়দানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তার ওপর আল্লাহর গজব পতিত হবে এবং তার ঠিকানা



www.nagorikpathagar.org

হবে জাহান্নাম'। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'শত্রুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য যথাসাধ্য সমরাস্ত্র ও সিপাহীসুলভ শক্তি সদা প্রস্তুত রেখ যেন দুশমনের ওপর তোমাদের ভীতিকর প্রভাব কায়েম থাকে'। আমাদের দেশ ছোট, সৈন্য সংখ্যা কম এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ একটি বৃহৎ রাষ্ট্র বলে তাদের ভয় পেয়ে আমাদের সম্মান, আমাদের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে মাথা নিচু করে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে একটি ব্যাপার আমরা গভীরভাবে চিন্তা করব যে, রাসূল (সাঃ)-এর সৈন্যদল, অস্ত্রশস্ত্র ও আর্থিক দিকগুলো কি তাঁর শত্রুদের তুলনায় এক-তৃতীয়াংশও ছিল? এবং এ জন্য কি তিনি সাহস হিম্মত হারিয়ে ফেলেছিলেন? যদি তা না হয় তাহলে কেন? এ জন্য আমাদের প্রয়োজন তাঁর প্রতিরক্ষা কৌশলকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা এবং বিশ্লেষণ করা। চৌদ্দশত বছর আগের আরব উপদ্বীপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং ভূগোলের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছি। মদিনা শহরভিত্তিক যে রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, তার সীমানার বাইরে, নিকটে এবং দূরে, সমস্ত পরিবেশই ছিল বৈরী। সেখানে রাসূলুল্লাহর নেতৃত্বে ওই রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা নীতিই ছিল আত্মরক্ষামূলক। অনুরূপভাবে আজকে ২০০১ সালে আমাদের প্রতিরক্ষা নীতিও আত্মরক্ষামূলক। আমাদের নিজস্ব উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন শান্তির কিন্তু সেই শান্তিটি হতে হবে সম্মানজনক। অতএব যুদ্ধংদেহী মনোভাবের প্রয়োজন নেই কিন্তু সৎ প্রস্তুতির প্রয়োজন।

মহানবী (সাঃ)-এর মদিনায় অবস্থানকাল হচ্ছে ৩ হাজার ৬০৪ দিন। যদিও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে ২৭টি যুদ্ধ, অভিযান বা সংঘর্ষে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করে নেতৃত্ব প্রদান করেন, তথাপি শুধু বড় বড় যুদ্ধ বা অভিযানগুলোকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে বিশ্লেষণ করলেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সামরিক নেতৃত্বের বিভিন্ন আঙ্গিক অতি সুন্দরভাবে উদ্ভাসিত হয়। বড় বড় কয়েকটি যুদ্ধ বা অভিযানের উদাহরণ নিম্নরূপ : ১. বদরের যুদ্ধ, হিজরি দ্বিতীয় বছরের ১৮ রমজান (কারও কারও মতে ১৭ রমজান); ২. ওহুদের যুদ্ধ, হিজরি তৃতীয় বছরের জিলক্‌দ মাস; ৫. খায়বারের যুদ্ধ, হিজরি সপ্তম বছরের মহরম মাস; ৬. অভিযান ও মক্কা বিজয়, অষ্টম হিজরি রমজান মাস; ৭. হোনাইনের যুদ্ধ, হিজরি অষ্টম বছরের শাওয়াল মাস; ৮. তাবুক অভিযান, হিজরি নবম বছরের রজব থেকে রমজান মাস; বিভিন্ন যুদ্ধ, অভিযান ও সংঘর্ষে উভয়পক্ষে ১ হাজার ১৮ জন প্রাণ হারান। তার মধ্যে ২৫৯ জন হচ্ছেন মুসলমান (শহীদ) এবং বাকি ৭৫৯ জন হচ্ছেন অমুসলিম (নিহত)। এই ৭৫৯ জনের প্রত্যেকেই অন্য মুসলমান যোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়েছেন। রাসূলুল্লাহর সংগ্রামী জীবনে মোট ৬ হাজার ৫৪৬ জন্য কাফের বা বিধর্মী ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে যুদ্ধবন্দি হয়। এদের মধ্যে মাত্র দু'জন পরে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যদণ্ড পাওয়ার কারণ এই ছিল না যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। বরং কারণগুলো ছিল অন্য কয়েকটি গর্হিত অপরাধ। যা হোক, রচনার এই পর্যায়ে আমরা শুধু একটি যুদ্ধের অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করছি।

ইসলামের প্রথম যুদ্ধ তথা বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সফলতা এবং ওহুদের যুদ্ধে মাঝারি পর্যায়ের নেতৃত্বের গাফিলতির জন্য আংশিক পরাজয়ের পর ইসলামের তৃতীয়



www.nagorikpathagar.org

যুদ্ধ ছিল খন্দকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধটি ছিল মুসলমানদের জন্য আরেকটি অগ্নিপরীক্ষা। কুরাইশদের মধ্যে বনি কাইনুকা এবং বনি নাজিরের ইহুদিরা সব সময় রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধাচরণ করত। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল আরব অঞ্চলে খ্রিষ্টানদের পরাভূত করে ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করা। কিন্তু রাসূল (সাঃ) বিগত পাঁচ বছরে যেভাবে বিভক্তি এনেছিলেন এমন কি মদিনায় হিজরত করেও যেভাবে শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন তাতে তাকে ভয় পাওয়ার ইহুদিদের যথেষ্ট কারণ ছিল। রাসূলের (সাঃ) আহ্বানে একটি নতুন জাতি যেভাবে বলিষ্ঠ হয়ে গড়ে উঠল তাতে ইহুদিরা অনুভব করল যে, ইসলামের শক্তিকে পরাভূত করা কঠিন হবে। তাই তারা গোপনে কুরাইশদের সঙ্গে আঁতাত করল যে মদিনার অভ্যন্তরে থেকেই তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে কোন সময় সশস্ত্র আক্রমণ করতে প্রস্তুত আছে। ষড়যন্ত্রের ফসল হিসাবেই শেষ পর্যন্ত কুরাইশদের সঙ্গে মদিনার বাইরে বিভিন্ন গোত্র মিলিত হয়ে দশ হাজার সৈন্য বাহিনী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনার দিকে অগ্রসর হলো। এই বিশাল বাহিনীর খবর পেয়ে মুসলমানরা কিছুটা শঙ্কিত হলো। এতে তাদের শুধু পরাজিত না বরং নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিল। এ বিশাল বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য মুসলমানদের একটি মাত্র উপায় ছিল তা হলো মদিনার অভ্যন্তর থেকে প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলা। মদিনার তিন দিক শ্রেণীবদ্ধ ঘন খেজুর গাছ দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মতো কাজ করছিল। যে দিকটি ছিল উন্মুক্ত সেখানে বিশ্বসেরা সমরনায়ক মহানবী (সাঃ) মুসলমানদের দ্রুত পরিখা বা খন্দক খনন করার নির্দেশ দিলেন এবং নিজেও সেই পরিখা খননের কাজে অংশগ্রহণ করলেন।

কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান তার বাহিনী নিয়ে এসে অবাক বিস্ময়ে মুসলমানগণ কর্তৃক খনন করা পরিখা দেখল। কুরাইশ এবং বেদুঈন গোত্রের লোকেরা বুঝতে পারল যে অশ্বারোহী এবং সৈন্য বাহিনী নিয়ে এই পরিখা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভব না। ফলে তারা তাঁবু স্থাপন করে অপেক্ষা করতে লাগল এবং অপর প্রান্ত থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু আক্রমণ অব্যাহত রাখল। তবে কুরাইশরা যখন নিশ্চিত হলো যে এই পরিখা অতিক্রম করে মুসলমানদের পরাজিত করা সম্ভব না, তখন মদিনার অভ্যন্তরে মুসলমানদের মধ্যে কিছু কিছু গোত্রকে তারা মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার কাজে ব্যবহার করল। দীর্ঘকালীন এই যুদ্ধে মুসলমানদের বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। মদিনা শহরের অভ্যন্তরে বনি কুরাইজা গোত্র এবং অন্যদিকে আবু সুফিয়ানের শত্রুবাহিনীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে রাখতে একদিকে যেমন মুসলমানরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে মদিনার বিশ্বাসঘাতকদের কারণে খাদ্যের অভাবে তাদের থাকতে হয়েছে অভুক্ত। যুদ্ধের সময় শত্রুর ব্যাপারে মুসলমানদের মনে ভয়ের সঞ্চার হলে রাসূল (সাঃ) আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছেন এই বলে– 'হে আল্লাহ তুমি পবিত্র গ্রন্থ দিয়েছ, তুমি সকল বিষয়ে হিসাব গ্রহণ করে থাকো, তুমি শত্রুদলকে বিতাড়িত করো এবং বিজয় লাভে আমাদের সাহায্য করো, শত্রুদের হৃদয় ভয়ে প্রকম্পিত করো।'



www.nagorikpathagar.org

এদিকে মুসলমান সৈন্যবাহিনীর দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বলেছেন, 'সমবেত মুসলমানগণ আমি আল্লাহর নিকট পার্থিব এবং অপার্থিব সর্বপ্রকার কল্যাণ প্রার্থনা করেছি। তোমরা শত্রুর সঙ্গে নিজের থেকে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করো না। কিন্তু যদি একান্তই সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তোমরা অটল থেকো। মনে রেখো, তরবারির ছায়াতলেই বেহেশত রয়েছে। বিশ্ব মানবতার দূত মহানবী (সাঃ) এসেছিলেন মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে; দেখিয়েছেনও। এর মধ্যেই তাকে যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা করতে হয়েছে এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন পৃথিবীতে এক অনন্য সেনানায়ক হিসাবে। তিনি পারতপক্ষে যুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করেননি। সাহাবিদের উদ্দেশ্যে তার বক্তব্য থেকেই সেটা স্পষ্ট হয়। খন্দকের যুদ্ধে সাহাবিদের অসীম সাহস ও ধৈর্য্য আল্লাহতায়ালার সাহায্য এবং কুরাইশদের ওপর প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা-ঠাণ্ডা, ঝড়, বৃষ্টি মুসলমানদের বিজয়ী এবং শত্রুকে পরাজিত করেছে।

যুদ্ধে শত্রুকে পরাস্ত করার জন্য মহানবী (সাঃ) যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, দেড় হাজার বছর পরও তা অত্যাধুনিক এবং সাদরে সমাদৃত। যুদ্ধে তিনি গোয়েন্দা বাহিনী নিযুক্ত করেছেন, সবসময় রক্ষণাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যুদ্ধের মাঠে গুপ্তচরের মর্যাদা সম্পর্কে বোখারি শরীফের হাদিসে রয়েছে- "জাবের (রা:) বর্ণনা করেন যে, নবী (সাঃ) পরিখার যুদ্ধের সময় বললেন, 'কে আমাকে শত্রু শিবিরের খবরাখবর এনে দিতে পার'?' জুবাইর বললেন, আমি পারব। নবী (সাঃ) আবারও বললেন, 'আমাকে শত্রু শিবিরের খবর ও তথ্য কে এনে দিতে পার'?' জুবাইর আবারও বললেন, আমি পারব। একথা শুনে নবী (সাঃ) বললেন, 'প্রত্যেক নবীরই বিশেষ সাহায্যকারী থাকে। আর আমার বিশেষ সাহায্যকারী হলো জুবাইর। "যুদ্ধক্ষেত্রে পরিস্থিতি অবলোকন করে কখনও কখনও আগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। শত্রুদের কাছে সবসময় তার পরিকল্পনা গোপন করে রাখতে সফল হয়েছেন। ইহুদি এবং আবু সুফিয়ান উভয়ের কাছে বিশ্বাসী ঘাতাফান গোত্রের নোয়াইম ইবনে মাসউদ খন্দকের যুদ্ধকালীন মহানবী (সাঃ) এক সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণ করলে মহানবী (সাঃ) তাৎক্ষণিকভাবে তাকে সেটা প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে মাসউদ নিজের পরিচয় গোপন রেখে শত্রুদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করতে চাইলে রাসূল (সাঃ) সে অধিকার তাকে দিয়েছেন। তিনি যুদ্ধে কখনই অধিক প্রাণ এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কামনা করেননি। মোট কথা রাসূল (সাঃ) যুদ্ধে যে নীতি অবলম্বন করতেন তাতে কেবল অন্যায় দূরীভূত হয়ে সত্যই প্রতিষ্ঠিত হয়। খন্দকের যুদ্ধ তারই একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

বর্তমান যুগের প্রণালী এবং পরিবেশ একদিকে যেমন জটিল হয়েছে অন্যদিকে বস্তুবাদী ও যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। বিবিধ দর্শন ও মতবাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠেছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে নিজের ঈমান ও অনুভূতিকে রক্ষা করে বেঁচে থাকতে হলেও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত ও কৌশল প্রয়োজন। সমকালীন সাহিত্য বা ইতিহাসে মনীষীগণ কর্তৃক মানবসভ্যতার ওপর প্রধান প্রভাবকারী ব্যক্তি হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম সর্বাগ্রে তালিকাভুক্ত করেন। অতএব একাধিক কারণেই রাসূলুল্লাহর (সাঃ) জীবনী অনুসরণীয়।

দৈনিক যুগান্তর ০৫/০৬/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

# মহানবীর শিক্ষা ও সমকালীন বিশ্ব

বিগত দিনগুলোয় ঢাকাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছে। জসনে-জুলুস নামে পরিচিত মিলাদুন্নবীর মিছিল-উৎসব ইত্যাদিও হয়েছে। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানমালায়, সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, ধর্মীয় আবেগ প্রাধান্য পেয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ বা সারগর্ভ অনুষ্ঠান সংখ্যায় কম ছিল বলে মনে হয়েছে। শুধু এ বছর নয়, প্রতিবছরই এমনতর হয়। হ্যাঁ-সূচক দিক হল, সারা বছর যাই হোক বা যাই করুক না কেন অন্তত এই দিনটিতে মানুষ প্রিয় মহানবী (সাঃ)-কে উৎসবমুখর পরিবেশে স্মরণ করছে। এ প্রসঙ্গে কোন বক্তব্য রাখতে হলে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ বিষয়টি স্পর্শকাতর অনুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১৫ জুন ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিসের উদ্যোগে একটি সেমিনার হয়। এর বিষয়বস্তু ছিল 'মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষা এবং সমকালীন বিশ্ব'। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী। বিশেষ অতিথি ছিলেন পাট প্রতিমন্ত্রী এবং প্যালেস্টাইন ও ইরাকের রাষ্ট্রদূতদ্বয়। এখন থেকে প্রায় চৌদ্দশ' বছর আগে দশম হিজরী সালের জিলহজ মাসে মহানবী (সাঃ) তার জীবনের শেষ হজ তথা বিদায় হজ সম্পন্ন করেছিলেন। বিদায় হজের দিন আরাফাতের ময়দানে, যেটিকে আমরা এখন 'জেবেলে রহমত' বা 'রহমতের পাহাড়' বলে জানি, সেই পাহাড়ে দাঁড়িয়ে তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন। যারাই হজ করতে যান তাদের মধ্যে বেশিরভাগই হজের সময় এ পাহাড়ে ওঠার সুযোগ পান না। কারণ এই সময় স্থানটি লোকে-লোকারণ্য থাকে। যারা ওমরা হজ পালন করতে যান তাদের বেশিরভাগই একটু সময় হাতে নিয়ে আরাফাতের ময়দানে বেড়াতে গিয়ে 'জেবেলে রহমত', পাহাড়ে ওঠেন। যারা পাহাড়ে ওঠেন বেশির ভাগই সেখানে দু'রাকাত নফল নামাজ পড়েন। ওখানে উঠলে যে কোন বিবেকবান মুসলমানের মনে বিদায় হজের স্মৃতি ভেসে ওঠে। সেই মুসলমান পরিদর্শক যদি কয়েকটি মিনিট চিন্তা করেন তাহলেই তিনি নিজে নিজের মূল্যায়ন করতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ বিদায় হজের ভাষণে কি বলেছিলেন এবং তিনি নিজে তার কতটুকু অনুসরণ করেন। যা হোক, ভাষণের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমি সেই ভাষণের কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করছি। '... হে মানবমণ্ডলী, তোমরা আমার কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। আমি তোমাদের পরিষ্কার ভাষায় বলছি, এ বছরের পর এই জায়গায় তোমাদের সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। ওহে জনতা, আল্লাহ বলেছেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদিগকে একজন নর ও নারী সৃষ্টি করেছি। তোমাদের একটি জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে একে অন্যকে জানতে ও চিনতে পার। সে উদ্দেশ্যে তোমাদের সম্প্রদায় ও পরিবার হিসাবে গড়ে তুলেছি। নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে তোমাদের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই ব্যক্তি যিনি আল্লাহ ভীরু।



www.nagorikpathagar.org

কোন আরবের ওপর আজমের অনুরূপ কোন আজমের ওপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তেমনি সাদার ওপর কালোর বা কালোর ওপর সাদার কোন প্রাধান্য নেই, শুধু আল্লাহ সম্পর্কে সজ্ঞানতা এর ব্যতিক্রম।... তোমাদের নিকট আমি এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যে যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাক তবে এরপর কখনও পথভ্রষ্ট হবে না। সেই জিনিস হচ্ছে আল্লাহ পাকের কেতাব (কোরআন) এবং আমার জীবন পদ্ধতি আহলে বাইত। হে লোক সকল মনে রেখ, আমার পরে কোন নবী নেই। তোমাদের পরে কোন উম্মত নেই। সাবধান! ধর্মীয় ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করবে না। কেননা ধর্মের সঠিক বন্ধনসমূহ অতিক্রম করার ফলে তোমাদের পূর্বে বহু জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে। হে জনতা, নিশ্চয় তোমাদের নিকট শয়তান পূজা না পাওয়ার কারণে তোমাদের পেছনে হতাশ হয়ে লেগেছে। আল্লাহর নিকট প্রার্থনা নয় বরং অন্য কিছুর প্রতি আনুগত্যে যে সন্তুষ্ট হবে, আর ওইসব বিষয় যা তোমাদের তুচ্ছ বলে মনে কর। সুতরাং ধর্মের ব্যাপারে শয়তান সম্পর্কে সাবধান হয়ে যাও।... হে লোক সকল! এখানে আজ যারা অনুপস্থিত তাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পৌঁছে দেবে। কেননা উপস্থিত অনেকের চেয়ে অনেক অনুপস্থিত ব্যক্তি আমার এ বক্তব্যের অধিক গুরুত্ব দেবে এবং সত্য বলে মনে করবে।' নবী করিম (সা:)-এর ভাষণ শেষ করার পর পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি ভাষণের স্থানেই নাজিল হয়--'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনের পূর্ণতা দান করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম' (সূরা মায়েদা, আয়াত-৩)। (উদ্ধৃতিসমূহ খাদিজা আখতার রেজায়ী অনূদিত 'আর রাহীকুল মাখতুম' এবং মুস্তাফা জামান আব্বাসী লিখিত 'মুহাম্মদের নাম' নামক জীবনী গ্রন্থদ্বয় থেকে নেয়া)।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন, 'তিনি এবং ফেরেস্তাগণ নবীর প্রতি সালাম প্রেরণ করেন এবং বিশ্বাসী মানুষও যেন নবীর ওপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করে।' এখানে নবী মানে মহানবী (সা:)। কোরআনের অন্যত্র, চুরানব্বইতম সূরা তথা সূরা আল ইনশিরাহর চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'আ-রাফা'না লাকা যিকরাক'। ইসলামী ফাউন্ডেশন অনূদিত কোরআনের ও আয়াতের বাংলা করা হয়েছে এ রকম- 'এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চমর্যাদা দান করিয়াছি।' হিজরী পনের শতকের প্রারম্ভ উপলক্ষে পৃথিবীর বহু ভাষার মতো বাংলা ভাষায়ও সৌদি আরবে অবস্থিত খাদেমুল-হারামাইন বাদশা ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসিরে এই আয়াতের বাংলা করা হয়েছে– 'আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।' আল্লাহ যাকে সম্মান জানাচ্ছেন, আল্লাহ যার আলোচনাকে সুউচ্চ করেছেন তার জীবনাদর্শ আলোচনা করা আমাদের জন্য অবশ্য করণীয় হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বোপরি কিছু আগে উদ্ধৃত মহানবী (সাঃ)-এর ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বাসী সকল মুসলমানের ওপর করণীয় হয়ে দাঁড়ায় রাসূলের জীবন আদর্শ আলোচনা করা ও প্রচার করা। অনুভূতির অভাবে, জ্ঞানের অভাবে, অবকাশের অভাবে এবং পারিপার্শ্বিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হয়তো অনেকের মধ্যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা এ কাজটি



www.nagorikpathagar.org

করতে পারেন না। রাসূলুল্লাহর জীবন আদর্শ আলোচনা করা আমাদের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করণীয়, কারণ রাসূলুল্লাহ ছিলেন শান্তির দূত। তিনি হলেন সমস্ত সৃষ্টিকুল ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য রহমত বা কল্যাণের প্রতীক তথা ধারক ও বাহক। অতএব ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে তথা সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে অশান্ত ও অস্থিতিশীল বাংলাদেশে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে, সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে এবং নৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে মহানবীর জীবন আদর্শ আলোচনা হওয়া অতি প্রয়োজন।

মহানবী (সাঃ)-এর আগে অনেক নবী ও রাসূল এসেছেন। বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময়কাল পৃথিবীতে বেঁচেছিলেন। বিভিন্ন জনের মধ্যে আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য খোদা প্রদত্ত অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। কেউ কেউ ঐশী কেতাব পেয়েছিলেন, কেউ কেউ পাননি। কিন্তু মহানবী (সাঃ) সর্বশেষ এবং সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত (মোস্ট কমপ্রিহেনসিভ) কেতাব পেয়েছিলেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ অলৌকিক মর্যাদা পেয়েছিলেন। পবিত্র কোরআন থেকে আমরা জানতে পারি, দিগন্তে তথা অন্তরীক্ষে রয়েছে আল্লাহর অগণিত নিদর্শন। সেসব নিদর্শনের সঙ্গেও মিশে আছে মহানবীর স্মৃতিচিহ্ন বা পবিত্র নাম। একটি উদাহরণ : কেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ভেংকি' জাতীয় একটি মাছের প্রশস্ত লেজে জ্বলজ্বল করছে মহানবীর নাম। এখন দুটো কঠিন বা সিরিয়াস উদাহরণ উল্লেখ করি। হযরত মুসা (আঃ)-এর কাছে যেই কিতাব এসেছিল সেটির নাম 'তাওরাত'। বিগত শতাব্দীগুলোতে মানুষ কর্তৃক বহুবার পুনর্লিখনের পর একটি ভাষ্য বর্তমানে খ্রিস্টানদের বাইবেলে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' নামে পরিচিত। সেই মুসা (আঃ) আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন। তার অতি আগ্রহের কারণে তাকে সিনাই উপত্যকায় একটি পাহাড়ের উপরে যেতে বলা হয়েছিল আল্লাহকে দেখার জন্য তথা অনুভব করার জন্য। সেখানে এমন একটি আলোর ঝলকানি এসেছিল যে এই পাহাড় আগুনে পুড়ে যায়। হযরত মুসা (আঃ) খোদাকে দেখার ব্যাপারে এর বেশি আর অগ্রসর হতে পারেননি। অপরপক্ষে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে নাজিল হওয়া পবিত্র কোরআন সমস্ত পৃথিবীতে আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায় বিদ্যমান। অধিকন্তু, মহানবী (সাঃ)-কে আল্লাহ তায়ালা নিজে দাওয়াত দিয়ে বোরাক বাহনের মাধ্যমে সপ্তম আসমান পার করে আল্লাহর এত কাছে অবস্থান দেন যে, সেটা জাগতিক ভাষায় বর্ণনা দেয়া মুশকিল।

বিশ্বের আইনপ্রণেতা বা আইনদাতা হিসাবে মহানবী (সাঃ)-এর নাম এক নম্বরে সবাই স্মরণ করে। মহানবী (সাঃ)-এর আচরিত আইনে কোন বৈষম্য নেই, পক্ষপাতিত্ব নেই, নেই কোনরূপ দীর্ঘসূত্রিতা বা গোঁজামিল। অমুসলিম বিশ্বও আজ মহানবী (সাঃ)-কে বিশ্বের উৎকৃষ্ট আইনদাতা হিসাবে স্মরণ করে। লন্ডনের 'লিংকনস ইন'-এর মতো আইন বিদ্যাপীঠে তার নাম স্বর্ণাক্ষরে নামফলকের শীর্ষে লিখিত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সরকারি অফিসেও মহানবী (সাঃ)-এর নাম আইনদাতা হিসাবে সর্বাগ্রে অংকিত রয়েছে। আমরা সেই মহাসম্মানিত মহানবী (সাঃ)-এর উম্মত। কিন্তু তার জন্মদিন উপলক্ষে আমরা দায়সারাগোছের অল্প কিছু সময়ের ছোটখাটো



www.nagorikpathagar.org

একটা অনুষ্ঠান করে কোনমতে নিজেদের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি। আল্লাহর নবীর উম্মতগণের মধ্যে অনেক মহান আউলিয়া ছিলেন এবং আছেন। মহান আউলিয়াদের প্রতি আমাদের অনুসরণলব্ধ পূর্ণ ভক্তি এবং শ্রদ্ধা আছে। আধ্যাত্মিকতাবাদ ও সুফীবাদের প্রতি সম্মান জানিয়েও বলা যায় যে, আমরা মহান আউলিয়াদের জন্ম বা ওফাত দিবস উপলক্ষে ওরস (বা উরস) ইত্যাদি নামে একাধিক দিনব্যাপী জনাকীর্ণ অনুষ্ঠান করলেও মহানবীর জন্মদিবস উপলক্ষে সত্যিকার অর্থে উল্লেখযোগ্য কিছুই করি না। আজকের আলোচনায় এটিই আমার প্রথম উপস্থাপনীয় প্রতিপাদ্য। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও ব্যক্তিবর্গ সারা বছরে বিভিন্ন সময়ে রাসূলুল্লাহ প্রসঙ্গে অনুষ্ঠান করতে পারে না, তাই অন্তত জন্মদিবস উপলক্ষে এই রবিউল আউয়াল মাসে আমাদের দেশের ও মুসলমান দেশসমূহের সরকারসমূহ, আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের মহানবীর জীবনাদর্শ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করা প্রয়োজন। দেশের সম্মানিত আলেম ওলামাগণ ও শ্রদ্ধেয় পীর-মাশায়েকগণের প্রতি বিনীত আবেদন, যেন মহানবী (সাঃ)-এর জন্মদিবস উপলক্ষে বিস্তারিত বস্তুনিষ্ঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আমাদের দেশে সরকারি পর্যায়ে ইসলামী লেখাপড়া ও চিন্তাভাবনা প্রচার ও প্রসারের জন্য একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন। এই প্রতিষ্ঠান নিজস্ব কর্মপরিধির আওতায় প্রশংসনীয় কিন্তু সীমিত কাজ করছে। শুধু মহানবী (সাঃ)-এর জীবন ও জীবনাদর্শকে নিয়ে গবেষণা করা, গবেষণার ফলাফল দেশব্যাপী ও বিশ্ববাসীর কাছে প্রচার করা এবং অন্যদের গবেষণার কাজে অনুঘটকের কাজ করার জন্য আমাদের দেশে কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই। এ প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব রাখছি। রাজধানী ঢাকায় মহানবীর জীবন ও জীবনাদর্শ গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হোক। বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে এটা করা হোক। অথবা সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে দেশী-বিদেশী দাতাদের সাহায্য নিয়ে প্রাইভেট সেক্টরে বা ব্যক্তি উদ্যোগে এটি করা হোক। মুসলিম দেশসমূহ বা ওই দেশসমূহের ভ্রাতৃপ্রতিম সরকারও আমাদেরকে তাত্ত্বিক ও অন্যান্য দিক দিয়ে এ কাজে সাহায্য করতে পারেন। এই ইন্সটিটিউট স্থাপন আমাদের জাতীয় জীবনে একটি মাইলফলক হবে বলে আমার বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে আমি দেশের সুধীজন ও বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এই নিবন্ধের শিরোনাম হচ্ছে : 'মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষা এবং সমকালীন বিশ্ব'। সমকালীন বিশ্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো অল্প পরিশ্রম ও চিন্তাতেই চিহ্নিত করা যায়। রাজনৈতিক রাষ্ট্রবিন্যাস এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী বনাম দুর্বলের সংঘাত লক্ষণীয়। গত দুশ' বছর ধরে রাষ্ট্রীয় সীমানাসমূহের ভেতর পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিকাশের পর এখন বিশ্বায়ন' বা 'গ্লোবালাইজেশন' নামক তত্ত্বের বাস্তবায়নে সকল কৌশল ও শক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও



www.nagorikpathagar.org

দুর্বলদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়েছে। বস্তুগত বা বৈষয়িক গ্লোবালাইজেশনের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির বিশ্বায়ণেরও দ্রুত প্রসার হচ্ছে। নাস্তিক্যবাদ, পুঁজিবাদ, ভোগবাদ এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে পশুত্ববাদ বা জৈববৃত্তির প্রসার ঘটানো হচ্ছে। ব্যক্তি জীবনে, সংসারে ও সভ্যতায় নৈতিকতার প্রয়োজন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অস্বীকার বা নিদেনপক্ষে অবহেলা করা যাচ্ছে। এসব কিছুর ফলে বস্তুগত সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন হলেও ব্যক্তির মনের ভেতরে শান্তি, পারিবারিক শান্তি, সামাজিক শান্তি এবং আন্তঃরাষ্ট্রীয় শান্তি চরম হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। আমাদের মতো অনুন্নত দেশগুলোতে শাসন ক্ষমতা আহরণের জন্য বিবিধ গর্হিত এবং বহু ক্ষেত্রে নৈতিকতা-বিবর্জিত কাজ করা হচ্ছে বাকস্বাধীনতার নামে, মৌলিক অধিকারের নামে এবং মুক্তচিন্তার নামে।

মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, পারলৌকিক জীবন সর্বত্রই নবীর নাম স্মরণীয়। আজ মুসলিম বিশ্ব এই পবিত্র নামের স্মরণ থেকে বিমুখ এবং স্মরণের অভাবে অনুসরণ হতেও অপারগ হওয়ায় মুসলমান জনগণ হয়েছে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার। নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে দেশে দেশে বিস্তৃত মুসলমান জনগোষ্ঠী বিদেশী শক্তির, বিদেশী সংস্কৃতির এবং বিদেশী অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এ বিপদ থেকে বাঁচতে হলে আমাদের মহানবী (সাঃ)-এর সুন্নত তথা রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, বিচারনীতি ও পারিবারিক রীতি-নীতির নিঃশঙ্ক ও নির্ভেজাল অনুসরণ করতে হবে। অনুসরণের পূর্বশর্ত হল জানা, জানার পূর্বশর্ত হল লেখাপড়া করা বা জ্ঞান অন্বেষণ করা। সঠিক বা কল্যাণমুখী জ্ঞানার্জন নিজ মেধা ও মূল্যেই একটি পুণ্যের কাজ এবং এই পুণ্যের উপরেই অন্য অনেক পুণ্য নির্ভরশীল। তাই মহানবী (সাঃ)-এর সুন্নত তথা রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, বিচারনীতি ও পারিবারিক রীতি-নীতি সম্পর্কে প্রথমে জ্ঞানার্জন করতে হবে, অতঃপর অনুসরণ করতে হবে। অপরপক্ষে যাদের মধ্যে মহানবী (সাঃ)-এর সুন্নত তথা রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, বিচারনীতি ও পারিবারিক রীতি-নীতি সম্পর্কে জ্ঞান আছে তাদের করণীয় হল সেটাকে হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে প্রচার করা। তবেই ইহকাল ও পরকালে শান্তি, মুক্তি ও চিরসুখ অর্জিত হবে। মহানবী (সাঃ)-এর নামের মধ্যে রয়েছে শুধু মুসলমান নয়, বরং সমগ্র মানবতার মুক্তি। সমকালীন বিশ্ব আলোচনা করতে গিয়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যদি উল্লেখ না করি তাহলে এই নিবন্ধের বিষয়বস্তুর প্রতি অবিচার করা হবে। মুসলিম বিশ্ব অনৈক্যের শিকার। মুসলিম বিশ্ব প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত ধনী কিন্তু শিল্পজগতে অতি অনগ্রসর। মুসলিম বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও আবেগের কেন্দ্র মক্কা-মদিনা এবং তার পরেই স্থান হল জেরুজালেমে মসজিদুল আকসা। জেরুজালেম নিয়ে এখন বাকযুক্ত, কূটনৈতিক যুদ্ধ এবং সশস্ত্র যুদ্ধ চলছে। তিন দশকের সংগ্রামের পর একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছিল। সেই সুযোগটিও এখন বড় রকমের প্রশ্নের সম্মুখীন। মুসলমান দেশসমূহ



www.nagorikpathagar.org

অতি বিলম্বে অতি ক্ষীণ একটি সম্মিলিত প্রতিবাদী অবস্থান নিতে চেষ্টা করছে। ইরাক একটি সমৃদ্ধিশালী মুসলিম দেশ ছিল। এখনও প্রচুর সম্ভাবনাময়। ইরাকের ওপর আরোপিত একতরফা অর্থনৈতিক অবরোধ প্রসঙ্গে মুসলিম বিশ্ব সম্মিলিত সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। তুরস্ক ও আফগানিস্তান দুটিই মুসলিম বিশ্বের দেশ। কিন্তু পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে দুটি দেশের অবস্থান বিপরীত মেরুতে। মানসিকভাবে মুসলিম বিশ্ব দ্বন্দ্বে ভুগছে। তাদের বৃহদাংশ চেষ্টা করছে সর্ব আঙ্গিকে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যমুখী হতে। ক্ষুদ্র অংশ চেষ্টা করছে ইসলামী ব্যবস্থার মূলনীতি থেকেও বেশি, আদিরূপকে, কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরতে। কিন্তু বিজ্ঞজনদের মতে উত্তম পন্থাটি হয়তো মধ্যখানেই আছে। অর্থাৎ ইসলামের মূলনীতিগুলোকে আঁকড়ে ধরে মহানবীর শিক্ষাসমূহকে অনুসরণের প্রত্যয় নিয়ে কৌশলগত ও প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্যও পাশ্চাত্যের সাহায্য নিতে হবে। প্রশাসন বা গভর্নেন্সের ব্যবস্থাপনার জন্যও পাশ্চাত্যের সাহায্য নিতে হতে পারে, কিন্তু ইসলামের মূলনীতিসমূহ আঁকড়ে ধরে। বিজ্ঞান বিষয়ে একটি বক্তব্য হল, যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম ঘোষণাগুলো পবিত্র কোরআনের মধ্যেই আছে, তথাপি নিজেদের দৈন্যের কারণে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব ধরে রাখতে পারেনি।

মহানবী (সাঃ)-এর জীবন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন এবং ব্যাপক জ্ঞানের প্রয়োজন। আমার মতো ব্যক্তির সেই জ্ঞান নেই। পত্রিকার কলামও এক কিস্তিতে ব্যাপক আলোচনার স্থান নয়। এতদসত্ত্বেও একজন সাধারণ মুসলমান ও সাধারণ নাগরিক হয়ে সমকালীন বিশ্ব সম্পর্কে আমার মন্তব্যসমূহকে সামনে রেখে মহানবীর জীবনাদর্শের দু'একটি শিক্ষা আমরা আলোচনা করতে চেষ্টা করব। আমাদের সমাজের নৈতিকতা এখন ধ্বংসের দিকে। ব্যক্তি বা জাতীয় জীবনের কোন আঙ্গিকই সফল হবে না সুদৃঢ় নৈতিক ভিত্তি ছাড়া এবং অপ্রিয় হলেও সত্য যে, নৈতিকতাবিরোধী কাজসমূহের উৎপত্তি সমাজের উচ্চস্তর থেকেই। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। মহানবী (সাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন পরনিন্দা না করতে। কিন্তু বাংলাদেশের সমাজের চিত্রটি সম্পূর্ণ উল্টো। সমাজের যত বড় বড় ব্যক্তি, যত ক্ষমতাধর ব্যক্তি তারা ততোধিক পরনিন্দায় ব্যস্ত। বিগত দুই দশকে পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হয়েছে। পত্রিকার পাতা উল্টালেই, সমাবেশ বা মহাসমাবেশে বক্তৃতার খবর শুনলেই আমার কথার প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পাবেন। সাংবিধানিক অনুভূতিতে যেটিকে আমরা পবিত্র মনে করি সেই জাতীয় সংসদেরও বহু কথাবার্তা পরনিন্দায় ভরপুর এবং নৈতিকতা- বিবর্জিত। গঠনমূলক সমালোচনা হচ্ছে তথ্যভিত্তিক এবং সাক্ষীর ও অভিযুক্ত বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আলোচনা। পরনিন্দা হচ্ছে গীবত। একজনের অনুপস্থিতিতে তার নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়া ও চরিত্র হনন করা, সর্বোপরি অসত্য বা অজ্ঞানতার ওপর ভিত্তি করে মন্তব্য করা হচ্ছে গীবত। গীবত করার পরিণাম আখেরাতে গীবতকারীর জন্য যেমন ভয়াবহ, তেমনই অভ্যাসকারী ও শ্রবণকারী সমাজের জন্য দুনিয়াতেও ভয়াবহ।



www.nagorikpathagar.org

এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষের প্রকাশ্যে চরিত্র হননের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ মানসিকভাবে বিক্ষুব্ধ হতে থাকে। এই বিক্ষুব্ধতার প্রকাশও ভয়াবহ হতে পারে। তাই ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্য এই বদঅভ্যাস চর্চা বন্ধ করতেই হবে এবং এই উদাহরণটি স্থাপন করতে হবে আমাদের দেশের উচ্চস্তরের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে, যাদের সারাদেশের মানুষ বিশেষ করে যুবসমাজ অনুসরণ করে থাকে। মহানবীর জন্ম মাসের এটি হোক একটি গুরুত্বপূর্ণ আহ্বান।

মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষার মধ্যে ছিল সামাজিক সুবিচার, নারী ও এতিমের মর্যাদা এবং স্বার্থ সংরক্ষণ। আমরা সেটিও উপযুক্তভাবে করছি না। এ প্রসঙ্গে আমাদের সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। নারী জনগোষ্ঠী শিক্ষায় এখনও অনগ্রসর এবং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ সম্পর্কে নারী জনগোষ্ঠী যেমন নিজেরা অসচেতন, তেমনই পুরুষ জনগোষ্ঠী এ প্রসঙ্গে নারী জনগোষ্ঠীকে সচেতন করতে যথেষ্ট সচেষ্ট নয়। যৌতুক এবং অন্যান্য কারণে দেশের জনগোষ্ঠীর বিশেষত দরিদ্র অংশের নারী সমাজের ওপর যে নির্যাতন এবং অবিচার হয় সেটি প্রতিরোধেও সমাজে যথেষ্ট চেষ্টা নেই। অথচ এগুলো মহানবী (সাঃ)-এর শিক্ষার অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এতিমদের ওপর যে অত্যাচার নীরবে আমাদের সমাজে সংঘটিত হয়, তার জন্যও কোন বিশেষ বা সুনির্দিষ্টভাবে নিবেদিত প্রচেষ্টাও নেই বা সংগঠনও নেই। অপর একটি উদাহরণ দিই। ভোগবাদী ও বস্তুবাদী কুপ্রেরণা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে চালিত করছে। দেশে যাকাত বোর্ড আছে কিন্তু নেতৃস্থানীয় কোন রাজনীতিবিদ বা অর্থনীতিবিদ একবারের জন্যও বলছে না সেটিকে কেমন করে ফলপ্রসু ও কার্যকর করা যায়। অথচ অর্থনীতিতে সুবিচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সেটি হতে পারত একটি সূচনাকারী মহৎ উদ্যোগ। অতএব 'অর্থই সকল অনর্থের মূল'-এ প্রবাদকে মনে রেখে জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি।

আমাদের মতো সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত সাংসারিক কর্মে ও মোহে আবিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি মহানবী (সাঃ)-এর জীবন ও আদর্শ নিয়ে কোন আলোচনা করি তাহলে বিদগ্ধ পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ইসলামী জ্ঞানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের যে কাজটি করা উচিত বা যে কাজটি করা শোভনীয়, সে কাজটি আমরা কেন করছি? এই প্রেক্ষিতে আমার বিনীত মন্তব্য হবে যে, নাগরিক সমাজে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আমাদের মতো সাধারণ লোকেরই সংখ্যাধিক্য। আমাদের সাধারণ ভাষায় সাধারণ অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য এই বিনীত চেষ্টা, বিশেষজ্ঞরা তো আছেনই।

দৈনিক যুগান্তর ০২/০৬ ও ০৯ জুলাই ২০০১



www.nagorikpathagar.org

# সকলের জন্য ক্ষমা চাই, সকলের চাই মঙ্গল

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই অষ্টম জাতীয় সংসদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যদিও কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত নাও হতে পারে। নির্বাচন না হলে জাতীয় রাজনৈতিক জীবনের ভবিষ্যৎ এক রকম হবে এবং নির্বাচন হলে অন্য রকম হবে এ কথা সহজেই অনুমেয়। আমি নিজেও বহুল প্রচারিত যুগান্তরসহ অন্য অনেক পত্রিকায় লিখেছি যে, আগামী নির্বাচন আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু নিজেদের বুকে হাত দিয়ে নীরবে নিজেদের অন্তরকে যদি প্রশ্ন করি যে নির্বাচিত আগামী সংসদই কি দেশের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারবে? সংসদ মানে কি? সুন্দর একটি দালান নাকি নির্বাচিত সদস্যগণ? সবাই জানি, সম্মানিত সংসদ সদস্যদের চারিত্রিক গুণাবলী ও কর্মদক্ষতা সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যাবলীর কারণেই তারা সফল হবেন বা বিফল হবেন। প্রতিবারই পুরো নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াটি ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতিকে বিতর্কিত পন্থায় জড়িয়ে শুরু করা হয়। এই প্রসঙ্গে বক্ষ্যমাণ নিবন্ধ।

আমাদের দেশের বড় বড় রাজনৈতিক নেতা তাদের রাজনৈতিক জীবনের বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ সময় (যেমন নির্বাচনের আগে) সৌদি আরবে 'ওমরাহ করতে যান বা আগে সিলেটে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর দরগায় জিয়ারত করতে যান। বলতে গেলে এসব একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গেই আমার এই কিস্তির নিবেদন। টেলিভিশনের বদৌলতে অনেকেই মক্কায় অবস্থিত পবিত্র কা'বা শরিফ অথবা মদীনায় অবস্থিত মহানবী (সাঃ)-এর রওজা ও মসজিদে নববীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। অপরাহ্নে আছরের আযানের সময় বা সূর্যাস্তের পর পর মাগরিবের আযানের সময় বা রাত্রির প্রথম প্রহরে এশার আযানের সময় টেলিভিশনে বেশির ভাগ সময় কা'বা শরিফের দৃশ্য দেখানো হয় এবং ওখানকার রেকর্ডকৃত আযান শোনানো হয়। গত প্রায় চব্বিশ বছর যাবৎ বাংলাদেশ টেলিভিশনে পবিত্র হজের দিন সৌদি আরবে মক্কা নগরীর অদূরে অবস্থিত আরাফাতের ময়দানে অনুষ্ঠিত হজ 'হালনাগাদ' (লাইভ) দেখানো হয়। ওই সুবাদে আগ্রহী দর্শকরা হজ অনুষ্ঠানের সঙ্গেও পরিচিত হয়ে যান। কঠিন তত্ত্ব এড়িয়ে সাদামাটা ভাষায় বলতে গেলে ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হজ একটি। হজ কার ওপর ফরজ বা বাধ্যতামূলক এটা একটা সঙ্গত প্রশ্ন। বাড়ি থেকে মক্কা শরিফ যাওয়া-আসার ও এতদসংক্রান্ত ব্যয়ভার ও তৎসময়ে স্বীয় পরিবারের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম, শারীরিক দিক থেকে সমর্থ, প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানবান মুসলমানগণের ওপর জীবনে একবার হজ পালন করা ফরজ বা বাধ্যতামূলক। হজ করার সুনির্দিষ্ট সময় আছে।



www.nagorikpathagar.org

হিজরি বছরের ১২তম মাস অর্থাৎ জিলহজ মাসের ৮ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত এই ছয় দিনেই হজের বিভিন্ন দায়িত্বগুলো পালন করা হয়। অতি সঙ্গত ভৌগোলিক কারণে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসাবে হজের তারিখ ১০ দিনের ধাপে ধাপে কাছে আসতে থাকে।

হজ তিন প্রকার। এর বিস্তারিত বর্ণনা প্রয়োজন নেই। যে শব্দটি আমাদের দেশে বেশি প্রচলিত সেটি হচ্ছে 'উমরাহ' বা 'ওমরাহ'। অনেকেই সচরাচর শুধু ওমরাহ'র বদলে ওমরাহ-হজ নামটিও ব্যবহার করে থাকেন। ওমরাহ আরবি শব্দ; অর্থ জিয়ারত করা বা ভ্রমণ করা। হজের নির্দিষ্ট দিনগুলো অর্থাৎ ৮ জিলহজ থেকে ১৩ জিলহজ সময়কাল ব্যতীত অন্য যে কোন সময়ে শরিয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাবা শরিফ তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়া সায়ী করাকে ওমরাহ বলে। শরিয়তবিদগণ বলেন, 'সক্ষম হলে সারা জীবন একবার ওমরাহ করা 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ'। ওমরাহ করলে অবশ্যই বিপুল পরিমাণ সওয়াব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং কাবা শরিফে বিশেষ বিশেষ কয়েকটি জায়গায় দোয়া কবুল হওয়ার জন্য যেহেতু নির্দিষ্ট আছে, অতএব হজের সময়ের মতো, ওমরাহ করার সময়ও ওই বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। সওয়াবের জন্য বা দোয়া কবুল হওয়ার জন্য আগ্রহী মুসলমানগণ ওমরাহ পালন করেন। আমাদের দেশের বড় বড় রাজনৈতিক নেতৃবর্গও হয়তো-বা এজন্যই যান। এখন প্রশ্ন একজন সাধারণ মানুষ ওখানে গিয়ে কি প্রার্থনা করেন? আমার পক্ষে সেটা বলা সম্ভব নয় তবে অনুমান করি যে, নিম্নলিখিত প্রার্থনাগুলো হয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও রহমত প্রাপ্তি, মৃত নিকট আত্মীয়দের আত্মার মাগফেরাত, নিজের, স্ত্রীর বা স্বামী এবং পুত্র-কন্যাদের ও স্ত্রী-পুত্রের গুণাহসমূহের জন্য ক্ষমা, পিতামাতার গুণাহসমূহের ক্ষমা, পিতা-মাতার সুস্বাস্থ্য, নিজেদের সুস্বাস্থ্য, চাকরিজীবী হলে-চাকরিতে উন্নতি, ছাত্রদের প্রসঙ্গে লেখাপড়ায় উন্নতি ও ভাল ফলাফল, ব্যবসা প্রসঙ্গে ব্যবসায় উন্নতি ও উত্তরোত্তর বেশি টাকা-পয়সা উপার্জন, রোগী প্রসঙ্গে রোগ মুক্তি, বেকারত্ব প্রসঙ্গে চাকরিপ্রাপ্তি, মামলা মোকদ্দমায় জড়িত থাকা প্রসঙ্গে সেগুলো থেকে অব্যাহতি বা প্রতিপক্ষের ওপর সাফল্য ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কিছুর পরে, প্রায় সকল সচেতন মুসলমান পৃথিবীর অন্য সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করেন, নিজের দেশের জন্য ও দেশবাসীর জন্য দোয়া করেন এবং বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানগণ যেসব কষ্ট বা ঝামেলার মধ্যে নিমজ্জিত সেগুলো থেকে উত্তরণের জন্য দোয়া করেন।

এখন জানতে ইচ্ছে করে, বড় বড় রাজনৈতিক নেতা কি অতিরিক্ত আর কিছু দোয়া করেন? আমার পক্ষে এর উত্তর দেয়া সম্ভব না। কিন্তু একজন উঁচুমানের রাজনৈতিক নেতার রাজনৈতিক জীবন বা ক্যারিয়ারের অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে যদি তিনি ওমরাহ করতে যান তাহলে যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে তিনি সমকালীন পরিস্থিতিতে তার নিজের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে দোয়া করবেন বা তার দলের জন্য দোয়া করবেন এবং হয়তো-বা দেশের জন্য দোয়া করবেন। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে বিখ্যাত



www.nagorikpathagar.org

রাজনৈতিক নেতারা যদি ইদানীং ওমরাহ করতে যান তাহলে অতি যুক্তিসঙ্গতভাবে আমরা অনুমান করতে পারি যে আগামী নির্বাচনে তারা তাদের নিজের সাফল্যের জন্য বা নিজের দলের সাফল্যের জন্য তিনি অবশ্যই দোয়া করবেন। খারাপ কি! প্রত্যেকেই নিজে নিজের বিষয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন। সাফল্য চাইবেন এটাই তো স্বাভাবিক। তবে হ্যাঁ, দলের সাফল্য চাওয়া মানে আগামী নির্বাচনে বিভিন্ন আসনে দলের প্রার্থীদের জন্য সাফল্য চাওয়া। সেই প্রার্থী হত্যাকারী হন বা ব্যাংকের টাকা আত্মসাৎকারী হন বা কয়েক লাখ টাকা টেলিফোন বিলখেলাপি হন বা কোটি কোটি কালো টাকার মালিক হন ইত্যাদি সব ধরনের লোকের সাফল্য। বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা এরকম কোন দোয়া কি করেন : 'হে আল্লাহ তুমি আমাকে সৎলোক প্রার্থী পাইয়ে দাও। হে আল্লাহ তুমি আমার দলের সব প্রার্থীকে সৎলোক বানিয়ে দাও। তাদের সবার অন্তরে জনগণের প্রতি আন্তরিক ভালবাসার সৃষ্টি করে দাও। জনগণের উপকার করার মানসিকতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দাও। জনগণের পক্ষে থেকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সৎ উপার্জনের মাধ্যমে তারা যেন নিজেরা চলে ও অন্যকে চলতে উৎসাহিত করে সেই মানসিকতার সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ, আমি যেন তোমার আদেশ মেনে চলতে পারি এবং তোমার দান করা দ্বীনের প্রসার ঘটাতে পারি সেই সুযোগ ও মানসিকতা আমাকে দাও। নিজের প্রশ্নের উত্তরে নিজেই বলি যে, যথাসম্ভব এরকম কোন প্রার্থনা করা হয় না। তাহলে কি রকম করা হয়? যথাসম্ভব একজন বড় রাজনৈতিক নেতা দোয়া করবেন অনেকটা এইরকম 'হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার দলকে নির্বাচনে জিতিয়ে দাও। আমাকে এবং আমার দলকে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বসিয়ে দাও। বাংলাদেশের অমুক-অমুক দলকে তুমি জিততে দিও না।' সম্মানিত পাঠককুল চিন্তা করলেই বুঝবেন এই ধরনের ওমরাহ কি ধর্মীয় ওমরাহ না ইলেকশন ওমরাহ বা রাজনৈতিক ওমরাহ? এই ধরনের কর্মকাণ্ডে মহান 'ইসলাম ধর্মের' ইজ্জত বাড়ে না কমে? আরও কথা আছে। ওমরাহ করতে গেলে, হজের মতো তাওয়াফ করতে হবে। তাওয়াফের শাব্দিক অর্থ কোন কিছুর চারদিকে ঘোরা। হজের ক্ষেত্রে কা'বা শরিফের চতুর্দিকে ঘোরাকে তাওয়াফ বলা হয় এবং সাতবার তাওয়াফ করতে হয় বা সাতটি চক্কর দিতে হয়। তাওয়াফ করার সময় পড়ার জন্য কঠোরভাবে বাধ্যতামূলক দোয়া নেই। তবে প্রাচীন বুজর্গ ব্যক্তিদের থেকে শিক্ষার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে বর্তমান মুসলিম সমাজে সাতটি চক্করের জন্য সাতটি দোয়া প্রচলিত আছে। সকল বাঙালি হাজীরা বা ওমরা হজ পালনকারীরা এগুলো পাঠ করেন। যারা আরবি পড়তে জানেন তারা প্রথমে আরবিতে পড়েন এবং পরে বাংলা অর্থ পড়েন। যারা আরবি পড়তে জানেন না তারা হয় বাংলা ভাষায় লিখিত উচ্চারণে আরবি পড়েন এবং পরে বাংলা অর্থ পড়েন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ (ভিআইপি) ব্যক্তি তাওয়াফ করতে গেলে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সঙ্গে থাকেন, তিনি জোরে জোরে দোয়া পড়েন এবং ভিআইপি ও তার সঙ্গীরা সেটা পুনরুক্ত করতে থাকনে। তাওয়াফের সাত চক্করে এবং তাওয়াফের পর মাকামে ইবরাহিম বা মুলতায়ামে সকল প্রকারের মুসলমানগণ কর্তৃক যে



www.nagorikpathagar.org

দোয়াগুলো পড়া হয় তার মধ্য থেকে আমি গুরুত্বপুর্ণ কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি : "(এক) হে আল্লাহ : আমি তোমাকেই মাবুদ স্বীকার করছি এবং তোমাকেই সত্য জেনেছি এবং তোমার কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি এবং তোমার নবী ও প্রিয় হাবিব আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাঁবেদারি করে তোমার নিকট দেয়া ওয়াদা পালন করেছি। (দুই) হে আল্লাহ : কুফরি, অবাধ্যতা ও অপরাধপ্রবণতার প্রতি আমাদের অন্তরসমূহে ঘৃণার সঞ্চার কর এবং আমাদেরকে সত্য পথের পথিক বানাও। (তিন) হে আল্লাহ : তোমার সন্তুষ্টি এবং বেহেশতই তোমার কাছে কাম্য। তোমার অসন্তুষ্টি এবং জাহান্নামের আগুন হতে তোমার দরবারে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (চার) হে আল্লাহ : আমাকে গোমরাহির অন্ধকার হতে বের করে হেদায়েতের আলোকে আলোকোজ্জ্বল করো। (পাঁচ) হে আল্লাহ : তোমার নবী আমাদের নেতা মোহাম্মদ (সাঃ) তোমার কাছে যেসব কল্যাণ ও মঙ্গল চেয়েছিলেন সেগুলো আমি তোমার নিকট চাচ্ছি এবং যে অকল্যাণ হতে তোমার নবী, আমাদের নেতা মোহাম্মদ (সাঃ) তোমার কাছে আশ্রয় চেয়েছিলেন সেগুলো হতে আমিও তোমার আশ্রয় চাচ্ছি। (ছয়) হে আল্লাহ : আমার প্রতি তোমার অর্পিত অনেক দায়-দায়িত্ব আছে যা কেবল তোমার-আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আরও অনেক দায়-দায়িত্ব আমার ওপর রয়েছে যা তোমার সৃষ্টি ও আমার মাঝে সীমাবদ্ধ। হে আল্লাহ, আমার ওপর তোমার যে হক আছে তা ক্ষমা করে দাও এবং তোমার সৃষ্টির হকগুলো আদায়ের দায়িত্ব তুমিই বহন করো। তোমার হালাল দ্বারা তোমার হারাম হতে আমাদের মুক্ত রাখো। (সাত) হে আল্লাহ : আমার জ্ঞান-গরিমা বাড়িয়ে দাও এবং সৎকর্মশীলগণের দলে আমাকে শামিল করো। (আট) হে আল্লাহ : আমি তোমার কাছে চাচ্ছি এমন ঈমান– যা আমার অন্তরে স্থান লাভ করবে এবং এমন সাচ্চা ইয়াকীন– যাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে আমার জন্য যা তুমি নির্ধারিত করে রেখেছ তা-ই আমার জীবনে ঘটবে এবং তুমি যা আমার ভাগ্যে রেখেছো তাতে যেন আমি রাজি থাকতে পারি। আমাকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দিও এবং সৎকর্মশীলগণের সাথী করো।'

ওমরাহ করার সময় দ্বিতীয় আবশ্যকতা হচ্ছে সায়ী করা। সায়ী অর্থ হচ্ছে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানটুকু হাঁটা (একটি সুনির্দিষ্ট অংশ হালকাভাবে দৌড়ানোসহ)। এই হাঁটাটি সাতবার করতে এবং সাতটি দোয়া পড়া হয়। সেই দোয়াগুলো থেকেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি : "(এক) হে আল্লাহ : তুমি সবই জানো : যা আমরা জানি না তাও জানো, তোমার শক্তি আর অনুগ্রহের তুলনা নেই। (দুই) হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের গুনাহ মাফ করো আমাদের সব অন্যায় অনাচার মোচন করে দাও, আর আমাদের মৃত্যু দাও সৎলোকদের সঙ্গে। (তিন) হে আল্লাহ : হে প্রভু আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, বিভ্রান্ত করো না আমার অন্তরকে সত্য পথ দেখানোর পর। (চার) হে আল্লাহ : তোমার কাছে আমার প্রার্থনা যেমন করে ইসলামের পথ আমাদের দেখিয়েছ তেমনই আমার নিকট হতে তা ছিনিয়ে নিও না মরণ পর্যন্ত, আর মরণ যেন হয় আমার মুসলমান হিসাবে। (পাঁচ) হে আল্লাহ : দেখাও



www.nagorikpathagar.org

আমাকে সরল পথ, নিষ্পাপ করো আমাকে তাকওয়ার সাহায্যে, আমাকে মাগফিরাত করো দুনিয়া আর আখিরাতে। (ছয়) হে আল্লাহ : আমি তোমার নিকট তোমার সন্তুষ্টি এবং বেহেশত চাচ্ছি এবং আশ্রয় চাচ্ছি তোমার ক্রোধ ও দোযখ হতে এবং যে সমস্ত কথা ও কার্যক্রম দোযখের নিকটবর্তী করে ওই সব কথা ও কার্যক্রম হতে। (সাত) হে আল্লাহ : তুমি আমাকে যা দান করছো এবং যা দান করোনি, সব কিছুর অশুভ হতে তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করছি। হে আল্লাহ আমাদিগকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু দান করে নেক বান্দাদের সঙ্গে আমাদের মিলন করে দাও।"

সম্মানিত পাঠক, বিশেষ করে যারা জীবনে কোন সময় ওমরাহ করেছেন বা সম্প্রতিকালে ওমরাহ করেছেন তাদের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই প্রার্থনাগুলোর প্রতি। কা'বা শরিফে বলে আসার পর শুধু মাথায় টুপি পরলেই কি যথেষ্ট হবে? কি বলে আসা হয় সেই কথাগুলো কি মনে রাখা উচিত নয়? টেলিভিশনের বিভিন্ন প্রশ্নকারীগণ বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। তারা বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিকে এই প্রার্থনাগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে তারা আল্লাহর কাছে যা যা বলে এসেছেন ঐগুলো কতটুকু মনে রেখেছেন? আসলে কথা দিয়ে কথা না রাখা অর্থাৎ ওয়াদা ভঙ্গ করা আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। তবে এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য, সুনির্দিষ্টকালে কাউকে ওয়াদা ভঙ্গকারী হিসাবে চিহ্নিত করা নয়, কিন্তু আলোচনার পার্শ্বপ্রভাবে যদি কেউ চিহ্নিত হয়ে যান তাহলে কিছু করার নেই, একটি কাজ ব্যতীত--যথা : সকলে মিলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা চাওয়া।

এখন আলোচনার এ পর্যায়ে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর দরগাহ জিয়ারত সম্পর্কে আলোচনায় আসি। আমি নিজেও বহুবার এই পবিত্র জায়গায় জিয়ারতের জন্য গিয়েছি। দেশের ভেতর নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করার আগে বড় বড় রাজনৈতিক নেতারা সিলেটে হযরত শাহজালাল (রহ:)-এর দরগাহ জিয়ারত করেন। দরগাহের কেন্দ্র হচ্ছে মূলত কবর, যাকে সম্মান করে মাজার বলা হয়। কবর জিয়ারত করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম ও কিছু পরামর্শ ধর্মীয় শিক্ষায় দেয়া আছে। বড় বড় সাধক তথা আওলিয়াগণের মাজার জিয়ারতে দুটি আঙ্গিক আছে। একটি আঙ্গিক হচ্ছে জাগতিক বা শরীয়ত মোতাবেক, আরেকটি আঙ্গিক হচ্ছে রূহানি বা আত্মা সম্পর্কিত। এ প্রসঙ্গে অধিকতর আলোচনায় এই মুহূর্তে না যাওয়া শ্রেয়। বরং প্রশ্ন করি যে, এই ঐতিহ্য বা রেওয়াজ কি কারণে শুরু হল। আমার পক্ষে উত্তর দেয়া সম্ভব না যতক্ষণ না ঐ রেওয়াজ বা ঐতিহ্য অনুসরণকারীগণ নিজের মুখে না বলছেন। তথাপিও অনুমান করতে পারি। একটি অনুমান এই যে, হযরত শাহ জালাল (রহঃ) ও হযরত শাহ পরান (রহঃ)-এর দরগাহ জিয়ারত করে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করলে প্রচারণার কাজ ভালভাবে এগুবে এবং প্রচারণার কাজ ভালভাবে এগুলে নির্বাচনে জয়লাভ সহজতর হবে। অপর একটি অনুমান এই যে, যেহেতু হযরত শাহজালাল (রহঃ) আল্লাহর বড় আওলিয়া ছিলেন, অতএব উনাদের মাজার জিয়ারত করলে উনারা খুশি হবেন এবং



www.nagorikpathagar.org

সেই খুশির প্রভাব নির্বাচনী প্রচারণার ওপর পড়বে। তৃতীয় একটি অনুমান এই যে, ওনাদের মাজার জিয়ারত করলে আল্লাহ খুশি হবেন এবং খুশি হয়ে সব কাজে সাফল্য দেবেন। আমার তিনটি অনুমানের কোনটিই পুরোপুরি সঠিক না হলেও সবকটি অনুমানের অংশবিশেষ সঠিক হতে পারে। এমনকি কোন অনুমানই আসলে সঠিক নাও হতে পারে।

কিন্তু হযরত শাহজালাল (রহঃ) ছিলেন সত্য পথের যোদ্ধা এবং ন্যায়ের পথের যোদ্ধা। যাদের নির্বাচনী সাফল্যের জন্য হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর দরগায় গিয়ে দোয়া করা হয় তারা কি সকলেই সত্য ও নায়ের পথের লোক? শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা অপহরণকারী কেউ কি সেখানে নেই? চোরাচালান বা কালোবাজারি করে বড়লোক হওয়া এমন কি কেউ সেখানে নেই? সকলেই কি জনদরদী? ইত্যাদি আরও অনেকে প্রশ্ন করা যায়। অপরপক্ষে যথাসম্ভব সত্যবাদী, যথাসম্ভব সৎ ও দেশপ্রেমিক লোককে নির্বাচনে প্রার্থী করলে হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর প্রতি কি বেশি শ্রদ্ধা দেখানো হতো না?

আমরা ওমরাহ করা এবং হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর দরগাহ জিয়ারত করা ও নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যে একটা সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা করলাম। নির্বাচনী প্রচারণা ও জনগণের অনুভূতির মধ্যেও সম্পর্ক আছে। বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের শতকরা ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ হচ্ছে ইসলাম ধর্মাবলম্বী। মুসলমান ভোটারদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৬৫ থেকে ৭০ ভাগ অবস্থান করছেন নিভৃত পল্লী অঞ্চলে। তারা সহজ এবং সরল প্রাণ মুসলমান। তাদের কাছে যখন এই তথ্য বা ধারণা উপস্থাপিত হয় যে, 'অমুক' রাজনৈতিক নেতা ওমরাহ সম্পাদন করে বা হযরত শাহজালাল (রহঃ)-এর মাজার জিয়ারত করে কাজ শুরু করেছেন তখন সেই সহজ-সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা আবেগে আপ্লুত হয়ে ওই ওমরাহ পালনকারী বা জিয়ারতকারীর সাফল্য কামনা করেন।

আমরা এমনিতেই অবহেলায় পারদর্শী। এই অনুচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি উদাহরণস্বরূপ মাত্র। লাখ লাখ মুসলমান নর-নারী প্রত্যেক শুক্রবারে জুমার নামাজ আদায় করতে মসজিদে যায়। বিগত বেশ কিছু বছর যাবৎ ক্রমশ দেশব্যাপী একটি ভাল প্রথা চালু হয়েছে যে, আগে ইমাম সাহেব বাংলায় কিছু বক্তব্য রাখেন। বিতর্ক এড়াবার জন্য ইমাম সাহেব আনুষ্ঠানিক 'প্রথম খুৎবায়' যে বক্তব্য দেয়া হবে সেটাই বাংলায় অল্প ভাব-সম্প্রসারণ করে বলে দেন। প্রত্যেক জুমার জন্য আলাদা আলাদা বক্তব্য নির্ধারিত থাকে যাতে করে বছরে পঞ্চাশ বা একান্ন বা বায়ান্ন যে কয়টি শুক্রবারই আসে সে কয়টি ভিন্ন বিষয় আলোচনা করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় খুৎবাটি সারা বছরের জন্য একই। কারণ সেটি মূলত আল্লাহতায়ালার প্রশংসা, মহানবী (সাঃ)-এর প্রশংসা, অন্য মহৎজনদের প্রশংসা, মহানবী (সাঃ) থেকে নিয়ে আমাদের কাল পর্যন্ত অনেকের জন্য এবং নিজেদের জন্য দোয়া এবং নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু প্রার্থনা। যদি একটি জরিপ চালানো হয় যে, বাংলাদেশের যত সংখ্যক মুসলমান জুমার নামাজ



www.nagorikpathagar.org

আদায় করেন এবং তাদের মধ্যে যারা অন্তত পক্ষে দশম শ্রেণী পাস করেছেন এবং কম কতজন এই দ্বিতীয় খুৎবার অর্থ বা মর্মার্থ জানেন, তাহলে শতকরা পাঁচ ভাগ পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। এ খুৎবা ঘেঁটে দেখেছি এবং আমি ভীত হৃদয়ে বলতে চাই যে, আমরা প্রত্যেক শুক্রবার কিছু দোয়া চেয়ে আসি, কিছু সম্মিলিত প্রতিজ্ঞা করে আসি, কিন্তু পরবর্তী সাড়ে ছয় দিন সেগুলোর বিপরীত কাজ করি। একটি বারের জন্য যদি আমরা স্থির চিত্তে চিন্তা করতাম তাহলে হয়তো-বা আমরা এ রূপ পথভ্রষ্ট হতাম না। দোয়ার মাধ্যমে আমরা আল্লাহর কাছে ওয়াদা দেই যে, আমরা কোরআনে প্রদত্ত আল্লাহর হুকুম মেনে চলব কিন্তু বাস্তরেব হুকুমগুলো কি তাও জানতে চেষ্টা করি না। আমরা ওয়াদা দেই যে, নির্লজ্জতাজনক কাজ করা ও সীমা লংঘন করা থেকে আমরা বিরত থাকব, কিন্তু আমরা অহরহ এ দুটি করতে থাকি; আমরা ঘোষণা করি যে, আল্লাহ তায়ালার জিকিরই সর্ব্বোচ্চ ও সমধিক মর্যাদাবান ও সর্বাধিক মহান কিন্তু সারা দিন অন্য প্রকারের ও অন্যের জিকির শোনা ও করায় ব্যস্ত থাকি। এই রকম ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বা বিপরীতমুখী আচরণ মাত্রা নিয়ে কি নিয়মে আমরা জাতি হিসাবে অগ্রগতি করব। আগামী নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। যথাসম্ভব শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে অষ্টম পার্লামেন্ট গঠিত হবে। তাতে কি বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানের পথ খুলে যাবে? আমার মতে, মোটেও না। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসিতে যদি নৈতিকতা না থাকে, স্বচ্ছতা না থাকে, দেশপ্রেম না থাকে তাহলে সেই পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হবে না। অপরপক্ষে বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোনও বিকল্প যেমনই কাঙ্ক্ষিত নয় তেমনই কল্পিতও নয়। ১৯৮২ সালের মার্চ থেকে নিয়ে পরবর্তী ২/৩ বছর সামরিক সরকার ছিল। সামরিক সরকার মানে ৫/৬ জন উচ্চপদস্থ জেনারেল সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং আর কিছু কিঞ্চিৎ নিম্নপদস্থ অফিসার মার্শাল ল' ইনকোয়ারি, মার্শাল ল' কোর্ট ইত্যাদি নিয়ে ধূমপান করে ব্যস্ত ছিলেন। মার্শাল ল' শাসনকালে বিভিন্ন আধা-রাজনৈতিক ও বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালে অফিসাররা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ার অনানুষ্ঠানিক অভিযোগ প্রচুর সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাপটে, মার্শাল ল' শাসনের দ্বারা দেশের জন্য ষোলআনার মধ্যে হয়তো চার আনা ভাল কাজ হয়েছিল এবং সামরিক বাহিনীসমূহের জন্য ষোলআনার মধ্যে বারো আনা দুর্নাম সৃষ্টি হয়েছিল। এতএব কোন যুক্তিতেই এটাও বলা যাচ্ছে না যে মার্শাল ল' শাসন হলেই দেশের উন্নিতি হবে। এ পর্যায়ে গত ১৩ আগস্ট ২০০১ দৈনিক সংবাদের উপ-সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় জনাব মুনীরুজ্জামান লিখিত কলামের কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করছি। এই অংশে ব্যক্ত করা ভাবের সঙ্গে বাংলাদেশের চিন্তাশীল সমাজের একটি বৃহদাংশই একমত। 'আওয়ামী লীগ-বিএনপির ধারা থেকে যে কেউ রাজনীতিকে বের করে আনার চেষ্টা করতেই পারে, যার যার রাজনৈতিক বিশ্বাস অনুযায়ী উদ্যোগও নিতে পারে। কিন্তু সেই উদ্যোগটা নিশ্চিতভাবেই সাংবিধানিক এবং গণতান্ত্রিক হতে হবে। এর বাইরে কিছু করার চেষ্টা করা হলে সেটা হবে ষড়যন্ত্র এবং



www.nagorikpathagar.org

অভ্যুত্থান বা ক্যু সিভিল অথবা মিলিটারি। গণতন্ত্র যত খারাপই হোক না কেন এখন পর্যন্ত এর কোন বিকল্প আবিষ্কৃত হয়নি। বাংলাদেশে যারা আবিষ্কার করার উদ্যোগ নিচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে তাদের উদ্যোগে আর যাই থাকুক গণতন্ত্র নেই। এখন যে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে দেশ রয়েছে, আমরা আরও অনিশ্চয়তা আর নৈরাজ্যের দিকে যেতে চাই না। সিভিল সমাজের আনসিভিল অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য যতই 'মহৎ' থাকুক না কেন তার পরিণতি যে আরো ভয়াবহ সে বিষয়ে সন্দেহ না থাকাই ভাল।

তাহলে এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে আমরা কি করতে পারি? যেহেতু দূষিত পারিপার্শ্বিকতা ও আবহাওয়ায় বড় হয়ে সকল প্রকারের বেশিরভাগ বাঙালির অভ্যাসই দূষিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠছে। অতএব চাপ দিয়ে জোর করে দুর্নীতির জন্য প্রকাশ্য দোষারোপ করে দুর্নীতি ও দূষণ থেকে বের হয়ে আসার জন্য বাধ্য করা ছাড়া আমি আর এমন কোন দৃশ্য চিন্তা করতে পারছি না, যার মাধ্যমে নির্বাচিত নীতি-নির্ধারক ও নির্বাচিত শাসকগণকে সৎপথে আনা যায়। শুধু পাঁচ বছর পর ভোট প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা উপহার পেয়ে বা না পেয়ে বা মিষ্টি কথা পেয়ে বা প্রতিজ্ঞা পেয়ে বা ভাল ব্যবহার পেয়ে বা এমনি এমনিই একটি ভোট দিয়েই একজন নাগরিকের দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না। পাঁচ বছর পর পর ভোট চাওয়ার আগে যেই আচার-আচরণের নাটক সৃষ্টি করা হয় ওই প্রক্রিয়ার নাম 'জনগণের নিকট জবাবদিহিতা' নয়। বাংলাদেশের নাগরিকগণকে অধিকতর সচেতন হবার সময় এসেছে। পাঁচ বছর পর কান্নাকাটি ও হাতজোড় করে নয়, তার আগেই ধাপে ধাপে বা ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বা সময়ে সময়ে বা ঘটনায় ঘটনায় পার্লামেন্ট সদস্যগণকে নাগরিক সমাজের নিকট জবাবদিহিতা করতে হবে। বাংলাদেশের সাত কোটি ভোটার যেহেতু একসঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বা এক জায়গায় একত্র হয়ে পার্লামেন্ট সদস্যগণের নিকট কৈফিয়ত চেতে পারে না বা পারবেন না, সেহেতু কিছু সংখ্যক নাগরিক যারা তুলনামূলকভাবে অধিকতর শিক্ষিত, তুলনামূলকভাবে অধিকতর চিন্তাশীল, তুলনামূলকভাবে অধিকতর সোচ্চার তাদের যথাসম্ভব নিজেদের কার্যক্রম সমন্বয় করে সাধারণ ভোটারদের পক্ষ থেকে পার্লামেন্টের সদস্যগণের নিকট জবাব চেতে হবে। এর একটা ব্যবস্থা বের করতেই হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের ত্রিশটি বছর যথেষ্ট অর্থবহ ও সাফল্যজনক হয়নি। আগামী ত্রিশ বছরকে সাফল্যজনক ও অর্থবহ করতেই হবে- এর কোন বিকল্প নেই। অনুগ্রহপূর্বক সকল 'ওমরাহ-হজ-পালনকারী' এবং সকল 'সিলেট-মাজার-জিয়ারতকারী', আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন যেন আপনাদের আল্লাহ ওইরূপ নেতৃত্ব প্রদানের জন্য সাহস, শক্তি, চরিত্র ও জ্ঞান দান করেন। একই সঙ্গে আমরা দোয়া করছি যারা আল্লাহর কাছে এ রকম প্রার্থনা করেন এবং বাস্তবে অন্য কিছু করবেন তাদেরকে যেন প্রতিজ্ঞা রক্ষার সৎসাহস দেয়া হয়।

দৈনিক যুগান্তর ১৮/০৮/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

# রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - এর জীবন, কুরআন এবং সরকারের জবাবদিহিতা

আগামীকাল দিবাগত রাতে লাইলাতুল বরাত বা শব-ই-বরাত বা ভাগ্য রজনী পালিত হবে। মুসলমানদের জন্য এটি এবাদতের রাত্রি। এই দিনে বা রাতে একা একা যেমন এবাদত করা যায় তেমনই সম্মিলিতভাবেও করা যায়। এবাদতের অন্যতম পরিচিত উদাহরণ হচ্ছে অতিরিক্ত নফল নামাজ পড়া বা কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করা বা ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠান করা ইত্যাদি। এই দিনে, সুধী পাঠক সমাজের সঙ্গে আমি আমাদের পবিত্র গ্রন্থ কুরআন, আমাদের নবী (সাঃ) এবং উভয়ের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে কিছু আলোচনা বা মতামত বিনিময় করতে চাই। আমরা প্রত্যেকে নিজেদের ব্যক্তিগত ভাগ্যোন্নয়ন নিয়ে যেমন চিন্তিত, তেমনটি হয়তো-বা সম্মিলিত বা জাতিগত বা গোষ্ঠীগত ভাগ্যোন্নয়নের জন্য জন্য চিন্তিত না। কিন্তু দ্বীন ইসলামে ব্যক্তি এবং সমাজ এতই নিবিড়ভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে এদের পারস্পরিক স্বার্থ আলাদা করে দেখা মুশকিল। পত্রিকার কলামের মাধ্যমে তাই এই সম্মিলিত আলোচনা বা মতামত বিনিময়।

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন শরীফে ঘোষণা করেছেন যে,"আমি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছি আমার এবাদত করার জন্য"। এই এবাদত মানে কি দিবা-রাত্রি সারাক্ষণ নামাজ পড়া? অথবা দিবা-রাত্রির বেশির ভাগ সময় মসজিদের ভিতরে থেকে সংসার থেকে বিচ্যুত হয়ে এবাদত করা? অথবা ঘর সংসার ছেড়ে তিন মাস চার মাস দূর-দূরান্তে চলে গিয়ে ওয়াজ নসিহত করা? আমার বিনীত উত্তর হচ্ছে 'না'। এবাদত মানেই মহান সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত পন্থায় জীবন-যাপন করা। আমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা বা দাস । এই দাসত্বকে স্বীকার করেই আমাদেরকে জীবন-যাপন করতে হবে। যে যেই পেশায়ই থাকি না কেন, সেই পেশার পরিধি বা কর্মক্ষেত্রকে এবাদতের নিয়তে ব্যবহার করতে হবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, জেলে, কৃষক, ছাত্র, নিম্ন বেতনভূক অফিসের কর্মচারী, শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, হাসপাতালের ডাক্তার, সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত বিডিআর সৈনিক, সন্ত্রাসী গ্রেফতারে নিয়োজিত পুলিশ সদস্য ইত্যাদি সকলেই নিজ নিজ পেশার দায়িত্ব পালন করার মাধ্যমেই এবাদত করতে পারেন। সেই এবাদতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হচ্ছে নিজে সৎ কাজ করা ও অপরকে সৎ কাজে উৎসাহিত করা, নিজে অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা ও অপরকে অসৎ কাজে নিরুৎসাহিত করা, সমাজের তথা মানবকল্যাণের কাজে সময়-মেধা-অর্থ ব্যয় করা, হালাল উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা ও অন্যকে উৎসাহিত করা, স্বাস্থ্যসম্মত ও নৈতিক উপায়ে ব্যক্তি ও



www.nagorikpathagar.org

পারিবারিক জীবন-যাপন করা ও অন্যকে করতে উৎসাহিত করা, জ্ঞানার্জনে নিজে আগ্রহী হওয়া ও অন্যকে উৎসাহিত করা, নিজের মনের ভিতরে সব সময় নিজ কর্মের জন্য এই জীবনে ও এই জীবনের পরে জবাবদিহিতা করতে হবে সেই ভয়ে ভীত থাকা, এবং মর্ম অনুযায়ী নামাজ-রোজা হজ্ব-যাকাত ইত্যাদি পালন করা। এই প্রেক্ষাপটে আমাদের এই আলোচনাও এবাদত হিসাবে গণ্য হতে পারে।

আমাদের এই আলোচনা কুরআন এবং মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের উপর। যিনি কুরআনকে বিশ্বাস করেন না তার জন্য এ আলোচনা নয়। কুরআনে বিশ্বাস করাটা কোনোমতেই আপেক্ষিক ও আংশিক ব্যাপার নয়। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভুলবশত বা অজ্ঞতাবশত এটাকে আপেক্ষিক ও আংশিক হিসেবে দেখেন বা মূল্যায়ন করেন। এর কারণ আমরা (অর্থাৎ ঐ লক্ষ লক্ষ মুসলমান) কুরআন সম্বন্ধে জানি না বা কুরআনের ভিতর কি বক্তব্য আছে সেটা জানতেও চেষ্টা করি না। কুরআনেই আদেশ দেওয়া আছে নামাজ পড়তে হবে, তাই আমরা নামাজ পড়ছি। কুরআনে আদেশ দেওয়া আছে রোজা রাখতে হবে বা হজ পালন করতে হবে—তাই রোজা ও হজ পালন করছি। কুরআনে বলা আছে যাকাত দিতে হবে তাই যাকাত দিচ্ছি। যখন আমি "রাখছি বা পালন করছি বা দিচ্ছি" শব্দগুলো ব্যবহার করছি এগুলো আংশিকভাবে প্রযোজ্য। কারণ সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটা অংশ মাত্র এই আদেশগুলো পূর্ণভাবে পালন করেন। আদেশ দাতা হচ্ছেন আল্লাহ্, আদেশটির বাহন হচ্ছে কুরআন এবং আদেশটি জনসমক্ষে প্রকাশকারী ও আদেশ পালনের মূর্তমান প্রতীক হচ্ছে রাসূল (সাঃ)। তাই শিক্ষিত মুসলমানের মনে আগ্রহ থাকতে হবে যুগপৎ কুরআন এবং রাসূল (সাঃ)কে জানার। তাহলেই আল্লাহর আদেশ পালন সহজতর হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা যদি ঐ কুরআনকে না পড়ে কুরআন সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করি সেটা কি যুক্তির যে কোনো মানদণ্ডে ন্যায়সঙ্গত হবে? বিরূপ মন্তব্যের কথা বাদ দিলাম, কুরআন যদি না পড়ি বা না বুঝি তাহলে ভালো মন্তব্যও তো করতে পারবো না। শুধু আবেগ দিয়ে বস্তুনিষ্ঠতা অর্জন করা যায় না।

কুরআন কোথায় ছিল? এটা কেন এসেছে? এটা আমরা কেন মেনে চলবো? মেনে চললে আমাদের উপকার কি? না মানলেই বা ক্ষতি কি? এসব প্রত্যেকটি প্রশ্নেরই উত্তর কুরআনের মধ্যেই খুলে খুলে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ বলা হয়েছে। কুরআন পূর্ণাঙ্গ আকারেই সংরক্ষিত ছিল লউহে মাহফুজে। কিন্তু সেটা পূর্ণাঙ্গ আকারে একবারে রাসূলের কাছে অবতীর্ণ হয়নি; হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে ধীরে ধীরে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে। প্রাথমিক পর্যায়ে অবিশ্বাসীরা আল্লাহর প্রদত্ত ওহীকে রাসূলের বানানো কথা বলে অস্বীকার করলে রাসূলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 'তিনি নিজের খেয়াল-খুশী মত কোনো কথা বলেন না। এই কুরআন তো ওহী, যা রাসূলের কাছে পাঠানো হয়' (সুরা আন নাজম আয়াত: ৩-৪)। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন–'সে যদি আমার নামে কোনো কথা রচনা করতো, তবে আমি তার ডান হাত চেপে ধরতাম।



www.nagorikpathagar.org

অতঃপর তার কণ্ঠনালী কেটে দিতাম। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতো না' (সুরা আলহাক্কা ৪৪-৪৭)। সুরা আত তাগাবুন এর ৮ আয়াতে বলা হয়েছে 'তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং নাজিলকৃত জ্যোতির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।' এক্ষেত্রে জ্যোতি মানেই কুরআন। ২৩ বছর সময় নিয়ে কুরআন অবতীর্ণ হয়ে এটাই প্রমাণ করল যে কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখতে বা বাস্তবায়ন করতে হলে ক্রমশ বা ধাপে ধাপে করা ভাল। কুরআন এবং রাসূল একজন অপরটির সাথে এমনভাবেই জড়িত যে কুরআন আলোচনা করলেই রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে জানা যায় কিংবা রাসুল (সাঃ) কে জানতে গেলেই কুরআন কে জানা যায়। সাহাবীরা হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর কাছে রাসূল (সাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন 'তোমরা কি কুরআন পড় না?' অর্থাৎ রাসূলের পূর্ণাঙ্গ জীবনটাই কুরআনের মধ্যে বিদ্যমান। আল কুরআনের প্রতিটি শিক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে রাসূল (সাঃ)-এর প্রতিটি কথায় ও প্রতিটি কাজে। কুরআনই তার চলমান জীবন অথবা তাঁর জীবনই চলমান কুরআন। মানুষ মানুষের জীবন চরিত রচনা করে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধুর জীবন চরিত অতি নিপুণভাবে আল কুরআনে বিধৃত করেছেন। রাসূলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মানবীয় গুণাবলী সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন "আপনি তো মহান চরিত্রের অধিকারী।" মহান আল্লাহ নিজেকে 'বিশ্বজগতের প্রতিপালক" এবং মুহাম্মদ (সাঃ) কে 'রাহমাতুল্লিল আলামিন' বলেছেন। তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল করে অনন্তকালের জন্য তাঁকে কল্যাণের নিয়ামক করেছেন। তাঁকে বলতে বলা হয়েছে : "আপনি বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

মানুষকে সহজ এবং সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা পথ প্রদর্শক হিসেবে যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যকের মাধ্যমে ঐশী গ্রন্থও প্রদান করেছেন। যেমন- হযরত দাউদ (আঃ)-এর মাধ্যমে 'জাবুর', হযরত মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে 'তাওরাত' এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে 'ইনজিল' নামক ঐশী গ্রন্থসমূহ পৃথিবীতে দেয়া হয়েছিল। এই ধারাবাহিকতায় শেষ নবী ও রাসূল হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তার মাধ্যমে মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে ঐশী গ্রন্থ আল কুরআন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জীবনের শেষ হজ পালন করেছিলেন তাঁর ইন্তেকালের কয়েক মাস পূর্বে। এটিকে বিদায়ী হজ বলে সকলেই অভিহিত করেন। বিদায়ী হজ্বে রাসূলল্লাহ (সাঃ) এর ঐতিহাসিক ভাষণ সমাপ্ত হবার পর দু'টি আয়াত নাযিল হয়েছিল, যথা, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম"। অতএব আমরা যারা কিছুটা লেখাপড়া শিখেছি, তাদের জন্য ইসলামের বিধান তথা কুরআনের বক্তব্যে আংশিক বিশ্বাসের কোনো জায়গা নেই। আমরা যদি ইসলামের বিধান তথা কুরআনের বক্তব্য



www.nagorikpathagar.org

না জানি বা না বুঝি বা পালন না করি বা পালন করতে অপারগ হই সেটার দোষ আমাদের। কখনই এটা ইসলমের বিধান বা কুরআনের বক্তব্যের সীমাবদ্ধতা নয়। তাই আজকের এই পবিত্র শব-ই-বরাতের দিনে সুধী পাঠকের প্রতি আমার আবেদন যেন, আমরা কুরআন পড়ি এবং বুঝতে চেষ্টা করি। শুধু আরবী পড়লে খোদা কর্তৃক অঙ্গীকার করা সওয়াব পাওয়া যাবে। তার সঙ্গে যদি অর্থ পড়ি তাহলে আংশিকভাবে বুঝতে পারবো তবে মর্ম বা প্রেক্ষাপট বুঝবো না। কিন্তু যদি ব্যাখ্যাসহ কুরআন পড়ি তাহলে আমরা মর্ম অনুধাবন করতে পারবো এবং অপরকে বুঝাতেও পারবো। কুরআন বুঝার আগেই যদি এ জীবনের অবসান ঘটে তাহলে "জীবনটা কি ষোলআনা-ই মাটি" হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না?

ইসলাম শুধু একটি তত্ত্ব নয়। এই তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে এবং প্রয়োগকৃত বা প্রয়োগপ্রাপ্ত প্রথম ব্যক্তি হচ্ছেন মহানবী (সাঃ)। মহানবী (সাঃ)-এর কর্মজীবন ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনও ধীরে ধীরে নাযিল হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেটা বাস্তবায়ন করতেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাজ করতে করতে অথবা স্বাভাবিক জীবনযাপন করার প্রক্রিয়ায় বাধাগ্রস্ত হলে অথবা সংশয় আক্রান্ত হলে তিনি আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষা করতেন। ঐরূপ ক্ষেত্রসমূহে আল্লাহর নির্দেশ আসলেই তিনি পরবর্তী পদক্ষেপ নিতেন।

আমরা যারা নামাজ পড়ি সকলেই কি অবশ্য প্রয়োজনীয় সুরা ফাতিহার (অর্থাৎ আলহামদুল্লাহ সুরা) অর্থ জানি? যারা জানি তারাও কি ধীরে ধীরে অনুধাবন করে পড়ি? সুরা ফাতিহা— তে সাতটি বাক্য বা আয়াত আছে। আমি তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতের বাংলা অর্থ ইসলামী ফাউন্ডেশনের অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত করছি। "(৩) কর্মফল দিবসের মালিক (৪) আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি (৫) আমাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন কর (৬) তাহাদের পথ, যাহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করিয়াছ, (৭) যাহারা ক্রোধ-নিপতিত নহে, পথভ্রষ্টও নহে।" সুধী পাঠক, একাউন্টেবিলিটি বা জবাবদিহিতার শুরুই হচ্ছে এখান থেকে। দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ার সময় কমপক্ষে ৩০ বার আমরা নিজেরাই এই জবাবদিহিতার প্রসঙ্গটি নিজের অন্তরে আনার কথা। আমরা প্রার্থনা করছি আল্লাহর কাছে যেন আমাদের সরল পথ দেখানো হয়। সরল পথের সংজ্ঞা হচ্ছে : ঐ পথ যে পথে আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বা নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ চলেছেন। সুরা ফাতিহাতে প্রদত্ত সংজ্ঞা মোতাবেক শুধুমাত্র নবী বা রাসূলগণ যেই পথে চলেছেন সেই পথটিই সরল পথ, কিন্তু নবী ও রাসূলগণই একমাত্র ব্যক্তি নন, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ বা নেয়ামত পেয়েছেন। নবী ও রাসূলগণ কর্তৃক প্রদর্শিত বা অনুসৃত পথে চলে আরও অগণিত আল্লাহর বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ পেয়েছেন এবং এখনও পাচ্ছেন। তবে নিঃসন্দেহে এবং আল্লাহর ঘোষণা মোতাবেক, এইরূপ নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার স্থানে তথা একক নেতৃত্বের স্থানে আছেন মহানবী (সাঃ)। তাই



www.nagorikpathagar.org

তার জীবনকে বুঝতে পারলে সরল পথ চেনা ও অনুধাবন করা সহজতর হয়। যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহ বা নেয়ামত পেয়েছেন তারা নিশ্চয় খামাখা বা এমনি এমনি পাননি। তারা নিশ্চয় এমন একটা নিয়মে আল্লাহর এবাদত করেছেন তথা নিজেদের জীবনযাপন করেছেন কোন নিয়মটা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় ছিল। ঐ পছন্দনীয় এবাদতের নিয়ম বা জীবনযাপন প্রণালী কি প্রত্যেক অনুগ্রহ-প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব নিজে নিজে আবিষ্কার করেছেন ও অনুসরণ করেছেন? না কি, একটা সাধারণভাবে বিধৃত বা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম অনুসরণ করেছেন? সুধী পাঠক, যথাসম্ভব আপনারা একমত হবেন যে, ঐ সম্মানিত ব্যক্তিত্বগণ একটা স্ট্যান্ডার্ড নিয়ম বা জীবন-প্রণালী অনুসরণ করেছেন। সেই নিয়ম বা প্রণালীটি বিধৃত হয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং বাস্তবে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে রসূল (সাঃ) এর জীবন দ্বারা। অর্থাৎ আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করাই হচ্ছে অনুগ্রহ পাবার মত সরল পথ।

কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শব্দমালায় রসূল (সাঃ) এর চরিত্রের বর্ণনা এবং প্রশংসা করা হয়েছে। রাসূলের পুরো জীবনযাপন প্রণালী যেমন ছিল স্বচ্ছ তেমনি স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। এজন্য রাসূলের শত্রুরাও তার ব্যক্তি জীবন থেকে কোনো মন্দ উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেনি। রাসূল (সাঃ) তার সাহাবীদের ডেকে বলেছেন "হে সাহাবীগণ, তোমরা দিনের আলোতে আমার ভিতরে যা দেখ এবং রাতের আঁধারে আমার ভিতরে যা দেখ সব স্পষ্ট করে মানুষের সামনে খুলে বলে দাও।" রসূল (সাঃ) তার সম্মানিত স্ত্রীদেরকেও একই কথা বলেছেন। যদি আমরা হাদীসের গ্রন্থ দেখি তাহলে সেখানে পাব প্রচুর সংখ্যক হাদীস যেগুলো রাসূল (সাঃ)-এর সম্মানিত স্ত্রীগণ হতে বর্ণিত, বিশেষত মা আয়েশা থেকে বর্ণিত। সুধী পাঠক জানেন কুরআনের ঘোষণা (সুরা আহযাব আয়াত ৬) মোতাবেক আল্লাহর নবীর স্ত্রীগণ মোমিনদের মাতা। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে আর যাচ্ছি না।

একটু আগেই বলেছি কুরআনের সকল নির্দেশ একদিনে মানুষের কাছে পৌছায়নি। এটা তেইশ বছর ধরে এসেছে। মদপান নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আদেশ পর্যালোচনা করলেই এটি বোঝা যাবে। যেমন সুরা বাকারায় ২১৯ আয়াতে বলা আছে "লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে; কিন্তু উহাদের পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।" সুরা নিসা ৪৩ আয়াত এইরূপ-"হে মোমিনগণ! মদ্যপানোমত্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হইও না...."। সুরা মায়েদা ৯০-৯১ আয়াতে বর্ণিত আছে "হে মোমিনগণ! মদ, জুয়া, মুর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাইতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চাহে। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না?"

আর একটি উদাহরণ নিন। বর্তমান সমাজে শহরে কারো বাড়িতে ঢুকতে গেলে কলিংবেল টিপে অথবা দরজায় খটখট করে শব্দ করি। অতঃপর অনুমতিপ্রাপ্ত হলে বা



www.nagorikpathagar.org

দরজা খোলা হলে ঘরে ঢুকি। সুধী পাঠক, পবিত্র কুরআনের সুরা নূরের ২৭, ২৮ ও ২৯ আয়াত দেখুন (উদ্ধৃতি করছি) "হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অপরের গৃহসমূহে প্রবেশ করিও না, যে পর্যন্ত না (তাহাদের হইতে) অনুমতি গ্রহণ কর, এবং (তৎপূর্বে) উহার বাসিন্দাগণকে সালাম কর: এই পন্থাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর, যেন তোমরা (তৎপ্রতি) লক্ষ্য রাখ। অতঃপর যদি সেই ঘরে কেহ আছে বলিয়া তোমরা জানিতে না পার, তবে তোমরা সেই ঘরে প্রবেশ করিও না, যে পর্যন্ত না তোমাদিগকে অনুমতি দেওয়া হয়, আর যদি তোমাদিগকে বলিয়া দেওয়া হয় যে, ফিরিয়া যাও, তবে তোমরা ফিরিয়া আসিও, ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম: আর আল্লাহ তোমাদের কার্যাবলীর সকল খবরই অবগত আছেন। এইরূপ ঘরে প্রবেশ করিলে তোমাদের কোনো পাপ হইবে না যেখানে কেহ (স্থায়ীভাবে) বাস করে না, (এবং) তথায় তোমাদের কোনো জিনিস রহিয়াছে; আর তোমরা যাহা কিছু প্রকাশ্যে করিয়া থাক এবং যাহা কিছু গোপনে করিয়া থাক, সবই আল্লাহ জানেন।" সুধী পাঠক, এটা কি সামাজিক ভদ্রতা ও শৃংখলার অনুকূলে একটি নির্দেশ নয়?।

এখন সামাজিক শৃংখলা ও জাতিগঠন প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ। পবিত্র কুরআনের সূরা আল ইমরানের আয়াত ১০৩ থেকে ১০৫ এর প্রেক্ষাপটে রাসূল্লাহ (সাঃ)-এর বর্ণিত হাদীস হচ্ছে "আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি (১) জামায়াত বা দলবদ্ধ হবে; (২) নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে; (৩) নেতার আদেশ মেনে চলবে: (৪) আল্লাহর অপছন্দীয় কাজ বর্জন করবে; (৫) আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।......যে ব্যক্তি জাহিলিয়াতের নিয়ম-নীতির দিকে (লোকদের) আহ্বান জানায় সে জাহান্নামী যদিও ও রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজকে মুসলিম বলে দাবি করে।" আলোচনার এ স্থানে আমরা জাহিলিয়াতের নিয়ম-নীতির কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করি : কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে অথবা দরিদ্রতার কারণে কন্যা সন্তানকে হেয় মনে করা বা অপাংক্তেয় মনে করা; বিবাহ ব্যতীত কোনো নারীর সঙ্গে বা বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও বিবাহ-বহির্ভূত যৌন সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া; বিধর্মীদের ধন সম্পদকে নিজের মনে করে আত্মসাৎ করা; এতিমের অধিকার রক্ষা না করা ইত্যাদি।

এখন সামাজিক ও অর্থনৈতিক শৃংখলা প্রসঙ্গে আর একটি উদাহরণ আলোচনা করি। সমাজে টাকা-পয়সা লেনদেন বা ঋণদান অতি পরিচিত কর্ম। কুরআনে সূরা বাকারা আয়াত ২৮২-তে নির্দেশ দেয়া আছে যে সকল প্রকারের আদান-প্রদান যেন লিখিত হয় এবং যদি কেউ লিখতে জানে সে যেন লিখতে জানে না এমন ব্যক্তিদের ঘটনা লিখে দিতে অস্বীকার না করে। ঋণ প্রদান করলে সেটা ফেরত পাওয়ার অধিকার সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু সূরা বাকারায় ২৮০ আয়াতে বলা আছে "আর যদি (দেনাদার) অভাবী হয়, তবে অবকাশ দেওয়ার হুকুম আছে সচ্ছলতা পর্যন্ত। আর মাফ করে দেওয়া আরও উত্তম। তোমাদের জন্য যদি তোমাদের অবগতি থাকে।" এ প্রসঙ্গে রাসূলের হাদীস আছে, "যে ব্যক্তি তোমার কাছে আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে



www.nagorikpathagar.org

ফিরিয়ে দাও। তোমার সাথে কোনো ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করলে তুমিও কিন্তু তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না।"

বাংলাদেশে গত এক মাস যাবৎ একটি বিষয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে উপস্থাপিত হচ্ছে। সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি আক্রমণাত্মক ব্যবহারের অভিযোগ সংক্রান্ত। সন্ত্রাসী ও অস্ত্রধারী দুষ্কৃতকারীগণ কর্তৃক জনগণের উপর অন্যায়, অত্যাচার, জবরদস্তি ইত্যাদি বাংলাদেশে গত ১৯ বছর যাবৎ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং পেতে পেতে ২০০১ সালের প্রথমার্ধে এসে চূড়ান্ত কদর্য ও নিষ্ঠুরতম রূপ লাভ করে। এর প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। জনগণের মধ্যে যারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু তাদের বিষয়টি অধিকতর স্পর্শকাতর। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি অবশ্য-অবশ্যই সকল ধর্মাবলম্বী ও ভাষাবলম্বী নাগরিকের জন্য। মদিনা জীবনের এক যুগের বেশি সময়ে মহানবী (সাঃ) যেই ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছিলেন সেই ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্রেও ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছিল। আল্লাহর হুকুমেই রাসূল (সাঃ) রাষ্ট্রের সংবিধান চালু করেছিলেন যার নাম ছিল 'মদিনা সনদ'। মদিনা সনদের অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে অমুসলিমদের সম্পর্কে যেই নীতিগুলো ছিল তার মধ্যে থেকে আমি ১২টি উদ্ধৃত করছি। (১) কোন অমুসলিমকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হবে না; (২) তাদেরকে সকল প্রকার নিরাপত্তা দেয়া হবে; (৩) তাদের কোন অধিকার ক্ষুণ্ন করা হবে না; (৪) তাদের উপর কোন বহিঃশত্রু আক্রমন করলে তাদেরকে রক্ষা করা হবে; (৫) তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পত্তি ও অধিকারের নিরাপত্তা দেয়া হবে; (৬) তাদের ধর্ম, ধর্মস্থান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও গির্জাদির কোন ক্ষতি করা হবে না বা ধর্ম পালনে কোন প্রকার বাধা প্রদান করা হবে না; (৭) তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হবে না বা তাদেরকে সামরিক বাহিনীতে যোগদানের জন্য বাধ্য করা হবে না; (৮) বিচার ব্যবস্থায় তাদের প্রতি কোন প্রকার পক্ষপাতিত্ব করা হবে না; (৯) কেউ কারও শত্রুকে আশ্রয় দেবে না এবং সকলের মতামত ছাড়া কেউ বহিঃশত্রুর সাথে সন্ধি স্থাপন করতে পারবে না; (১০) শত্রু কর্তৃক মদিনা আক্রান্ত হলে সম্মিলিতভাবে প্রতিহত করবে; (১১) নিজেদের মধ্যে কেউ বিদ্রোহী হলে অথবা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে সমুচিত শাস্তি বিধান করা হবে; (১২) নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা দিলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মীমাংসা উপর সকলকে নির্ভর করতে হবে। আজকে শবে বরাতের ক্রান্তিলগ্নে আমাদেরকে জাতীয় ও ব্যক্তি ভিত্তিতে, রাজনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় আঙ্গিকে বিচার করতে হবে। আমরা রাসূল (সঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত নীতিমালা কতটুকু পালন করছি।

আমার নিবন্ধ শেষ করার সময় এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেই আমি শেষ করব। গত ৭ অক্টোরব দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার ৫ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আমার কলামের সর্বশেষ বাক্যে বলেছিলাম যে, এই কথাগুলো বলব, তাই বলছি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের পরই পবিত্র ওমরাহ্ পালন ও জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব গিয়েছেন, তার জন্য ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী



www.nagorikpathagar.org

নিশ্চয়ই নিজের, সরকারের, দেশের ও জনগণের মঙ্গলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া চেয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া, আপনার প্রতি আমার বক্তব্য হচ্ছে, যেই তত্ত্ব বা নীতি বা ভীতি আপনার অন্তরে সব সময়ের জন্য উজ্জ্বল ও জাগরুক থাকা উচিত বলে আমি মনে করি সেটা হচ্ছে জবাবদিহিতা। আপনার দল, দেশের জনগণ এবং সর্বোপরি আল্লাহর নিকট আপনি দায়বদ্ধ এবং আপনাকে জবাব দিতে হবে। আপনি নিশ্চিত জানেন যে, মহান আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আপনার প্রতি সদয় ছিলেন। একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দিলে আপনি বুঝবেন জবাবদিহিতা এক দিকে যেমন কঠিন অপরদিকে তেমনই সহজ। সংবিধান আপনাকে ক্ষমতা দিয়েছে মন্ত্রিসভার দশ ভাগের এক ভাগ সদস্য 'টেকনোক্র্যাট' থেকে নিতে। উদ্দেশ্য জনগণ ও দেশ যেন রাজনীতিবিদদের মধ্যকার কোন সুনির্দিষ্ট মেধা বা দক্ষতার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অথবা, জনগণ যেন রাজনীতিবিদদের দক্ষতা ও মেধার অতিরিক্ত অন্য দক্ষ ও মেধাবী এমন ব্যক্তিত্বসমূহের সেবা পায় যারা নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় যেতে অনাগ্রহী। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি কি সংবিধানের এই অন্তর্নিহিত মর্ম রক্ষা করেছেন? এমন রাজনীতিবিদ যিনি আপনার বিরুদ্ধাচারণ করলেন, যিনি আপনার দৃষ্টিতে অদক্ষ ছিলেন, আপনি তেমন কোন রাজনীতিবিদকে যদি টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী বানান তাহলে আপনি কি আক্ষরিক অর্থে দেশবাসীকে আসল টেকনোক্র্যাটদের সেবা থেকে বঞ্চিত করছেন না ? দেশের সব কাজ আপনি একা করতে পারবেন না, তাই উপযুক্ত ব্যক্তিকে উপযুক্ত কাজের জন্য নিয়োগ করাটাই আপনার প্রধান পাঁচটি কর্তব্যের একটি। সামনে রমজান মাস আসছে। আজ থেকে নিয়ে রমজানের শুরুর দিন পর্যন্ত হচ্ছে রমজানের প্রস্তুতির। আপনার মঙ্গল কামনা করি।

দৈনিক যুগান্তর ৩১/১০/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

## ৩. সেনাবাহিনী এবং সংহতি

# নভেম্বর ৭৫-এর অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থানের দুঃখজনক অধ্যায়

বাংলাদেশের বিগত ২৮ বছরের ইতিহাস ঘটনাবহুল এবং এর মধ্যে কিছু ঘটনা অপ্রীতিকর। ১৫ আগস্ট '৭৫ বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়া এবং ৩০ মে '৮১-তে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার ঘটনা দুটি হচ্ছে সবচেয়ে অপ্রীতিকর ও দুঃখজনক ঘটনার উদাহরণ। মিশ্র অনুভূতির বা মিশ্র মূল্যায়নের ঘটনা আছে দুটি, যথা, ১৯৭৫-এর ৩ নভেম্বর তারিখের বা একই সালের ৭ নভেম্বর তারিখের। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে এবং বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীসমূহের ইতিহাসে এই দুটি দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৩ ও ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলী থেকে যদি দেশ ও জাতির জন্য কোনো মঙ্গলজনক উপসংহার টানতে হয়, তাহলে ঐ দিন দুটির ঘটনা নয়, বরং তার প্রেক্ষাপটের ওপর অধিক মনোযোগ দিতে হবে।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারির পর বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র বিপন্ন হয়। ১৫ আগস্টের ঘটনার পর সার্বিকভাবে গণতন্ত্রই বিপন্ন হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টকে স্থিতি তারিখ ধরলে তখন আমার সরেজমিনে চাকরির বয়স পাঁচ বছর থেকে ২১ দিন কম। জীবনের বয়সে এবং চাকরির বয়সে নবীন ও তরুণ ছিলাম। কিন্তু দায়িত্বভার পালন ও গ্রহণে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী নবীন সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার কাজে প্রথম দুই বছর সার্বিকভাবে নবীন ও তরুণরাই অবদান রেখেছিল। যত কিছুই বলি, মানসিক ও বিবেকের পরিপক্কতা তারুণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বেশি। এই প্রেক্ষাপটেই '৭৫-এর ঘটনার মন্তব্য করতে হবে। প্রথম আলোর সম্মানিত সম্পাদকের অনুরোধে এ কলাম লিখতে গিয়ে এখন যা বলছি, এতে অনিবার্যভাবে বিগত ২৪ বছরের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিফলন আছে।

সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে একটি শাখা আছে, যার নাম সামরিক সচিবের শাখা। এ শাখার কাজ হলো অফিসারদের পদোন্নতি, বদলি, ডকুমেন্টেশন ইত্যাদি সংক্রান্ত। সে সময় এ শাখার প্রধান ছিলেন তৎকালীন কর্নেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম বীরবিক্রম (পরবর্তীকালে সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল নাসিম)। তার অধীনে স্টাফ অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলাম আমরা ছয়-সাতজন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার (এখন সবাই বিবিধ নিয়মে অবসরপ্রাপ্ত)।



www.nagorikpathagar.org

'৭৫ -এর আগস্টের ঘটনার পর দেশের প্রশাসন যেমন দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় ছিল, অনুরূপ সেনাবাহিনীর প্রশাসনও দ্বিখণ্ডিত ছিল। ১৫ আগস্ট থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত সময়টি যুগপৎ ব্যস্ত ও উদ্বেগসংকুল ছিল। ২৪/২৫ আগস্ট সেনাবাহিনী প্রধানের বদল হয়। দেশের প্রথম সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ (বীরউত্তম) কে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। সেনাবাহিনীর উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে (বীরউত্তম) সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়। বস্তুত জেনারেল জিয়াউর রহমান চাকরিজীবনে জেনারেল শফিউল্লাহর ব্যাচমেট (সেনাবাহিনীর ভাষায় কোর্সমেট) হলেও জ্যেষ্ঠতার তালিকায় জিয়াউর রহমান ওপরে ছিলেন। যে পদটা ১৯৭২-এর এপ্রিলেই পাওয়ার আশা ছিল, সেটা সাড়ে তিন বছর পর তিনি পেলেন। এতে তিনি যেমন সন্তুষ্ট হলেন, যারা তাকে শ্রদ্ধা করতো তারাও সন্তুষ্ট হলেন। মুক্তিযুদ্ধের ২৮ বছর পরে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করতে গিয়ে মনে হচ্ছে ১৯৭২-এর এপ্রিলে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করতে গিয়ে যে অবাঞ্ছিত অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি দূর হলো। জেনারেল জিয়ার নামের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে 'ক্যারিসমা' বা আবেগপূর্ণ-জনপ্রিয়তা জড়িত ছিল। 'আমি জিয়া বলছি এই প্রারম্ভিক বাক্য পুনরায় সেনাবাহিনীকে বিদ্যুৎচমকের মতো প্রভাবিত করল। বাংলাদেশ যদিও যুদ্ধরত ছিল না, তথাপি জিয়াউর রহমান যে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিলেন, সেটা অস্বস্তি, অশান্তিতে বৈশিষ্ট্যময় ছিল। সেনাবাহিনী সাধারণত পরিচালিত হতো সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত সেনাসদর কর্তৃক। সিদ্ধান্ত যদিও কর্তাব্যক্তিরাই নিতেন, তথাপি সিদ্ধান্তসমূহ হতো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেনাসদরে। ১৫ আগস্টের পরে আমরা কনিষ্ঠরা দেখলাম, বঙ্গভবন থেকেও কিছু কিছু সিদ্ধান্ত আসছে। এবং বঙ্গভবন মানে হলো ১৫ আগস্টের বঙ্গবন্ধু হত্যার ঘটনা এবং বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারী মেজর পদবির অফিসারবৃন্দ। এটা আমাদের কাছে খুবই দৃষ্টিকটু ঠেকত এবং সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ অফিসারদের কাছে এটা যে অগ্রহণযোগ্য বন্দোবস্ত ছিল, সেটা বলাই বাহুল্য; এটা আসলেই ছিল একটা বিদঘুটে পরিস্থিতি। সেনাসদরে তখনকার আমলে অন্যতম জ্যেষ্ঠ অফিসাররা ছিলেন তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশররফ বীরউত্তম (সিজিএস) এবং কর্নেল মইনুল হোসেন চৌধুরী বীরবিক্রম (এজি)। ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন কর্নেল শাফায়ত জামিল বীরবিক্রম। ঢাকার বাইরে তখনকার আমলে পাঁচটি সেনানিবাসে চারজন জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তা ছিলেন— যথা, রংপুর সেনানিবাসে ছিলেন ব্রিগেড কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা, কুমিল্লায় ব্রিগেড কমান্ডার পাকিস্তান প্রত্যাগত কর্নেল আমজাদ আহমেদ খান চৌধুরী (বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল এবং 'প্রাণ' সামগ্রী প্রস্তুতকারক এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোম্পানি ও প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট নামক রিয়েল এস্টেট কোম্পানীর চেয়ারম্যান), যশোরে ছিলেন ব্রিগেড কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা ব্রিগেডিয়ার মীর



www.nagorikpathagar.org

শওকত আলী বীরউত্তম (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল ও রাজনীতিবিদ)। চট্টগ্রামে ছিলেন ব্রিগেড কমান্ডার পাকিস্তান প্রত্যাগত কর্নেল কাজী গোলাম দস্তগীর। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫-এর ঘটনাবলি ঘটতোই। এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। প্রশ্ন ছিল কবে? ৩ নভেম্বর '৭৫-এর ঘটনা ৭ নভেম্বরকে ত্বরান্বিত করে। ৩ নভেম্বরের ঘটনা না ঘটলে, হয়তো ৭ নভেম্বরের ঘটনা আরো বিলম্বিত হতো এবং ১৫ আগস্ট না ঘটলে ৩ নভেম্বরের ঘটনা ঘটতো কিনা, এটা প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার হলেও এটুকু সুনিশ্চিত যে, ১৫ আগস্টের পর ৩ নভেম্বর অবধারিত হয়ে ওঠে। তা হলে আমাদের '৭২ থেকে '৭৫-এর নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ও দেশের মধ্যকার কিছু সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট অনুধাবন করতে হবে। এরকম উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রেক্ষাপট বা বিষয় হলো (ক) মুক্তিযোদ্ধাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে বিদ্যমান বাস্তবতার অসঙ্গতি, (খ) পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসার ও সৈনিকগণের আশা-আকাঙ্খা প্রসঙ্গে বিদ্যমান বাস্তবতার অসঙ্গতি (গ) মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈনিকগণকে সরকার কর্তৃক দুবছরের সিনিয়রিটি বা জ্যেষ্ঠতা প্রদান নিয়ে অন্যদের মনে অস্বস্তি ও অপ্রীতি, (ঘ) জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি প্রসঙ্গে সেনাবাহিনীর মনে সৃষ্ট আশঙ্কা, অস্বস্তি এবং '৭৫-এর আগস্টের পরে রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ প্রসঙ্গে সৃষ্ট অস্বস্তি ও অকাম্যতা, (ঙ) '৭৩-৭৪ সালে প্রকাশ্য রাজপথের রাজনীতিতে নতুন সৃষ্ট রাজনৈতিক দল 'জাসদ'-এর বিপর্যয়, (চ) সেনাবাহিনীতে চাকরিরত অফিসার ও সৈনিকগণের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সম্পর্কের স্থলে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার জন্ম, (ছ) জাসদ কর্তৃক সেনাবাহিনীর সৈনিকগণকে বিপ্লবাত্মক রাজনীতিতে দীক্ষিতকরণ ও সংগঠন ইত্যাদি।

সবগুলো বিষয় নিয়ে এখানে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয় এবং সব আলোচনাই প্রীতিকর হবে, এটাও আশা করা যায় না। তাই যথাসম্ভব ভব্যতা বজায় রেখে একটা মূল্যায়ন দাঁড় করানোর চেষ্টা করব। ষাটের দশকে পাকিস্তানের প্রখ্যাত বিচারপতি এম আর কায়ানীর একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম মনে হয় 'নট ট্রুথ' বা এ জাতীয় কিছু। বক্ষ্যমাণ কলামটিও এ রকমই অনেকটা। '৭৫-এর আগস্ট বা নভেম্বর নিয়ে সব কথা প্রকাশ্যে বলার সময় এখনো আসেনি। অতএব যা কিছু বলা হয়েছে বা অদূর ভবিষ্যতে বলা হবে, এগুলো অসত্য না হলেও পূর্ণ সত্য কোনোক্রমেই নয়। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে সেনাবাহিনীর আয়তন ছিল ছোট। চাকরিতে কনিষ্ঠ অফিসারগণ দায়িত্বের প্রয়োজনে বড় বড় নিযুক্তিতে ছিলেন। যথাসম্ভব চেষ্টা চলছিল সেনাবাহিনী গঠন করার এবং সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী করার। প্রায় শূন্য অবস্থা থেকে আমাদের কাজ শুরু হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া কোটি-কোটি টাকা মূল্যের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে নিয়ে যাওয়া হয়। যুদ্ধের সময় মিত্রদেশ আমাদের যেসব হালকা অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি দিয়েছিল সেগুলোই হলো নতুন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভরসা। বহুল আলোচিত একটি প্রশ্ন, যে ভারত মুক্তিযুদ্ধের



www.nagorikpathagar.org

সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এতকিছু করল, সেই ভারতের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের বন্ধুসুলভ ও কৃতজ্ঞতাসুলভ মনোভাব আশানুরূপ নয় কেন'? উত্তরের শুরু বোধহয় সেই '৭২-এর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির মাঝেই নিহিত। যা হোক সেনাবাহিনী সংগঠন ও উন্নয়ন করতে গিয়ে কর্মকর্তাগণের মনে যে মডেলটা জাগরুক ছিল সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ মডেল। ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া কাঠামো মোতাবেকই '৪৭ থেকে '৭১ সময়কালে ভারতীয় ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিন্যাস ও বিস্তৃতি লাভ করে। স্বাভাবিক যুক্তিতেই, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তাদের পূর্বসূরি পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকালে সংস্পর্শে আসা ভারতীয় সেনাবাহিনীর আদলে গড়ে ওঠা শুরু করে।

১৯৭২-৭৩-এ চারজন গুরুত্বপূর্ণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের বিচ্যুতি ঘটে। ১৯৭২-এর শেষের দিকে তৎকালীন ৪৬ পদাতিক কমান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউদ্দিন বরখাস্ত হন। কর্নেল জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে তার সরাসরি জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা সেনাপ্রধান ব্রিগেডিয়ার শফিউল্লাহর সম্পর্ক অপ্রীতিকর ছিল। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে দ্বন্দ্বের অনেকগুলো কারণের একটি ছিল সৈনিকগণকে অনানুষ্ঠানিকভাবে চিরাচরিত নিয়মে বিবিধ কায়িক শ্রমের কাজে ব্যবহার করা বা না করার ঘটনা নিয়ে। '৭২-এর অক্টোবর-নভেম্বরে কোনো এক সময় কর্নেল জিয়াউদ্দিন ইংরেজি সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় একটি মন্তব্য কলাম বা চিঠি লেখেন। বক্তব্যগুলো ছিল চোখা ও তৎকালীন সরকারের জন্য বিব্রতকর ও অপ্রীতিকর। সাতদিন পার হওয়ার আগেই তিনি চাকরি হারান। এর অল্প কদিনের মধ্যে তিনি তৎকালীন সর্বহারা পার্টিতে যোগ দেন ও পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মগোপন করেন বলে তৎকালে শোনা গিয়েছিল। '৭৩-এ কর্নেল তাহের সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বীরত্বের জন্য প্রশংসিত হলেও, মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সেনাবাহিনী গঠনকালে ব্যতিক্রমধর্মী গঠনমূলক প্রস্তাবসমূহের জন্য তিনি যুগপৎ প্রশংসিত ও সমালোচিত হচ্ছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈনকিগণের কাছে তিনি আবেদনময় ছিলেন। প্রথম দিকে যশোর সেনানিবাসে সংগঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৫৫ ব্রিগেড এবং এর প্রথম ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবুল মনজুর (বীরউত্তম) ('৮১ সালে চট্টগ্রাম সেনাবিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে বিতর্কিত পরিস্থিতিতে নিহত মেজর জেনারেল মনজুর)। তিনি দক্ষ, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাকে ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে সামরিক এটাসে বা ডিফেন্স এটাসে হিসেবে বদলি করা হয়। তৎকালীন কর্নেল মনজুরের জন্য এটা কোনো পুরস্কার ছিল না। আমার বর্ণনায় শেষে হলেও ঘটেছিল সবার আগে, '৭২-এর জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারিতে মুক্তিযুদ্ধকালীন ৯ নম্বর সেক্টরের অধিনায়ক মেজর জলিলের গ্রেপ্তার, কোর্ট মার্শালে বিচার এবং বেকসুর



www.nagorikpathagar.org

খালাসের ঘটনা। এই চারজন জ্যেষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধার ঘটনা অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধাদের মনে রেখাপাত করে। মুক্তিযুদ্ধকালে তৎকালীন মুক্তিবাহিনীর সদস্যবৃন্দের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীভাবে রাজনীতিকরণ হয়েছিল। দেশকে স্বাধীন করার প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করেছিলাম বলেই বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে একটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক গঠিত সরকারের রাজনৈতিক নেতৃত্বে এবং পরিচিত সামরিক চেইন অফ কমান্ড বা নেতৃত্বের অধীনে, আমরা সৈনিক মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তীকালে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ হলেও বহু সৈনিক-মুক্তিযোদ্ধার মনে মানসিকভাবে রাজনৈতিক সম্পর্ক থেকে যায়। আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, মুক্তিযোদ্ধাগণ বাংলাদেশের সৃষ্টিকে তাদের অবদান মনে করতেন এবং এখনো করেন (আমি নিজেও করি) তাই দেশের ভালো-মন্দ মুক্তিযোদ্ধাদের মনকে সেই '৭২, ৭৩, ৭৪-এ উদ্বেলিত করতো। সৈনিক এবং অফিসার সবার ক্ষেত্রে এটা সমানভাবে প্রযোজ্য।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যেমন মুক্তিযোদ্ধাগণ রাজনৈতিকভাবে দ্বিখণ্ডিত ছিলেন, অনুরূপভাবে মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়েও তাদের বিবিধ নিয়মে ব্যবহার করা হলো। একটি নিয়ম হলো জাতীয় রক্ষীবাহিনীর সৃষ্টি। বিস্তৃত ব্যাখ্যা না দিলেও বলা যায়, যেকোনো কারণেই হোক, জনগণের কাছে রক্ষীবাহিনী আশানুরূপ প্রিয় ছিল না এবং নবীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাছে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' 'সৎভাই'স্বরূপ ছিল। কিন্তু এই বাহিনীর বহু সদস্যই ছিলেন দুর্দান্ত সাহসী ও সৎ।

১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের দিকে পাকিস্তান থেকে যখন অফিসার ও সৈনিকগণের প্রত্যাবর্তন শুরু হলো তখন জাতীয় নেতৃত্বের সামনে ভীষণ বড় ও কঠিন একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্নটি ছিল পাকিস্তান প্রত্যাগতদের কী হবে। এখন সিদ্ধান্তটিকে কেউ সঠিক বলবে, কেউ বেঠিক বলবে। কিন্তু তখনকার সিদ্ধান্তটি ছিল বেশিরভাগকেই (বাস্তবে শতকরা ৯৮ ভাগকেই) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ করা। মুক্তিযোদ্ধা অফিসার ও সৈনিকগণকে ঠিক ঐ মুহূর্তে দু'বছরের সিনিয়রিটি দেওয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত দুটি কারো দৃষ্টিতে অতি প্রশংসিত, কারো দৃষ্টিতে অতি নিন্দিত। তবে অফিসারদের মধ্যে অপ্রীতি সৃষ্টির অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায় এ সিনিয়রিটি।

'৭৩-'৭৪ সালে সেনাবাহিনী বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত হয়। ঐ সময় সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মতবিরোধের সৃষ্টি হয়। '৭৫ সালের জানুয়ারিতে বাকশাল সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণকে বাকশালের সদস্য করা হয়। বিভিন্ন জেলার গভর্নর (নতুন সৃষ্টি করা পদ)-এর পদ ও অন্যান্য আকর্ষণীয় পদ পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। এতে সাধারণ অফিসার ও সৈনিকগণ বিচলিত বোধ করেন।



www.nagorikpathagar.org

কিছু পূর্বে বলেছিলাম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মানসিকভাবে পাকিস্তান ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর আদলে তথা '৪৭-পূর্ব ব্রিটিশ-ভারতীয় আদলে বিকশিত হচ্ছিল। র‍্যাংকের নাম, পদের নাম, সংস্থার নাম, প্রশিক্ষণের নিয়ম, প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাদি সবকিছুই প্রায় এক ছিল। এরকমই একটি প্রথা ছিল ব্যাটম্যান (BATMAN) প্রথা। ব্যাটম্যানকে ব্যক্তিগত Orderly বলা যায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও ব্যাটম্যান প্রথা ছিল। যেসব বাঙালি অফিসার পাকিস্তানে বন্দী ছিলেন, তাদের বন্দীকালে ব্যাটম্যান প্রথা ছিল না। বাংলাদেশে আসার পর তারা পুনরায় ব্যাটম্যান পাওয়া শুরু করল। ব্যাটম্যানের প্রধান কাজ হলো সাহায্য করা। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই ব্যাটম্যানদের অসৈনিকসুলভ কাজে নিয়োজিত করা হতো, বিশেষত বিবাহিত অফিসার বা জেসিওগণের আর্দালীগণের ক্ষেত্রে এরূপ অনিয়ম ঘটতো। পাকিস্তান আমলে সৎ সাদাসিধা মার্কা সৈনিকগণকেই ব্যাটম্যান হিসেবে নিয়োজিত করা হতো। বাংলাদেশ আমলে পাঠান বা বালুচ সিপাইদের মতো সাদাসিধা লোক পাওয়া মুশকিল হয়ে গেলেও বাঙালি সিপাইদের মধ্যেও অনেক কম লেখাপড়া জানা সাদাসিধা সৈনিক ছিল যাদেরকে অফিসাররা ব্যাটম্যান হিসেবে নিতো। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী সেনাবাহিনীতে কম লেখাপড়া জানা সৈনিকের অভাব পরিলক্ষিত হলো। সমালোচনাপ্রবণ বাঙালি সেনা সদস্যরা বিরাজমান এই সামাজিক অভ্যাস কোনোমতেই এড়াতে পারলেন না বা পারলাম না। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা বাঙালি সৈনিকদের মনকে ততদিনে স্পর্শ করেছে। সৈনিককে বোঝানো হলো, কেন তুমি অফিসারের জন্য খাটবে। সৈনিক এটাই বুঝলো এবং ক্ষিপ্ত হলো। তবে এখানে অবশ্যই বলে রাখতে হবে, সমগ্র সেনাবাহিনীকে গড়পরতা একই মানদণ্ডে বিচার করা চলবে না। পদাতিক বাহিনী তথা বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং অন্যান্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে পজিটিভভাবেই ভিন্ন ছিল। কারণও আছে। বেঙ্গল রেজিমেন্টে অফিসার ও সৈনিকদের সম্পর্ক এমন নিবিড় ও স্বতঃস্ফূর্ত হতো যে, সেখানে তৃতীয় পক্ষের কানপড়া কাজে লাগতো না।

রাজপথে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে, আমার মূল্যায়নে, তৎকালীন জাসদ বিকল্প পন্থা অনুসন্ধান করল। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে সৈনিকও রাজনীতির অংশ। জাসদ সিদ্ধান্ত নিল, বুর্জোয়া আদলের অফিসার বাহিনী বাদ দিয়ে সৈনিকদের সংগঠিত করে বিদ্রোহ তথা বিপ্লব ঘটিয়ে দেশ শাসনের ক্ষমতা অধিগ্রহণ করবে। দেশে বিদ্যমান তৎকালীন আইনে এবং এখনকার আইনেও এটা মারাত্মক রকমের অপরাধ ছিল। আইন না বদলিয়ে বা 'অন্তর্ঘাত' বা 'নাশকতা' শব্দগুলোর মানে না বদলিয়ে, জাসদের ওই আমলের ওই কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করা কঠিন। ১৯৭৫ থেকে '৯৫ সাল পর্যন্ত এ নিয়ে যা বলাবলি বা লেখালেখি হয়েছে, সেটা বেশি খোলামেলা নয়। কিন্তু ১৯৯৬ থেকে '৯৯ পর্যন্ত অনেক খোলামেলা কথা পত্রপত্রিকায় এসেছে। এমনকি '৭৫-এর ৭ নভেম্বরে জাসদ সমর্থিত গোপন সৈনিক সংস্থার নেতৃবৃন্দের মুখ থেকেও সরাসরি বক্তব্য



www.nagorikpathagar.org

এসেছে। সমসাময়িক ইতিহাস লেখকগণের জন্য কাজটি সহজতর হয়ে আসছে। সবাই ব্যক্ত করছেন যে, কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্তে, জাসদের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক গোপন নেতৃত্বে সেনানিবাসসমূহের অভ্যন্তরে সৈনিকগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে সংগঠিত করা হচ্ছিল। তাদের প্রস্তুতি অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারত না। ঘটনার ২০-২২ বছর পর যখন চিন্তা করি যে, ঐ আমলে সেনাবাহিনীর আত্মরক্ষামূলক গোয়েন্দা কর্মকাণ্ড কত দুর্বল ছিল, তখনই নিজের মনে নিজে শিউরে উঠি (যদি বলি যে, আজকের সেনাবাহিনীকে এসব কথা খেয়াল রেখেই নিজেদের আত্মরক্ষা করতে হবে, তাহলে বোধকরি বাহুল্য হবে না)। গোপন সৈনিক সংস্থাসমূহ এক বিপ্লব সাধন করার জন্য মোটামুটি প্রস্তুতই হচ্ছিল। শুধু তারিখটি ঠিক করাই বাকি ছিল। আমার সামরিক অভিজ্ঞতা বলছে যে, ওই বিপ্লব রক্তপাত ছাড়া সংঘটন প্রায় অসম্ভব ছিল। তবে এ কথাও সত্যি যে, তৎকালীন জাসদের চিন্তাভাবনায় দেশের জন্য যেরূপ গণবাহিনী সদৃশ সেনাবাহিনী কল্পিত ছিল সেটা বাস্তবায়ন করতে গেলে বিপ্লব ব্যতীত অন কোনো প্রথা অকল্পনীয়। উৎপাদনমুখী গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত একটি সেনাবাহিনী ছিল তৎকালীন জাসদের বা কর্নেল তাহেরের কাম্য। ওই চিত্রে অফিসারগণ বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তবে পুরানো কথাটাই মনে আসে। সব ভালো যার শেষ ভালো। '৭৫-এর নভেম্বরে গোপন সৈনিক সংস্থার জন্য শেষটি ভালো হয়নি।

আগেই বলেছি, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ঘটনা থেকেই ৩ নভেম্বরের জন্ম। বস্তুত সেনানিবাসের অভ্যন্তরে গোপন সৈনিক সংগঠনের কাজটি অনেকটাই সহজ হয়ে যায় ১৫ আগস্টের কারণে। অথচ লক্ষণীয় যে, ১৫ আগস্ট এবং ৭ নভেম্বর এই দুটি তারিখের ঘটনার আয়োজকদের কোনো পক্ষই অপর পক্ষের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা রাখতেন না। সেনা অভ্যন্তরের জাসদ সমর্থিত ও পরিকল্পিত গোপন সংগঠনটির মূল লক্ষ্য ছিল দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা। আর সশস্ত্র ঘটনা বা রক্তপাত ছাড়া তাদের লক্ষ্য অর্জন কোনোমতেই সম্ভব ছিল না। রাজপথের আন্দোলনের চরম বিপর্যয়ের ঘটনা তাদের সামনে ঐ একমাত্র পথটিকেই আরো অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন তথা ক্ষমতারোহণের মাধ্যম হিসেবে তৎকালীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দিকে নজর দেয় এবং এক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল সেনাবাহিনীর ননকমিশন্ড সৈনিকবৃন্দ। গোপন তৎপরতার মাধ্যমেই সৈনিকদের জাসদ তত্ত্বে দীক্ষা দেয়া হতে থাকে এবং সোজা বাংলায় যাকে বলে 'মগজ ধোলাই' হতে থাকে লোকঃচক্ষু তথা সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থার নজরের আড়ালে। আর এ ক্ষেত্রে তারা যে গোপনীয়তা রক্ষায় সফল হয়েছিলেন, সেটা পরবর্তী ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের ঘটনা থেকেই বুঝা যায়। ব্যাপারটি গোপন রাখতে না পারলে ৩ নভেম্বরের আগেই এ সংগঠনটির কার্যকলাপ বন্ধ করা যেত। ১৫ আগস্টের আগের



www.nagorikpathagar.org

বাস্তবতায় জাসদ সমর্থিত গোপন সংগঠনটির সামনে সেনাবিপ্লবের জন্য একটি বড় বাধা ছিল দেশের প্রশাসন তথা সরকার। ১৫ আগস্টের পর জাসদের জন্য 'বড় বাধা'টি অপসারিত হয়ে যায় এবং নিজেদের অজান্তেই বঙ্গভবনে অবস্থানগ্রহণকারী মেজরগণ জাসদের উপকার করে বসেন। এরপর জাসদের জন্য তাদের লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারটি হয় অনেকটা ফাঁকা মাঠে গোল দেয়ার মতো। কিন্তু হঠাৎ করে ৩ নভেম্বরের ঘটনা ঘটে যাওয়ায় তাদের সব পরিকল্পনা হুমকির সম্মুখীন হয়।

৩ নভেম্বরের ঘটনা ঘটে তৎকালীন চিফ অফ দি জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, বীরউত্তম-এর নেতৃত্বে। প্রধান সাহায্যকারী ছিলেন ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের তৎকালীন ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল বীরবিক্রম। তৎকালে ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের সংগঠনে বেঙ্গল রেজিমেন্টের তিনটি ব্যাটালিয়ন ছিল। যথা, প্রথম ইস্ট বেঙ্গল, দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল এবং চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল। একটি আর্টিলারি রেজিমেন্টও ছিল যথা, দ্বিতীয় রেজিমেন্ট আর্টিলারি। ১৫ আগস্ট '৭৫-এর ঘটনায় দ্বিতীয় রেজিমেন্ট আর্টিলারি জড়িত ছিল।

৩ নভেম্বরের ঘটনায় প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট পুরোপুরি জড়িত ছিল। ৩ নভেম্বরের ঘটনাটি আনুষ্ঠানিকভাবে সংজ্ঞায়িত করলে দাঁড়ায় একজন সেনা অফিসারের নেতৃত্বে একটি সেনা অভ্যুত্থান। দিনের অতি প্রত্যুষে সুপরিকল্পিতভাবে তারা বঙ্গবভন, রেডিও ও টিভি স্টেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিমানবন্দর ইত্যাদি কব্জা করে। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একদল অফিসার ফাইটার বিমান নিয়ে এ বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ সমর্থন জোগায়। ৩ নভেম্বরের সামরিক বিদ্রোহের অন্যতম আনুষঙ্গিক ঘটনা ছিল তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রথমে গৃহবন্দী করা ও দ্বিতীয়ত পদচ্যুত করা। জেনারেল জিয়া-সংশ্লিষ্ট ঘটনাতেই কিন্তু সেনাবাহিনীর একটি অংশ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের বিপক্ষে মানসিক অবস্থান নিয়ে নেয়। ৩ নভেম্বরের সামরিক বিদ্রোহের অন্যতম লক্ষ্য ছিল বঙ্গবভনে অবস্থানকারী ১৫ আগস্টের বিদ্রোহীদের পরাস্ত করা বা নিয়ন্ত্রণে আনা। দুদিনের দীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক অভিযানের পর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের পক্ষ তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারত। কিন্তু ৩ নভেম্বরের সকালে অন্য একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঢাকায় ঘটে যায়। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের বিদ্রোহের ঘন্টা দু/একের মধ্যেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এক মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। যার পরিণতিতে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন চার জাতীয় নেতা নৃশংসভাবে নিহত হন। জেলখানার ঘটনা ঘটার আগে বা ঘটার সময় এ সম্পর্কে সামরিক অভ্যুত্থানকারীরা কিছু জানতেন কি জানতেন না এটা বিতর্কিত বিষয়। তবে যা বির্তকের ঊর্ধ্বে, তা হল, বিদ্রোহের পরপরই জেলখানাকে সুরক্ষিত করার বিষয়ে অবহেলা। বিদ্রোহের পরবর্তী চারদিন বিদ্রোহীদের পরাস্ত করা ও সরকার গঠন নিয়ে দেশে এক অচলাবস্থা বিদ্যমান থাকে। দুদিন পর, ব্রিগেডিয়ার



www.nagorikpathagar.org

খালেদ মোশাররফের পক্ষে, কিছু আওয়ামী লীগ নেতার আয়োজনে ঢাকায় মিছিল বের হয়। এতে সেনা বিদ্রোহটি রাজনৈতিক রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়।

৩ নভেম্বরের ঘটনার পর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ মেজর জেনারেল র‍্যাঙ্ক প্রমোশন গ্রহণ করেন এবং সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন। ঐ তিনদিন দেশে কোনো সরকারের উপস্থিতি জনগণ অনুভব করতে পারেনি। সামরিক বাহিনীসমূহের অভ্যন্তরে এক প্রকার অস্বস্তি ও আশঙ্কা প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করে। এই সুযোগে গোপন সৈনিক সংস্থা বা সংস্থাসমূহ অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ৭ নভেম্বরের ঘটনা হচ্ছে সৈনিক সংস্থার নেতৃত্বে শুরু এক সেনাবিপ্লব, যা চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকেনি।

৫ ও ৬ নভেম্বর দুদিন ও মধ্যবর্তী এক-রাত আমি ঢাকা থেকে দূরে ছিলাম বিধায় ঐ মহাগুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দিন দুটির চাক্ষুষ সাক্ষী হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছি। ৬ তারিখ দিনের বেলা ঢাকা সেনানিবাসে যত্রতত্র লিফলেট বিতরণ হয়। মুখে মুখেও একই সংবাদ প্রচার লাভ করে। হ্যান্ডবিল ও মৌখিক সংবাদটির সারমর্ম ছিল যে, '৬ নভেম্বর দিবাগত মধ্যরাত্রি থেকে সৈনিকগণের পক্ষ থেকে বিপ্লব সাধিত হবে, অফিসারগণকে খতম করা হবে।' কর্নেল তাহের ও জেনারেল জিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক তথা ভাবের আদান-প্রদান বা কর্মপন্থা নিয়ে মতবিনিময় সম্পর্কে আমি কোনো মন্তব্য করছি না। তবে ৬ নভেম্বর দিবাগত মধ্যরাত্রিতে সৈনিক বিপ্লব শুরুর পরপরই আমি ব্যক্তিগতভাবে নিজে যাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম সেই দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে হাজির হই। তারপর থেকে পুরোরাত্রির এবং পরের দিনের আংশিক ঘটনাবলির সাক্ষী। আমার মতো এমন সাক্ষী শত শত ছিল।

সৈনিক বিপ্লব শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই জেনারেল জিয়াউর রহমান বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে যান। কিন্তু সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ অংশই এটা রাতের বেলা জানতে পারেনি। ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলির হুবহু বর্ণনা কোনো একজন ব্যক্তির পক্ষে দেয়া প্রায় অসম্ভব। অনেক অফিসার সাহস করে নিজেদের পরিচিত সৈনিকদের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়েছে এবং অনুরক্ত সৈনিক ও অফিসার-এর সম্মিলিত বুদ্ধিতে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। অনেক অফিসার সেনানিবাস ছেড়ে চতুর্দিকের গ্রামে বা জনপদে পালিয়ে গেছে। সৈনিকগণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সীমা লঙ্ঘন করেনি। তবে ৭ নভেম্বর সকাল বেলার দৃশ্যপট ছিল অনেকটা '৭১ সালের ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বরের মতো। হাজার হাজার সৈনিক জনতার সঙ্গে মিলিত হয়ে ঢাকা শহরের রাজপথে গাড়িতে, পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য দৃশ্যমান ছিল না। চেইন অফ কমান্ডের উচ্চস্তরে তখন ভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং তাকে সর্মথনকারী বিদ্রোহী নেতাগণ ঢাকা শহর ত্যাগ করতে গিয়েও ব্যর্থ হন। রংপুর থেকে কর্নেল নাজমুল হুদা এবং চট্টগ্রাম থেকে লে. কর্নেল হায়দার ঢাকা এসেছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের আহ্বানে।



www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ্য, কর্নেল নাজমুল হুদা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (বা শুধু আগরতলা মামলা)-এর অন্যতম অভিযুক্ত এবং ঐ কারণে চাকরিচ্যুত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন দায়িত্ব ও অধিনায়কত্ব পালন করছিলেন। অপরপক্ষে লে. কর্নেল এ টি এম. হায়দার ছিলেন পাকিস্তান 'এসএসজি' (বা কমান্ডো) দলের সদস্য এবং দুর্দান্ত সাহসী মুক্তিযোদ্ধা ও বিচক্ষণ সংগঠক। এই দুজনসহ মোট তিনজন শেরে বাংলানগরে এমপি হোস্টেলে অস্থায়ী ভিত্তিতে অবস্থানরত দশম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু ওখানেই তারা নিহত হন।

সৈনিক সংস্থার সদস্যসংখ্যা ছিল সীমিত। বিপ্লবকে তারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়। জেনারেল জিয়ার ব্যক্তিগত পরিচিতি ও আবেদনের সম্মুখে সৈনিক সংস্থার আবেদন উড়ে যায়। তাই সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ও বিচক্ষণতায় ৭ তারিখ দিবাগত সন্ধ্যা থেকেই অতি ধীরে ধীরে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা ফিরে আসতে শুরু করে। সৈনিক এবং জনতা একত্রিত হয়েছিলেন বলেই ঐদিনের ঘটনার নাম বিপ্লব ও সংহতি দিবস। অপরপক্ষে অনেকেই এটাকে মুক্তিযোদ্ধা ও সৈনিক হত্যা দিবস বলে অভিহিত করে। আসল কথা হলো সবগুলোই কিছু না কিছু সত্যি। ঐদিনের বিপ্লবী সৈনিকদের হাতে (তাদের জানায় বা অজানায় হোক) বহু অফিসার ও তাদের পরিবার নিহত হন। ঐদিনের কারণে পরবর্তী সময়ে বহু অফিসার ও সৈনিকের বিচার হয়। বিচারে অনেকের মৃত্যুদণ্ড হয়। যাই হোক সর্বোপরি কথা হলো, সেনাবাহিনী টিকে থাকে। দেশ ও জাতি রক্ষা পায়।

দৈনিক প্রথম আলো ০৩/১১/১৯৯৯ইং



www.nagorikpathagar.org

# সশস্ত্রবাহিনী দিবসের ভাবনা : বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পেশাদারিত্ব

১.

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ বিমানবাহিনী সম্মিলিতভাবে প্রতি বছর ২১শে নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস উদযাপন করে। এটা বিগত ১৪ বছর যাবৎ চলছে। কোনো বাহিনী আর আলাদাভাবে নিজস্ব প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করে না। এদিন সকালে ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত 'শিখা অনির্বাণে' রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক, প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং তিন বাহিনীর পক্ষ থেকে আলাদা আলাদাভাবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিন সন্ধ্যায় ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত 'সেনাকুঞ্জে' তিনবাহিনীর পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নিমন্ত্রণে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগরীর বহু গণ্যমান্য এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, বেশিরভাগ অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারগণ ও ঢাকা অঞ্চলের চাকরিরত সামরিক অফিসারগণ সপরিবারে এতে নিমন্ত্রিত হন। এতে করে সশস্ত্রবাহিনীসমূহ ও সিভিল সোসাইটি বা সুশীল সমাজের মধ্যে এবং নিমন্ত্রিত অতিথিদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে পরিচয় ও বোঝাপড়া ঘনীভূত হয়। এছাড়াও ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসের প্যারেড অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ও অন্যান্য বিবিধ সামরিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের জনগণ সামরিক বাহিনী সম্পর্কে জানতে পারেন। আজকের এই ২১শে নভেম্বর এবং ২৫ দিন পরের ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিবস হচ্ছে এই শতাব্দীর শেষ আলোচ্য দিবসসমূহ। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু হয়েছিল সেটিই আগামী শতাব্দীতে প্রবেশের মুহূর্তে কী রকম পর্যায়ে আছে সেটা আলোচনাযোগ্য বিষয় অবশ্যই। আজকের দিনে আলোচনার সূত্রপাত করাটা যথাযথ মনে হচ্ছে।

২.

সামরিক বাহিনীসমূহকে নিয়ে তীক্ষ্ণ বা তীর্যক সমালোচনা কমই হয়। ১৯৯৬ সালের মে মাসের ২০ তারিখের পর কিছুদিন লেখালেখি হয়েছিল। এ বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পুনরায় একই বিষয়ে পাল্টাপাল্টি সুরে লেখালেখি হয়েছে-যেটা পাঠকদের জন্য খুবই অপ্রীতিকর এবং শ্রুতিকটু ছিল। সর্বোপরি, কোনোক্রমেই শোভনীয় ও পূর্ণ সত্য ছিল না। এতে সেনাবাহিনীর সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'দৈনিক মানবজমিন' পত্রিকায় বৃহস্পতিবার ৭ই অক্টোবর '৯৯ তারিখে জনাব ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর লেখা একটা সমালোচনামূলক তথা আবেদনমূলক নিবন্ধ অনেক পাঠকের সঙ্গে



www.nagorikpathagar.org

আমারও দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। আমি পারলে পুরো প্রবন্ধটাই এখানে উদ্ধৃত করতাম। কিন্তু তা সম্ভবত বাস্তবসম্মত নয়। তার লেখার সর্বশেষ বাক্যটি পড়তে যেমন কষ্ট লাগল, আমার মনে হয়, উনারও লিখতে কষ্ট লেগেছে। বাক্যটি নিম্নরূপ : "আমাদের বিজ্ঞ সেনাপতিরা তাদের 'ময়লা অন্তর্বাস' যেভাবে রাজপথে ধৌত করছে তার ইতি টানা বোধহয় খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে"। ঐ নিবন্ধের শেষ পর্যায়ে একটি যুক্তিসঙ্গত প্রসঙ্গ বা প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। আমি সেটা উদ্ধৃত করছি : "আমার জানতে ইচ্ছা হয়, সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরের বিষয়াদি নিয়ে বিবৃতি প্রদান বা পত্রিকার পাতায় বিতর্কিত বক্তব্য-পাল্টা বক্তব্য তুলে ধরার ব্যাপারে আমাদের সেনাবাহিনীতে কি কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিধি/নিষেধ নেই? অবসরপ্রাপ্তরা কি ঢালাওভাবে তাদের চাকরিকালীন গোপনীয় ঘটনাবলী নিয়ে প্রকাশ্যে লিখতে পারেন? এক্ষেত্রেও কি কোনো বিধি/নিষেধ নেই? বিধি/নিষেধ অবশ্যই আছে। সেটা মান্য করাটা উচিত। সরকারিভাবে 'গোপনীয়' বিন্যাস করা বক্তব্য অবশ্যই বিধিবহির্ভূতভাবে প্রকাশ করা উচিত নয়। তবে আবেগের ও বিচারের ক্ষেত্রে বিধি খাটে না। নিবেদন করছি যে, সেনাসদস্যরাও মানুষ, তারাও বিচার বা অবিচারের শিকার হতে পারে এবং তাদেরও মনে কষ্ট থাকতে পারে। তাই তাদের মনঃকষ্ট বা প্রতিবাদমূলক অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য বৈধ ও ভদ্রজনোচিত পন্থা বা মাধ্যম আইন কর্তৃক নির্দেশিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান সেনাবাহিনী-আইন (আর্মি অ্যাক্ট) ও সংবিধান, এ প্রসঙ্গে মাত্র আংশিক পথনির্দেশনা দেয়। ২০শে মে ১৯৯৬-এর ঘটনা নিয়ে সেনাবাহিনী আইন ও সংবিধানের দৃষ্টিতে সন্তোষজনক ও সম্মানজনকভাবে গ্রহণযোগ্য কোনো তদন্ত না হওয়ার কারণেই মনে হয় এ রকম লেখালেখি হয়েছে। সম্মানিত ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী এবং দেশের অন্য সম্মানিত গুণীজনদের কাছে এই মর্মে আবেদন অব্যাহত থাকবে যে এই বিষয়টির একটি সম্মানজনক আইনানুগ তদন্ত হওয়া জরুরি। ১৯শে নভেম্বর ১৯৯৮ থেকে ১১ই ডিসেম্বর ১৯৯৮ পর্যন্ত ২৩ কিস্তিতে 'দৈনিক প্রথম আলো'তে আমি একটা লেখা লিখেছিলাম। ওই লেখাটি শতকরা ৩০ ভাগ বর্ধিত হয়ে, 'সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে আটাশ বছর' নামক পুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে আলোচ্য প্রসঙ্গে বিস্তারিত বক্তব্য বিনীতভাবে রাখার চেষ্টা করেছি বলে এখানে আর বলছি না। এস্থলে আমার উদ্দেশ্য ২০শে মে ১৯৯৬ সালের ঘটনা বর্ণনা নয়, বরং ২১শে নভেম্বরের উপলক্ষে একটা পর্যালোচনা করা। কিন্তু সম্মানিত পাঠকগণের জন্য প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করতে গিয়েই উপরের কথাগুলো বলা।

৩.

বিগত ২৮ বছরের জীবনে সেনাবাহিনীতে অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা অবশ্যই হয়েছে – যার কারণে একটি আধুনিক, সুসজ্জিত, সুপ্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রচেষ্টা বিঘ্নিত হয়েছে। বহু পূর্বে প্রাইমারি স্কুলে অঙ্ক করতে হতো অনেকটা এরকম- "একটি ১৩ ফুট উচ্চ তৈলাক্ত বাঁশ বাহিয়া উপরে উঠিবার সময় একটি বানর প্রতি



www.nagorikpathagar.org

লাফে ৪ ফুট উঠে কিন্তু সাড়ে তিন ফুট পিছলাইয়া নিচে নামিয়া যায়। এইরূপভাবে কয় লাফে বানরটি বাঁশের উপরে উঠিতে পারিবে?" যদি ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়কালে ভালোমন্দ ঘটনাবলিতে সেনাবাহিনী না জড়াত তাহলে সেনাবাহিনী বর্তমানে কী পর্যায়ে থাকত সেটা হুবহু বলা মুশকিল হলেও এইটুকু বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে. উন্নত ও অধিক সুনামধারী থাকত। যাহোক. সেনাবাহিনীর মঙ্গলার্থে এবং সম্মানিত পাঠক সমাজের অবগতির জন্য আজকের দিনে একটি গঠনমূলক পর্যালোচনা করার উদ্যোগ নিচ্ছি।

৪.

যুদ্ধ হচ্ছে কোনো সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা, কিন্তু খুবই দামি বা কস্টলি পরীক্ষা। সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্বের মান কেমন-এটা নির্ণয় করার জন্য কারোর সঙ্গে গায়ে পড়ে যুদ্ধ লাগানো সম্ভব না বা এর প্রশ্নই ওঠে না। এটা ছাড়াও আরো উপায় আছে এটা নির্ণয় করার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কট্টর সমালোচক যারা তাদের মুখ থেকে অভিযোগ আসে, সেনাবাহিনী রাষ্ট্রপতি হত্যা করে, সামরিক শাসন জারি করে এবং দেশের জনগণের সঙ্গে যুদ্ধ করে। সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ডে প্রশংসামুখর যারা তারা বলেন যে, দেশ ও জাতির ক্রান্তিলগ্নে সেনাবাহিনী বারবার পরিস্থিতিকে আয়ত্তে রাখে, যে কোনো দুর্দিনে জনগণের পাশে দাঁড়ায়, যে কোনো সরকারের স্থিতিশীলতায় পরোক্ষভাবে সহায়তা করে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সর্বদা সজাগ থাকে। সত্যি কথা হলো এই যে, সবগুলোই কিছু না কিছু সত্যি। সেনাবাহিনীর সকল সদস্য এই সুনাম ও দুর্নাম উভয়ের ভাগীদার হলেও সুনাম ক্ষেত্রে সকলের পরিশ্রম প্রয়োজন, কিন্তু দুর্নাম ছড়ানোর ক্ষেত্রে গুটিকয়েক লোকের অবদানই যথেষ্ট। এরকমটিই হয়েছে।

৫.

আজ থেকে প্রায় ১৫-২০ দিন আগে পরপর তিনটি অনুষ্ঠানে দেশের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন তথা সাংগঠনিক বৃদ্ধি নিয়ে কয়েকটা কথা বলেছেন। সিলেট অঞ্চলে একটি ব্রিগেড সংগঠন করা, যমুনা সেতু তথা বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় একটি বহুমুখী (কম্পোজিট) ব্রিগেড সংগঠন করা ও দুএকটি সেবা খাতের ব্যাটালিয়ন বা কোম্পানি সংগঠন করার কথা বলা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের সড়ক উন্নয়ন ও নির্মাণের নিমিত্তে একটি ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্যাটালিয়ন সংগঠন করার কথা বলা হয়েছে। এতে অনেকে ভাবতে পারেন, সেনাবাহিনীর জনবল ও আকার হঠাৎ করে বাড়ানো হচ্ছে। আসলে কথাটা ওই রকম না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জনবল একজনও না বাড়িয়ে নতুন নতুন ইউনিট সংগঠন করা যায়।



www.nagorikpathagar.org

বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যেহেতু কিছু জনবল উদ্ধার করা হচ্ছে, সেহেতু তাদের দিয়ে অন্য জায়গায় সংগঠন বৃদ্ধি করা যায়। কারণ, সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোতে অনেকগুলো ইউনিটের শূন্যতা আছে। যেমন, একটা সাংসারিক উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। একটা ঘরের চালা খাড়া করতে আটটি খুঁটির দরকার। প্রথমে চারটি খুঁটি দিয়ে এটাকে দাঁড় করালাম। তারপর সময় নিয়ে একটা একটা করে বাকি চারটা খাড়া করালাম। খাড়া করিয়ে চালার সঙ্গে লাগিয়ে দিলাম। এতে চালাটা আটটি খুঁটির অবলম্বন পেয়ে শক্ত হয়ে গেল। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রেও এই উদাহরণটি প্রযোজ্য। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর আমলে ব্রিগেড কনসেপ্টে এবং ১৯৭৬-এর জুলাই থেকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার আমলে ডিভিশন কনসেপ্টে সেনাবাহিনীর যে সাংগঠনিক তৎপরতা শুরু হয় সেটা এখনো অব্যাহত আছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যতগুলো ডিভিশন আছে ততগুলো ডিভিশনকে পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী করতে হলে যেসব সংখ্যক ব্রিগেড ও ব্যাটালিয়ন দরকার সেগুলো নেই। টাকা পয়সার অভাবে সেগুলো পূরণ করতে আমাদের সময় লাগছে। এরকমই অনেকগুলো শূন্যস্থানের কয়েকটি শূন্যস্থান বর্তমান সরকার পূরণ করছেন।

৬.

আবার ইউনিট বা ব্যাটালিয়ন বা কোম্পানি ইত্যাদি কাঠামোতে লোকসংখ্যা কত হবে সেটাও পরিবর্তনযোগ্য। যেমন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাখি, গণ্ডা, কানি, বিঘা ইত্যাদি জমির মাপের একক একেক জায়গায় একেক পরিমাণের আয়তনে হয়, সেরকম বিভিন্ন সেনাবাহিনীতে সাংগঠনিক কাঠামোতে একই নামের সংগঠনের লোকসংখ্যার তারতম্য হয়। যাহোক, সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক কাঠামোতে বাংলাদেশের প্রত্যেক সরকারই কিছু না কিছু উন্নতি অবদান রেখেছেন। বর্তমান সরকারও রাখলেন, তার জন্য ধন্যবাদ প্রাপ্য।

৭.

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো চারটি সংযোজনের কথা বলেছেন। মিরপুর সেনানিবাসে দেড় বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (MIST)। এখান থেকে বিবিধ প্রকারের প্রকৌশলী ও ব্যবস্থাপনা বিশারদ বের হবে। মিরপুর সেনানিবাসে ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ক্রমবর্ধমান সুনাম নিয়ে বিদ্যমান আছে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড স্টাফ কলেজ (DSCSC)। এখানে আট বছর থেকে ১৩ বছর চাকরির বয়স সম্পন্ন মেজর র‍্যাঙ্কের অফিসারগণ এক বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আনুমানিক একই রকম চাকরির বয়সসম্পন্ন ও সমপর্যায়ের র‍্যাঙ্কের নৌবাহিনী অফিসার ও বিমান অফিসারগণও একই মেয়াদে স্টাফ



www.nagorikpathagar.org

কোর্স সম্পন্ন করেন। এতে তিনবাহিনীর মাঝারি পর্যায়ের অফিসারদের মধ্যে বোঝাপড়া বেশি হয়। এই স্টাফ কলেজটি বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যলয়ের সঙ্গে এফিলিয়েটেড এবং এদের সিলেবাস প্রণয়নে জাতীয় বিশ্ববিদ্যানয়ের ভূমিকা আছে। এক বছর প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটা বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করে এবং সফল ছাত্রদের 'মাস্টার্স ইন ডিফেন্স স্টাডিজ' বা MDS ডিগ্রি প্রদান করে। ঐ ছাত্রটি যুগপৎ সামরিক পিএসসি ও বেসামরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের MDS ডিগ্রি পায়। এই স্টাফ কলেজের পাশেই দেড় বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজ (NDC)। আজ থেকে ১৫-২০ দিন আগে প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে কনভোকেশন বা সমাবর্তন তথা গ্রাজুয়েশন সিরিমনি অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এখানে সশস্ত্রবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে পাঁচজন বেসামরিক তথা সিভিল সার্ভিসের অফিসারও ছিলেন। 'ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে' পরিচালিত ন্যাশনাল ডিফেন্স কোর্সের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি হলো-হায়ার ডিফেন্স ম্যানেজমেন্ট বা 'উচ্চতর প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা'র ওপর সম্যক জ্ঞান বৃদ্ধি। অন্য একটি কথা হলো : উচ্চতর ডিফেন্স ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা কোনক্রমেই শুধুমাত্র সামরিক কর্মকর্তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয় নয়। বেসামরিক কর্মকর্তাগণও এতে অবশ্যই জড়িত। এটা সব দেশের জন্য প্রযোজ্য। দেশের প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার মাঝারি ও উচ্চ পর্যায়ে যে সামরিক ও বেসামরিক অংশীদারিত্বের প্রয়োজন সেটা আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে দেশের সামরিক এবং বেসামরিক কর্মকর্তাগণ তথা সুশীল সমাজের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং চিন্তার ইনটিগ্রেশন প্রয়োজন। এনডিসির মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। এ সকল চিন্তাভাবনায় সুশীল সমাজকে অধিক জড়িত করার লক্ষ্যে আমরা কয়েকজন মিলে বেসরকারি পর্যায়ে সেন্টার ফর স্ট্রাটিজিক অ্যান্ড পিস স্টাডিজ' নামক একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক গবেষণা সংস্থা তথা সমিতি গঠন করেছি। এই বোঝাপড়ার প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

৮.

তৃতীয়ত, এক বছর পূর্বে ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালের সন্নিকটে আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। চার বছর পর সেখান থেকে প্রথম ডাক্তার বের হবে। এমআইএসটি বা মেডিকেল কলেজ উভয়টিতেই মেধার ভিত্তিতে সামরিক ব্যক্তিবর্গের সন্তানাদি এবং বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের সন্তানাদি লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকেই হচ্ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় সেগুলো বাস্তবতার মুখ দেখল। অবশ্য যে কোনো জিনিসই বাস্তবায়নে সময় লাগে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকেই ধন্যবাদ। তবে উল্লেখযোগ্য ধন্যবাদ পাওয়ার অধিকারী হচ্ছেন



www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বর্তমান সেনাপ্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, বীরবিক্রম, এনডিসি, পিএসসি-এর নেতৃত্বে বর্তমান পর্যায়ের উচ্চ সেনা নেতৃত্ব। যতটুকু জানি, জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমানের বিশেষ আগ্রহের কারণেই এ কাজগুলোর ত্বরিৎ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। অনুরূপভাবে ১০ বছর পূর্বে শুরু করা আরো একটা প্রকল্প জেনারেল মোস্তাফিজের হাতে এসে শেষ হয়েছে। যথা-আর্মি ট্রাস্ট ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা। এখন থেকে পাঁচ-ছয় মাস আগে সরকার বেশ কয়েকটা প্রাইভেট ব্যাংক স্থাপনের অনুমতি দেয়, তার মধ্যে একটি হলো 'ট্রাস্ট ব্যাংক'। সেনাবাহিনীর আধা সরকারি ও বেসরকারি টাকাগুলোই হলো এর প্রাথমিক মূলধন। যতদূর জানা গেছে, এই ব্যাংক পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের সকল সদস্যই সেনাসদরের সিনিয়র অফিসার। 'ব্যাংকিং' তাদের মূল পেশা নয়। এই প্রেক্ষাপটে বিবিধ বিদগ্ধ ব্যক্তির সঙ্গে এবং সেনাবাহিনীর শুভাকাঙ্ক্ষীদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায় যে, এই ট্রাস্ট ব্যাংকের বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসে পেশাদার ব্যাংকার জড়িত রাখা একান্ত প্রয়োজন। এতে ব্যাংক পরিচালনায় দক্ষতা ও স্বচ্ছতা উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। এই যে 'পেশাদার ব্যাংকার' নামক শব্দটা আমি ব্যবহার করলাম, এই রকমই একটি শব্দ হচ্ছে 'পেশাদার সামরিক অফিসার' বা 'পেশাদার সৈনিক' বা 'পেশাদার সেনাবাহিনী'। কিছু কিছু গুণাবলির কারণে একজন ব্যাংক অফিসার পেশাদার ব্যাংকার হিসেবে সুনাম অর্জন করেন ; অনুরূপভাবেই কিছু কিছু বিশেষ গুণাবলির কারণেই চিহ্নিত অফিসারগণ পেশাদার অফিসার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আবহাওয়া ও পরিচিতি মণ্ডলে সকল সেনা অফিসারকেই পেশাদার অফিসার বলা হয় না। যেসকল অফিসার শয়নে-স্বপনে, আহারে-বিহারে, পড়ায় বা শোনায়, সব সময় সততা, দক্ষতা ও কর্তব্যের কথা চিন্তা করেন এবং নিজ ব্যক্তি (জাগতিক) জীবনে এগুলোর প্রতিফলন ঘটান, ব্যক্তিগত লোভলালসা ও স্বার্থের কথা চিন্তা করেন না, তাদেরই অন্যরা পেশাদার বা প্রফেশনাল বলে। এই প্রফেশনালিজম বা পেশাদারিত্ব প্রত্যেক অফিসারের মধ্যে গড়ে তোলার পেছনে অনেকগুলো ফ্যাক্টর কাজ করে। তার মধ্যে অন্যতম হলো যুগোপযোগী জ্ঞানার্জন ও লেখাপড়ার চর্চা। এই প্রসঙ্গেই উপরে বর্তমান সরকার ও বর্তমান সেনাপ্রধানের অবদানের কথা বললাম। এগুলো পজিটিভ আঙ্গিক। আরো পজিটিভ আঙ্গিক আছে। অনুরূপ নেগেটিভ বা মন্দ আঙ্গিকও অবশ্যই আছে। সবগুলোই আলোচনা করব। উদ্দেশ্য, যেন মন্দ ফ্যাক্টর এড়িয়ে ভালোগুলোর সর্বাধিক উপকার গ্রহণ করা যায়।

৯.

উত্তরোত্তর পেশাদারিত্ব অর্জন প্রসঙ্গে সব দেশের সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি প্রভাব বিস্তারকারী ফ্যাক্টর বা



www.nagorikpathagar.org

উপান্ত হচ্ছে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ। আমি আবারও জনাব ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী থেকে উদ্ধৃত করছি : "আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সেনাবাহিনী সদস্যদের গৌরবময় অবদানের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মূলত মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার ও জোয়ানদের সমন্বয়েই স্বাধীন বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী গড়ে উঠেছে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই আমাদের সেনাবাহিনীকে নিয়ে যে ধরনের টানাপড়েন চলছে, আজকের বাংলাদেশের যাবতীয় রাজনৈতিক ও অন্যবিধ সংকটের মূলে তার অবদানই বোধহয় সবচেয়ে বেশি।" আজকের তারিখে যদি হিসাব করি তাহলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ১ হাজারের বেশি হবে না। আগামী ৫ বছরের মধ্যেই এটা শূন্যের কোঠায় আসবে। বস্তুত বিগত ২৬ বছর যাবৎ কমবেশি মাত্রায় বিদ্যমান মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধাগণের মধ্যকার অঘোষিত, অপ্রকাশিত দ্বন্দ্ব এখন নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। কারণ মুক্তিযোদ্ধাগণের সঙ্গে সঙ্গে অমুক্তিযোদ্ধাগণও স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই অবসরে যাচ্ছেন। আজ থেকে ২৫ বছর পর কোনো সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধাকে জীবিত খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। মুক্তিযোদ্ধাগণ তাদের কর্মের স্মৃতি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে আগ্রহী। ১৯৭২ থেকে এ পর্যন্ত এরূপ স্মৃতি রক্ষণের জন্য বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরূপ একটি সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন ১৯৯৪ সালে যশোর সেনানিবাসের জিওসি তৎকালীন মেজর জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান, বীরবিক্রম। তিনি সম্পূর্ণ নিজ মেধা ও উদ্যোগে 'গৌরবাঙ্গন' নামে একটি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি জাদুঘর স্থাপন করেন। সেই অনুপ্রেরণায়, আমরাও চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে অবস্থিত 'বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি' প্রাঙ্গণে নিজ উদ্যোগে ও মেধায় 'স্বাধীনতা মানচিত্র' নামক একটি উন্মুক্ত (ওপেন-এয়ার) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ভাস্কর্য স্থাপন করি। ভাস্কর্যের উপাদান এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছিল যেন সেটা রাজনৈতিকভাবে বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকে। জেনারেল মোস্তাফিজের উদাহরণে অনুপ্রাণিত হয়ে সেনাবাহিনীর অন্যান্য জায়গায়ও কিছু কিছু ভাস্কর্য ও জাদুঘর নির্মাণ করা হয়েছে। আমার ধারণা হলো যে, শুধু রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়ে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধকে পরিচিত করানো যাবে না। অন্যান্য যুক্তিসঙ্গত, বাস্তবসম্মত পন্থা প্রয়োজন। মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্বের ওপরে থাকতে বাধ্য। নয় মাস না হয়ে মুক্তিযুদ্ধ যদি নয় বছর হতো তাহলে এর প্রভাব আরো খাঁটি এবং ঘনীভূত হতো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নিমিত্তে ভবিষ্যতের যে কোনো যুদ্ধে, মুক্তিযুদ্ধকালে অনুসৃত রণকৌশল প্রভাব ফেলতে বাধ্য। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের সামরিক ইতিহাসের ওই অধ্যায়টি মনোযোগ সহকারে লিখন এবং পঠন প্রয়োজন বলে মনে করি। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের রণকৌশল যতই আধুনিক হউক না কেন, মাটি ও মানুষ ছাড়া যুদ্ধ সম্ভব না। তাই বাংলাদেশের মাটি ও মানুষকে নিয়ে সেনাবাহিনীর যুদ্ধকৌশল চিন্তা করতে হবে।



www.nagorikpathagar.org

১০.

আলোচনা করতে করতে এখন আমরা সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্বের অন্য একটি আঙ্গিক সম্বন্ধে আলোচনা পর্যায়ে এসেছি। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের শুরুতেই এমন একটি ধারণা ছড়াবার চেষ্টা হয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে ও বর্তমান সময়েও এমন একটা ধারণা ছড়ানো হচ্ছে যে, "যেহেতু আমাদের চারপাশে আছে বন্ধু রাষ্ট্র ভারত এবং যেহেতু এই বন্ধু রাষ্ট্রের দিক থেকে আমাদের আক্রান্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, অতএব, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য জাতীয় সম্পদ 'অপচয়' করা অর্থহীন। অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী পুলিশি ব্যবস্থা থাকাই যথেষ্ট।" রাজনীতিতে চিরন্তন শত্রু বা চিরন্তন বন্ধু বলে কোনো কথা নেই। অনুরূপ যুদ্ধের ক্ষেত্রেও নেই। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে ৯৫ ভাগ হলো ভারত এবং ৫ ভাগ হলো মায়ানমার। যদি কোনোদিন কোনো প্রয়োজন পড়ে তাহলে এ দুটি রাষ্ট্র আমাদের সহজেই আক্রমণ করতে পারে এ কথাটা বলতে আমাদের লজ্জা হওয়ার কোনো কারণ নেই।

পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ যদি আমাদের ওপর আক্রমণ করতে চায়, তাহলে স্থল বা আকাশ পথে ভারত বা মায়ানমারকে ডিঙিয়ে করতে হবে অথবা ভারত বা মায়ানমারের চোখের সামনে দিয়ে বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে উত্তরমুখী হয়ে করতে হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে প্রথাগত সামরিক বাহিনীর সংখ্যা ভারতে যেরকম, আমরা কোনোদিনই ওই রকম অনুপাত অর্জন করতে বা ভারতের আনুপাতিক সমকক্ষ হতে পারব না। এর অন্যতম কারণ আমাদের অর্থনৈতিক দৈন্য। এ কথাও সত্যি সমকক্ষ হওয়ার প্রয়োজনও বাধ্যতামূলক নয়। আমরা যুদ্ধ চাই না। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার নিমিত্তে প্রচলিত অন্যান্য সব পন্থা যদি অসফল হয় তথা ফেল করে, তাহলেই মাত্র যুদ্ধের প্রশ্ন আসে।

যদি যুদ্ধ একান্তই লাগে তার জন্য প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্বের অন্যতম উপাত্ত হতে হবে জনযুদ্ধের জন্য এবং জনযুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি। কোনো গৃহস্থই চায় না যে তার বাড়িতে ডাকাতি হোক। মনের এ কামনার সঙ্গে গৃহস্থ যোগ করেন সম্ভাব্য ডাকাতি রোধের বস্তুগত ব্যবস্থা। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যুদ্ধ প্রস্তুতির তথা যুদ্ধের নিমিত্তে প্রশিক্ষণের যে মানসিকতা সেটাতে একটি সমস্যা আছে। ওই সমস্যাটি হলো পেশাগত প্রয়োজনেই সামরিক রণকৌশল সংক্রান্ত লেখাপড়াতে ভারতকে বিপক্ষ মনে করে করতে হয়। দেশে-বিদেশে অনেকেই এতে 'ভারত-বিরোধিতা'র গন্ধ খুঁজে পেতে পারেন। কিন্তু আসলে তা অবান্তর। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অতি চমৎকার হলেও ওইরূপ মানসিক প্রস্তুতি লাগবেই। সেনাবাহিনীকে এ কথাটা মনে রেখেই পেশাদারিত্বের উন্নতি করতে হবে। আরেকটা উদাহরণ দেই। আধুনিক ড্রাইভিং বা গাড়ি চালনার প্রশিক্ষণ সিমুলেটরেই শুরু হয়, কিন্তু এক পর্যায়ে রাস্তায় গাড়ি চালাতেই হবে। অনুরূপ সামরিক



www.nagorikpathagar.org

প্রতিরক্ষামূলক প্রশিক্ষণকালেও সীমান্তকে কল্পনা করতেই হবে, সীমান্তের অপর পারের মানুষ ও মানুষের মতি-গতিকে জড়িত করতেই হবে। এটা পৃথিবীর সকল দেশেই করে। দিক নির্ণয়টি শুধু সময়ের ব্যাপার। পোল্যান্ড বা হাঙ্গেরীর মতো দেশের উদাহরণ দিয়ে বলতে হয় যে, তারা ১০ বছর আগে তাদের পশ্চিম সীমান্ত ও সীমান্তের অপর পারের মানুষকে নিয়ে চিন্তা করত। কিন্তু এখন হুবহু বিপরীত দিককে অর্থাৎ পূর্ব সীমান্তকে নিয়ে করে। কেউ জানতে পারেন আবার কেউ না জানতে পারেন যে, এককালের সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব বলয়ের অধীন ওয়ারস' প্যাক্ট-এর সদস্য পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরি বর্তমানে ন্যাটো বলয়ভুক্ত। উপসংহারে আমি বলব, বাংলাদেশের সুশীল সমাজ তথা নাগরিকগণের মধ্যে ভারত নিয়ে যে বিতর্ক তার নেতিবাচক প্রভাব সেনাবাহিনীর উপর যত কম পড়ে ততই মঙ্গল। অনেকেই বলতে পারেন যে, ভারতের কথা যখন বলা হলো তখন মুক্তিযুদ্ধকালে আমাদের সব বড় শত্রু ও আমাদের রাজনীতি চর্চায় অন্যতম বিদেশপক্ষ তথা পাকিস্তানের কথা কেন বলা হচ্ছে না। সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ভৌগোলিক বা সরেজমিনে আগ্রাসন সম্ভব না।

১১.

এখন পেশাদারিত্বের আরেকটি উপাত্তের বিষয়ে আলোচনা করি। একজন অফিসারের পেশাদারিত্বের অন্যতম উপাত্ত হলো সার্বিক সততা। বিশেষত নৈতিক সততা। ১০ মে ১৯৯৩ থেকে ২২ ডিসেম্বর ১৯৯৫ পর্যন্ত সময়কালে আমি চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমির কমান্ড্যান্ট ছিলাম। আমার পূর্বে কমান্ড্যান্ট ছিলেন মেজর জেনারেল সহুল আজাল (বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত এবং ব্র্যাকে চাকরিরত) এবং তার পূর্বে ছিলেন মেজর জেনারেল আমসা আমীন (বর্তমানে জর্ডানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত)। ১৯৮৯ সালের গোড়াতে ইউনাইটেড স্টেটসের মিলিটারি একাডেমি ওয়েস্টপয়েন্ট থেকে একটি ক্ষুদ্র বিশেষজ্ঞ দল ভাটিয়ারিতে কিছুদিন কাজ করে। এই সময় ওয়েস্ট পয়েন্টে প্রচলিত একটি প্রশিক্ষণ ও চরিত্র গঠনমূলক ধারণা ভাটিয়ারিতে চালু করা হয়। ১৮৬০ সাল থেকে ওয়েস্ট পয়েন্টে ক্যাডেটদের জন্য একটি সম্মান বিধি বা Honour Code চালু আছে। মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় ব্যক্তিবর্গকে ক্যাডেট বা জেন্টেলম্যান ক্যাডেট বলা হয়। ওয়েস্ট পয়েন্টে প্রচলিত ও অনুসৃত ধারণাটি ছিল এরকম 'A cadet shall not lie, cheat or steal : nor tolerate those who do so'। এটার অনুকরণে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত জেন্টেলম্যান ক্যাডেটগণের জন্য ১৯৯০ সালে প্রচলন করা হলো অনার-কোড/ Honour code : 'A gentleman cadet shall not lie, cheat or steal : nor tolerate those who do so'–মানে দাঁড়াচ্ছে, 'একজন জেন্টেলম্যান ক্যাডেট নিজে মিথ্যা কথা বলবে না,



www.nagorikpathagar.org

প্রতারণা করবে না বা চুরি করবে না এবং যারা এসব করে তাদেরকেও সহ্য করবে না বা প্রশ্রয় দেবে না।' আমাদের মিলিটারি একাডেমিতে যারা প্রশিক্ষণের জন্য প্রবেশ করে তারা যে সামাজিক-নৈতিকতার প্রেক্ষাপট থেকে আসে সেটা কোনোক্রমেই প্রশংসনীয় নয়। তবু কুমার যেমন কাদামাটিকে আকার দিয়ে বিভিন্ন পাত্র বানায় তেমনি মিলিটারি একাডেমিতেও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রায় নতুন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস নেওয়া হয়। ওখানে চরিত্র গঠনের গুরুত্ব সর্বাধিক এবং অসততা ও অনৈতিকতার সঙ্গে কোনো প্রকারের আপসের অবকাশ নেই, বস্তুত বাইরের জগতের দশজনের কাছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বা তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণের জন্যও একজন জেন্টেলম্যান ক্যাডেটকে প্রত্যাহার বা বহিষ্কার করতে হয়। অনার-কোড বা ওইরকম একটি ধারণা চরিত্র গঠনে বলিষ্ঠ সহায়ক ভূমিকা রাখে। মিলিটারি একাডেমির এরকম দুবছর প্রশিক্ষণ শেষে এ রকম একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো মন্ত্রে দীক্ষিত ও উজ্জীবিত হওয়ার পর নতুন কমিশনপ্রাপ্ত একজন অফিসার যখন বাস্তব কর্মজীবনে প্রবেশ করে তখন তার পক্ষে ওই মন্ত্র হুবহু অনুসরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের আকাশে-বাতাসে তথা সমাজের বেশিরভাগ স্তরে মিথ্যা, প্রতারণা, অসত্য ও চুরির যে রকম ছড়াছড়ি সে রকম একটি পরিমণ্ডলে একজন নতুন অফিসার সাংঘাতিক রকমের মানসিক তথা নৈতিক দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। এ প্রসঙ্গটা আরো পাঁচ-ছয় লাইন লিখে ব্যাখ্যা করা যেত, কিন্তু করছি না। বিএমএ ভাটিয়ারিতে অনার-কোড চালু হওয়ার পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন সময়ে যে 'Feedback' বা মূল্যায়ন পাওয়া যায়, তার ওপর ভিত্তি করে ১৯৯৪ সালের শেষের দিকে নির্দেশিত হয়ে ভাটিয়ারিতে Honour code সংক্ষিপ্ত করা হয়। সংক্ষিপ্ত Honour code হলো এ রকম : 'A gentleman cadet shall not lie, cheat or steal' অর্থাৎ একজন জেন্টেলম্যান ক্যাডেট মিথ্যা কথা বলবে না, প্রতারণা করবে না অথবা চুরি করবে না।' যে অংশটা বাদ দেওয়া হলো সেটা হচ্ছে- 'Not tolerate those who do so' অর্থাৎ যারা মিথ্যা কথা বলে, প্রতারণা করে বা চুরি করে তাদের সহ্য করব না বা প্রশ্রয় দেব না, এ কথাটা বাদ গেল। সহ্য করব না প্রশ্রয় দিব না বাদ গেলেও তার মানে এই না যে, সহ্য করতেই হবে বা প্রশ্রয় দিতেই হবে। বরঞ্চ তার মানে হলো এই যে, অফিসারের নিজের বিবেকের ওপর এবং পরিস্থিতির ওপর এটা ছেড়ে দেওয়া হলো।

১২.

উপরের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে নৈতিকতা ও সততার ক্ষেত্রে আমরা দ্বন্দ্বে আছি। সেনাবাহিনীর মতো একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে জ্যেষ্ঠ বা উপরস্থকে মান্য করাটাই স্বাভাবিকভাবে কাম্য সেখানে অনৈতিকতার প্রতিবাদ কি নিয়মে করা যায় সেটা একটা বিরাট প্রশ্ন। কোন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বা অফিসার যদি কোনো অনৈতিক কাজ করেন বা কোনো আত্মসাৎমূলক কর্মকাণ্ডে জড়ান, অবৈধ



www.nagorikpathagar.org

উপার্জনে লিপ্ত হন এবং সেটা যদি কোনো অধীনের নজরে পড়ে বা কোনো অধীনকে এসব কর্মকাণ্ডের সহায়তা করতে নির্দেশ দেয়া হয় তাহলে ওই অধীনের পক্ষে প্রতিবাদ করার ভাষা ও পন্থা খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন এবং প্রতিবাদ করাটা সাংঘাতিক ঝুঁকিপূর্ণ। এই কারণে জ্যেষ্ঠগণের বেশিরভাগ কৃত বা সম্ভাব্য অন্যায় বা অনৈতিক কাজ প্রতিবাদবিহীন থাকে। সেনাবাহিনীর অতি জ্যেষ্ঠ অফিসারগণ সেনাবাহিনীর অধীনদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। যে কোনো একজন সৎ, প্রতিবাদমুখর, মেধাবী কনিষ্ঠ অফিসার যদি কোনোভাবে তুলনামূলকভাবে অন্যায়কামী বা অদক্ষ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার রোষানলে পড়ে তাহলে ওই কনিষ্ঠের কপালে বিপদ, বিড়ম্বনা ও দুঃখ ছাড়া অন্য কিছু থাকার সম্ভাবনা কম। এই কারণে সেনাবাহিনীর অফিসার মণ্ডলে একটা আপসকামী পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্বের ওপর তথা অফিসারগণের পেশাদারিত্বের ওপর এই আপসকামী মনোভাব ও পরিবেশের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য। জ্যেষ্ঠকে যে কোনো নিয়মে সন্তুষ্ট করার প্রবণতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। গত ৩০ বছরে এই বিষয়টিকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিহার করা সম্ভব হয়নি। ঝগড়াঝাটি সৃষ্টি হয় এমন পরিবেশ সৃষ্টি না করে, আনুগত্য বা মান্যতায় নাশকতার জন্ম না দিয়ে কি নিয়ম বা পন্থা চালু করা যায় যাতে করে জ্যেষ্ঠগণের কর্মকাণ্ড আরো স্বচ্ছ হয় তথা জবাবদিহিতামূলক হয় সেটা চিন্তা করা এখনকার সময়ের দাবি।

১৩.

বাংলাদেশ ভূখণ্ডগতভাবে ক্ষুদ্র। আমাদের থেকেও ছোট দেশ আছে। স্থায়ী সেনাবাহিনীর সংখ্যানুপাতে আমাদের থেকেও ছোট কিন্তু দক্ষতায় উন্নত সেনাবাহিনী অফিসারগণের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুদ্রায়তন কিছুটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে বলে মনে হয়। চাকরি করতে করতে একে অপরের বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে যায় বা একে অপরের ভাল-মন্দ গোপন কথা অনেক জেনে যায়। যার প্রভাব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পড়ে। এ ক্ষেত্রেও উন্নতির প্রচুর অবকাশ আছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসারগণের সামাজিক উৎপত্তির প্রেক্ষাপট শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ মধ্যবিত্ত এবং শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ শহরকেন্দ্রিক। স্বাধীনতার পর থেকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে যে কোনো নিয়মে ধনী হওয়ার যে কঠিন অসম প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে সেনাবাহিনীর অফিসারগণের জন্যও সাধারণভাবে তার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা কঠিন হয়েছে। ১৯৪৭-পূর্ব ব্রিটিশ ভারতে সেনানিবাসগুলো শহর বা লোকালয় থেকে দূরে দূরে অবস্থিত হতো। ১৯৪৭-পরবর্তী পাকিস্তানেও এই নীতি বহাল থাকে। লোকালয় থেকে বা শহর-নগর থেকে সেনানিবাস দূরে স্থাপিত হওয়ায় সেনা সদস্য এবং শহর বা নগরবাসীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বা Interactive কম হতো। কিন্তু নগর বা শহরসমূহ আয়তনে বেড়ে যাওয়ার কারণে সেনানিবাসসমূহ লোকালয় জনপদের অতি নিকটবর্তী হয়ে গেছে। ঢাকা সেনানিবাস তো শহরের পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে। ফলে সেনানিবাস



www.nagorikpathagar.org

সমূহের স্বাতন্ত্র্য এবং সেনানিবাসসমূহে বসবাসরত সেনা সদস্যদের জীবনযাত্রার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা মুশকিল হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত ব্যক্তি এই পর্যায়ের পরিমণ্ডল সেনা সদস্যদের জন্য অতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে এবং সেনাবাহিনীর ভেতরেও সেনা সদস্যরা একে অপরের বেশি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে গেছে। সার্বিকভাবে বেশি ঘনিষ্ঠতার প্রভাব ভালোর থেকে মন্দ হয়। ইংরেজিতে বলে 'ফেমিলিয়ারিটি ব্রিডস কনটেমপ্ট।' যেহেতু সেনা সদস্যদের চোখের সামনে বহু লোক, বহু অবৈধ-অন্যায় কাজ করে দ্রুত বড়লোক হয়ে যাচ্ছে এবং বৈষয়িক মানদণ্ডে সমাজের অন্যান্য পেশার লোকজনের তুলনায় সেনা সদস্য বা সেনা অফিসারগণ খাটো হয়ে পড়ছে, সেহেতু সেনা সদস্যদের মনেও কোনো অসতর্ক মুহূর্তে জাগতিক বা বৈষয়িক উন্নতির আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। প্রবল তথা অদম্য হয়ে ওঠাটা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষত সেনা সদস্য যদি এমন কোনো প্রকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে জড়িত থাকে যে সিদ্ধান্তের ফলে লোকজন বৈধ বা অবৈধ উপার্জন করতে পারে। ইতিহাসের এ ক্রান্তিলগ্নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যগণকে এ-রূপ জাগতিক বা বৈষয়িক উন্নতির বিনিময়ে নৈতিক ও পেশাগত অবক্ষয় থেকে রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এটার জন্য তাৎক্ষণিক কোনো প্রেসক্রিপশন এখানে ছাপিয়ে দেওয়ার মতো নেই।

১৪.

এরূপ নৈতিক ও পেশাগত মান রক্ষা করার প্রক্রিয়ায় সেনা সদস্যগণের নিজেদের যেমন ভূমিকা আছে তেমনি বৃহত্তর সমাজেরও ভূমিকা আছে। সেনা সদস্যদের মধ্যে জ্যেষ্ঠগণের ভূমিকা কনিষ্ঠদের থেকে বেশি। অফিসারগণকে দায়িত্বশীল উচ্চপদে প্রমোশন দেয়া বা নিযুক্ত করার সময় এসব বিষয় খেয়াল রাখা একান্ত জরুরি। বস্তুত আমরা একটা কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত। আমি একটি কঠিন সংগ্রামের কথা বলছি, যেখানে সামাজিক জোয়ার তথা নোনা পানির জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে অসততা ও অবৈধ উপার্জনের অনুকূলে, সেখানে সমাজের একটি অংশকে এই নোনা পানির দূষণ থেকে নিরাপদ রাখা কঠিন বৈকি। কিন্তু একান্ত প্রয়োজন। গত ২৯ বছরে যা হওয়ার হয়েছে, ভবিষ্যতের দিকে আমাদের নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আগামী শতাব্দীতে নতুন আঙ্গিকে নতুন অঙ্গীকার নিয়ে সেনা নেতৃত্বকে সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে হবে। সেনাবাহিনীতে নেতৃত্ব বাছাইয়ের সময় এই দিকটা অবশ্যই খেয়াল রাখা প্রয়োজন। আমরা যারা অবসর জীবনযাপন করি তারা সব সময়ই চাই যে, সেনাবাহিনী আমাদের আমলে যেমন ছিল তার থেকে উন্নত হোক। আমাদের আমলে যা কিছু হতো তাই যে ভালো বা উত্তম এমন বলাটা কখনো উচিত নয়। উন্নতি একটা প্রক্রিয়া। এই উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর অনেক কিছুই আওতাভুক্ত হতে পারে। একটি উদাহরণ দেই। অনেক প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত সেনাবাহিনীতে হয়েছে, কিন্তু পরিকল্পনার অভাবে জ্যেষ্ঠ র‍্যাঙ্কে পদোন্নতির জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ চিহ্নিত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ১৯৭৭



www.nagorikpathagar.org

সালে স্টাফ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক বা প্রস্তুতির তিন বছর বাদ দিয়ে ১৯৮০ সাল ধরি। ১৯৮০ সালেও যদি কোনো সিদ্ধান্ত হতো যে, ১৯৯০ সালের পর থেকে স্টাফ কলেজ প্রশিক্ষণ ছাড়া কাউকে ব্রিগেডিয়ার বানানো হবে না, তাহলে ব্রিগেডিয়ার হতে মনে মনে আগ্রহী সকল অফিসার ১০ বছর সময় পেত। কিন্তু ১৯৯৭ পর্যন্ত এ রকম কোনো সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা যায়নি বা শোনা যায়নি। ফলে খাতির, সহানুভূতি, দয়া, বিশেষ প্রয়োজন ইত্যাদির কারণে বা অজুহাতে অনুপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে উচ্চপদে প্রমোশন দেওয়ার রাস্তা খোলা থেকেই যায়। চাকরিকালীন সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, সেনাবাহিনীর মাঝারি বা কনিষ্ঠ পর্যায়ের অফিসারদের মনের আগ্রহ এই যে, উচ্চপদে প্রমোশনের নীতিমালা স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ হতে হবে এবং জ্যেষ্ঠ পর্যায়ের অফিসারগণের মনের আগ্রহ ছিল এই যে, জ্যেষ্ঠ পর্যায়ে নির্বাচিত হওয়ার জন্যও স্বচ্ছতা স্থাপিত হতে হবে।

১৫.

জ্যেষ্ঠ নেতৃত্বের প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভাগ্য ভালো এবং মন্দের মিশ্রণ। ১৯৭২ সালের এপ্রিল থেকে ৪ বছরের জন্য সেনাপ্রধান মনোনীত হয়ে ছয় মাসের বেশি বাকি থাকতেই ১৯৭৫-এর পরপর জেনারেল শফিউল্লাহকে বদলিয়ে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে নতুন সেনাপ্রধান করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে কোনোদিনই অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারেননি। কারণ, তিনি যুগপৎ উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকও ছিলেন। সেই ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত উপসেনাপ্রধান হিসেবে এবং ১৯৭৮ থেকে পরবর্তী চার-পাঁচ বছর পর্যন্ত সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জেনারেল এরশাদ এই সুবাদে উনার প্রভাব দীর্ঘ। অতঃপর ছিলেন জেনারেল আতিক। তারপরে চার বছর জেনারেল নূরউদ্দীন। তারপরে ১ বছর ৮ মাস জেনারেল নাসিম। জেনারেল নাসিমের পরে এক স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে এক্সটেনশনে বা বর্ধিত সময়ে চাকরিরত মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমানই সেনাপ্রধান হয়ে গেলেন। ব্যক্তি পর্যায়ে আমি মন্তব্য করব না। কিন্তু নীতিগত পর্যায়ে আমার মন্তব্য হলো যে, জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত কাজটা পরিহার্য ছিল। এ রূপ সিদ্ধান্ত পরিহার না করায় সেটা অনুকরণীয় হয়ে যায়। ভবিষ্যতে আবারও যে অনুকরণ হবে না তার গ্যারান্টি কোথাও নেই। অনুকরণেও আপত্তি নেই যদি সেটা ওইরকম হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ অফিসারগণের মনোবল ও পেশাগত স্বার্থে এটা পরিহার্য। দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে বা সেনাবাহিনীতে সেনাপ্রধানের পরিবর্তনের কারণে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে পছন্দ-অপছন্দের জিগির তুলে, এই পন্থী বা ওই পন্থী ইত্যাদি জিগির তুলে বা আনুগত্যের জিগির তুলে অফিসারগণকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ করা সর্বসময়ের জন্য অবশ্যই পরিহার্য।



www.nagorikpathagar.org

১৬.

নতুন শতাব্দীর শুরুতে বিদ্যমান ভূ-রাজনৈতিক এবং ভূ-কৌশলগত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দায়িত্ব দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। দেশের তথা জাতির নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তা নীতিমালা প্রয়োজন। অন্ততপক্ষে প্রতিরক্ষা নীতিমালা প্রয়োজন। এটা পরিতাপের বিষয় যে, আজ পর্যন্ত কোনোদিন এ-রূপ নীতিমালা উচ্চারিত বা প্রকাশিত হয়নি। এই নীতিমালার প্রেক্ষাপটে সেনাবাহিনীর পেশাদারিত্ব বিশেষত অফিসারগণের পেশাদারিত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে অব্যাহত সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। এতে অবসরপ্রাপ্তদের সমাজ এবং সুশীল সমাজের অবদানের অবকাশ আছে। ওই সৎ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই বলার মতো অনেকগুলো কথার মধ্যে কয়েকটা কথা মাত্র বললাম। সময় এবং সুযোগে ভবিষ্যতে আরো বলা যাবে।

দৈনিক প্রথম আলো ২১/১১/১৯৯৯ইং, ২২/১১/১৯৯৯ইং, ২৩/১১/১৯৯৯ইং এবং ২৫/১১/১৯৯৯ইং



www.nagorikpathagar.org

# রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস ও নাসিমের মতভেদ একদিনে হয়নি

যুগান্তর : ১৯৯৬ সালের ২০ শে মে'র ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশে যে একটা তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছিল চার বছর পরেও সেটা মানুষের মনে স্পষ্ট বা স্বচ্ছ নয়। আপনি কি এ ব্যাপারে একটু নতুন করে আলোকপাত করবেন? অনেকে হয়তো ভুলে গেছেন।

মে. জে. ইবরাহিম : হ্যাঁ, অনেকে বিস্মৃত হয়েছেন। আবার অনেকের মন থেকে মুছে যায়নি এবং এটাই স্বাভাবিক। আমাদের মন থেকে যায়নি এবং আমার মনে হয় যাবেও না। এর কারণ হচ্ছে, কিছু কিছু ঘটনা মানুষের জীবনে সবসময়ই মনে থাকে। যেমন বঙ্গবন্ধু হত্যার ঘটনা, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যার ঘটনা কোনদিনই মানুষের মন থেকে দূর হয়ে যাবে না। সেভাবে আমি একজন সৈনিক হিসাবে, দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলা আমার সৈনিক জীবনকে যে হত্যা করা হল সেটা আমার জীবন থেকে মুছে যাবে না। আমাকে যারা চেনে তাদের জীবন থেকেও যাবে না। সেনাবাহিনীতে জ্যেষ্ঠ অফিসাররা প্রায় পুরো সেনাবাহিনীতে পরিচিত থাকে। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম। সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পদে চাকরি করতে গিয়ে বহু লোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। ১৯৯৩ সালের ১০ মে থেকে ১৯৯৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর দুবছর সাত মাসে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি থেকে যত নবীন অফিসার বেরিয়েছে আমি তাদের কাছে কমান্ডেন্ট হিসাবে পরিচিত। মুক্তিযুদ্ধকালীন হাজার হাজার গেরিলার কাছে আমি পরিচিত। সেজন্য তাদের সকলের মন থেকে এই ঘটনাটি মুছে না যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এটাকে দুটো ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমটা, একজন সেনাপ্রধান জনপ্রতিনিধি তথা রাষ্ট্রপ্রধানের হুকুম অমান্য করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক পন্থায় তা নিষ্পত্তি করেছেন। ঠিক নিষ্পত্তি করাও বলব না। দ্বিতীয়ত বিষয়টিকে অন্যভাবেও দেখা যায়, যেমন, একজন রাষ্ট্রপতি অবৈধভাবে একজন সেনাপ্রধানের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকাণ্ডে হস্তক্ষেপ করেছেন অর্থাৎ সেনাবাহিনী পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেছেন, এবং ছলে-বলে-কৌশলে তিনি সেই হস্তক্ষেপটিকে বৈধতা দিয়েছেন।

যুগান্তর : সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সর্বাধিনায়ক। তাহলে তার দিক থেকে সেনাপ্রধানের কোন কার্যক্রমকে সুপারসিড করাটাকে কি অবৈধ বলা যুক্তিসঙ্গত?

মে. জে. ইবরাহিম : আমি আবারও বলব যে, আমি এ বিষয়টি নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে দুইদিকের দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করছি। আমি নিজের থেকে এটা বৈধও বলছি না, অবৈধও বলছি না। তবে এই প্রশ্নটার একটি উত্তর আছে। আমাদের সংবিধানে কি আছে সেটা আপনাকে একটু ব্যাখ্যা করে বলি। আমাদের সংবিধানে



www.nagorikpathagar.org

১৯৯৬ সালের মার্চ মাসের ২৫ তারিখের আগে কি ছিল এবং ২৫ তারিখের পরে কি ছিল? ২৫ তারিখের পূর্বে যা ছিল সেটা এই মুহূর্তেও প্রযোজ্য। সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবেই সর্বাধিনায়ক। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য যে সংবিধান বা অন্য কোন আইনে এটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি, সর্বাধিনায়কের কি কি দায়িত্ব বা কি কর্তব্য, আর সেটা কিভাবে তিনি পালন করবেন। এই সর্বাধিনায়ক বা সুপ্রিম কমান্ডার শব্দটিও আমাদের দেশের বাংলাভাষায় উৎপত্তি নয়, ধারণাটির উৎপত্তিও আমাদের এখানে নয়। যেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে সে দেশে এর সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে। আমরা শুধু কনসেপ্ট বা ধারণাটা নিয়েছি। বাকিটা নেইনি। এটাকে আমি বলব আইন প্রণয়নের দিক থেকে একটি জাতীয় ব্যর্থতা।

**যুগান্তর : তবে সংবিধান অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সর্বাধিনায়কের চূড়ান্ত চাবিকাঠিটা তো প্রধানমন্ত্রীর কাছে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বাইরে তো তিনি আর কিছুই করতে পারছেন না। এতে আপনার মতামত কি?**

মে. জে. ইবরাহিম : হ্যাঁ, প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার বাইরে রাষ্ট্রপতি কিছুই করতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি যখন দেশের নির্বাহী প্রধান ছিলেন তখন প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার কোন অবকাশ ছিল না। তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, রাষ্ট্রপতি সর্বাধিনায়ক হিসাবে তার দায়িত্ব পালনকালে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন। এখানেই আপনার সেই প্রশ্নটির সঙ্গে আমার উত্তরটি সংশ্লিষ্ট হয় যে, ১৯৯৬ সলের মার্চ মাসের ২৫ তারিখের পর ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমল যখন শুরু হল তখন রাষ্ট্রপতির স্বাভাবিক কর্তব্য পরিচালনায় কিছু ব্যতিক্রম ঘটল। ত্রয়োদশ সংশোধনীতে প্রধানমন্ত্রী বলে কিছু থাকল না। প্রধান উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রীর বিকল্প হলেন ঠিকই। কিন্তু তিনি আর আগের প্রধানমন্ত্রীর মতো ক্ষমতাধর থাকলেন না। এখানে এ নিয়ে আমার মতো অনেকের মনেই প্রশ্ন আছে। অনেকে বলছেন, ত্রয়োদশ সংশোধনী মোতাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতির হাতে থাকছে। কিন্তু আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি যে, ত্রয়োদশ সংশোধনী পই পই করে খুঁজেও আমি একথা স্পষ্টাক্ষরে কোথাও পাইনি। লেখা আছে, যে, রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থাকবেন। আমি গত চার বছর যাবৎ পত্রপত্রিকায় লিখে আসছি যে, যদি দেশের সংসদ চায় যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে তাহলে সংসদকে সেটা স্পষ্ট করতে হবে জনগণের কাছে। আমার মনে হয় সংবিধানে লেখা আছে এক রকম (বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহের সর্বাধিনায়কতা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যস্ত হইবে এবং আইনের দ্বারা তাহার প্রয়োগ নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং যে মেয়াদে ৫৮ খ অনুচ্ছেদের অধীনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার থাকিবে সেই মেয়াদে উক্ত আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পরিচালিত হইবে) কাজ হচ্ছে আরেক রকম। অতএব এখানে সন্দেহ, অবিশ্বাস এসে যাচ্ছে।



www.nagorikpathagar.org

এখানে তিনটা পয়েন্ট আছে। এক নম্বর পয়েন্ট হল, রাষ্ট্রপতিই সর্বাধিনায়ক হবেন (অন্য কেউ নয়) দুই নম্বর পয়েন্ট হল, সর্বাধিনায়কতার প্রয়োগ বা ইংরেজিতে এক্সারসাইজ অফ কমান্ড আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে (কিন্তু ঐরূপ নিয়ন্ত্রণকারী আইন বাংলাদেশে নাই)। তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে, কেয়ারটেকার সরকারের সময় রাষ্ট্রপতি নিজেই ঐ আইন অর্থাৎ যেই আইন তার সর্বাধিনায়ক সংক্রান্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার কথা তা প্রয়োগ করবেন। এটি একটি হাস্যাস্পদ বন্দোবস্ত বলে মনে হলেও এতে হাসির থেকেও বেশি অনিষ্টের বীজ নিহিত।

যুগান্তর : আপনার কি মনে হয় ২০ শে মে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস যে ঘটনা ঘটিয়েছেন সেটা কি আজও অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ রয়ে গেছে।

মে. জে. ইবরাহিম : অবশ্যই। ২০ শে মে ১৯৯৬-তে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং তৎকালীন সেনাপ্রধান লে. জেনারেল নাসিমের মধ্যে যে মতভেদের প্রকাশ ঘটেছিল তা কিন্তু একদিনে হয়নি। ২০ মে'র প্রেক্ষাপট দীর্ঘকালের। এটা একদিন বা এক সপ্তাহে হয়নি। কিন্তু সারফেইসে এসেছে আইসবার্গের মতো ২০ মে'র ঘটনাটা বা জেনারেল হেলাল মোর্শেদ এবং মিরনের অবসর দেয়ার ঘটনাটা। এটা 'টপ অফ দা আইসবার্গ'। আর এ প্রসঙ্গে কিন্তু আবারও সংবিধানে বিদ্যমান অস্পষ্টতার কথাই বলব। দুর্ভাগ্য, আজ ৪ বছর পরও এটাকে কেউ গা করছে না। একজন নাগরিক হিসাবে সেনাবাহিনীতে চাকরি করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে চাই যে, সন্দেহের অবকাশ যেখানে থাকে সেখানেই সমস্যা দেখা দেয়।

যুগান্তর : তাহলে আপনার মতে এটা কি হওয়া উচিত?

মে. জে. ইবরাহিম : সংসদ যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই হবে। তাতে স্পষ্ট করে বলতে হবে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকবেন কিন্তু কারও নিকট জবাবদিহি করবেন না। বর্তমানে যে বিধান আছে তাতে রাষ্ট্রপতি বাদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সবাই শপথ নিচ্ছেন। তিনি একাই প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চালাচ্ছেন। আর বাকি ১০ জন উপদেষ্টা সরকারের বাকি সব মন্ত্রণালয় চালাচ্ছে। তাহলে আমি যদি বলি বাংলাদেশ সরকার এতে দ্বিখণ্ডিত হয় তাহলে কি বেশি বলা হবে? আমি মনে করি না যে, বেশি বলা হবে। সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী এক বা একাধিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকতে পারেন। কিন্তু তাকে সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। তিনি সংসদে মন্ত্রী হিসাবে জবাব দেন। সুতরাং বর্তমানে যেভাবে রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত রয়েছে তা একটা সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় তা আইনজ্ঞরা বলতে পারবেন। তবে আমি বলতে চাই যে, এক্ষেত্রে সংবিধানে অস্বচ্ছতা রাখা হয়েছে এবং এটা উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে করা হয়েছে বলে মনে হয়। এই যে সমস্যাটা আমি বললাম, এটা অনেকেই অনুভব করেন। লেখালেখিও প্রচুর হয়েছে। যে কোন কারণেই হোক এটা আমরা আইন প্রণেতাদের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছাতে পারছি না। কেউ কেউ মনে করতে পারেন এটা বুঝি ব্যক্তিগত



www.nagorikpathagar.org

সমস্যা, আসলে তা নয়। আমার মতো কত লোকই তো চাকরি থেকে চলে গেছে। ভবিষ্যতেও যাবে। তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু যেটা রাষ্ট্রীয় সমস্যা, আইনগত সমস্যা তার স্থায়ী সমাধান করা উচিত। তত্ত্বাবধায়ক করকারের আমল ছাড়া সর্বাধিনায়ককে নিয়ে কোন সমস্যা নেই কারণ সরকার প্রধান যা বলবেন উনি তাই করবেন।

যুগান্তর : তাহলে আপনি বলছেন যে, পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের আগেই এ সংক্রান্ত জটিলতার অবসান হওয়া উচিত।

মে. জে. ইবরাহিম : ঠিক তাই। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতির সর্বাধিনায়ক থাকার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকার বিষয়টিও সবাই যদি মেনে নেয় তাহলে আর কোন সমস্যা থাকবে না। আমি শুধু বিনীতভাবে একজন নাগরিক হিসেবে বলছি যে একটা জবাবদিহিতার বন্দোবস্ত আপনাদের করতে হবে। আর যদি সকলে বলেন যে, ওই সময় রাষ্ট্রপতিকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হবে না, তাহলে তাও মেনে নিতে হবে।

যুগান্তর : ১৯৬৮ সালের ২০মে'র ঘটনাকে কেন্দ্র করে আর্মি অ্যাক্টের আওতায় তদন্ত কমিটি হয়েছে। বিষয়টি উচ্চ আদালতেও গেছে। কিন্তু তারপরও কি মনে হয় যে, স্বচ্ছতার জন্য নতুন করে এ বিষয়ে কোন তদন্তের প্রয়োজন আছে।

মে. জে. ইবরাহিম : অবশ্যই আছে, এবং আমি তা জোর গলায় দাবি করি। আমি আমাদের মাননীয় আদালতের ব্যাখ্যা মানলেও, তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করি। সংবিধানে সামরিক বাহিনী ও উচ্চ আদালত সম্বন্ধে যা বলা আছে তা স্পষ্ট নয় এবং সেখানে দুইরকমের ব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ রয়েছে। আদালত একরকমের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সমস্যা হচ্ছে যে, দ্বিতীয় ব্যাখ্যা দেয়ার কোন জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। যদি পাওয়া যেত তাহলে ঘটনাটি খুলে বলা যেত।

যুগান্তর : ২০ মে'র ঘটনায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের অবস্থান থেকে আপনার অবস্থান কি কোনভাবে ভিন্নতর? নাকি সবার অবস্থান অভিন্ন মনে করছেন?

মে. জে. ইবরাহিম : জেনারেল নাসিম উচ্চ আদালতে গিয়েছেন, কিন্তু তা তার ব্যক্তিগত আবেদন নিয়ে। সেনাবাহিনীতে চাকরির সময় কোন দলীয় কার্যকলাপ গ্রহণযোগ্য নয়। দলগতভাবে নালিশ, প্রতিবাদ, এমনকি অবসর জীবনেও দলগতভাবে কিছু করার অবকাশ নেই। জেনারেল নাসিম গিয়েছিলেন তার একটি নালিশ নিয়ে হাইকোর্টে। রায়ে তিনি সন্তুষ্ট না হয়ে গিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্ট থেকেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে। এর সঙ্গে আমরা অন্য যারা চাকরি হারিয়েছি তাদের কোনো প্রকারের সংশ্লিষ্টতা নেই।

যুগান্তর : সবার বিষয়টা কি আলাদা আলাদা?



www.nagorikpathagar.org

মে. জে. ইবরাহিম : প্রত্যেকের বিষয় আলাদা। কিন্তু মূল একটা ব্যাপার আছে। সেটা হল সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ তারা তাদের কোন ক্ষোভ বা বেদনা বা প্রতিবাদ নিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় আদালতে যেতে পারবে কি পারবে না? এই হচ্ছে প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন। আদালত বলছেন, পারবে না। আদালতের ব্যাখ্যা মানতে বাধ্য বিধায় মানছি, কিন্তু আমি বলছি, পারবে। যদি আমি তাদের কাছে যেতে না পারি তাহলে মাননীয় আদালতকে বলতে হবে, আমি কার কাছে যাব। আর যদি আপনি আমাকে আপনার কাছে যেতে না দেন তাহলে আপনারা আমাকে বাধ্য করবেন আমার ক্ষোভটাকে বিপথে চালিত করতে।

যুগান্তর : আমাদের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত আইন-কানুন নিয়ে কিছু বলুন। এগুলো কি যুগোপযোগী? এর কি সংশোধন দরকার?

মে. জে. ইবরাহিম : অবশ্যই সংশোধন দরকার এবং আমি মনে করি সংবিধানের আওতায় তা করার সুযোগও রয়েছে। দরকার শুধু যথাযথ ব্যাখ্যার। এক বাক্যে, চোখ বন্ধ করে, আর্মির ব্যাপারে কিছু কিন্তু করা যাবে না। গত ৩০টি বছর আমরা সেনাবাহিনীর কোন বিষয় আদালতে ঢুকতে দেইনি। আমি মনে করি এটা মোটেই ঠিক কাজ হয়নি।

যুগান্তর : এই অবস্থাটা কি প্রতিবেশী বা অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করবেন?

মে. জে. ইবরাহিম : অবশ্যই। ভারতে ওরা তো এ ব্যাপারটা নিয়ে আদালতে যাচ্ছে। আমেরিকায়ও যাচ্ছে। ওয়েস্টার্ন ইউরোপ এবং অস্ট্রেলিয়া হরদম আদালতে যাচ্ছে। তাহলে কেন আমরা আদালতে যেতে পারব না?

যুগান্তর : সেনাবাহিনী রুলস এণ্ড রেগুলেশন পরিবর্তনে কখনও কি কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে? আপনি কি মনে করেন এ লক্ষ্যে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করা দরকার।

মে. জে. ইবরাহিম : ইতিমধ্যে বহু বিলম্ব হয়ে গেছে। না, এ ব্যাপারে অতীতে কিছুই হয়নি। ১৯১১ সালের ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যাক্টে রঙচঙ মাখিয়ে ১৯৫২ সালে তৈরি হয়েছিল 'পাকিস্তান আর্মি অ্যাক্ট'। সেই ১৯৫২ সালের পাকিস্তান আর্মি অ্যাক্ট সংশোধন করে পাকিস্তানের জায়গায় বাংলাদেশ আর ইসলামাবাদের জায়গায় ঢাকা বসিয়ে, কমাণ্ডার অব চিফ-এর জায়গায় চিফ অব আর্মি স্টাফ বসিয়ে অর্থাৎ ন্যূনতম কয়েকটি সংশোধনীর পর বাংলাদেশের আর্মি অ্যাক্ট তৈরি করে এখন পর্যন্ত চলছে।

যুগান্তর : তাহলে কি একথা দুঃখের সঙ্গেই বলতে হবে যে, দখলদার সেনাবাহিনীকে হটিয়ে বাংলাদেশ তার সেনাবাহিনীকে প্রতিষ্ঠা করলেও আইনের দিক থেকে ওদের আদলটা এখনও অনুসরণ করছে?

মে. জে. ইবরাহিম : ঐ লিগ্যাল ফ্রেমটা কিন্তু সম্পূর্ণ পরিবর্তনের কোনো প্রশ্নই উঠে না। কারণ আপনি স্বর্গ থেকে তো আর কোন আইন আনবেন না। যে আইন আছে সেগুলোকেই যুগোপযোগী করতে হবে। ১৯১৩ সালের কোম্পনি অ্যাক্ট বলে একটা আইন বাংলাদেশে ছিল। ১৯৯৪ সালে সেই কোম্পানি আইনে রূপান্তর আনা হয়েছে।



www.nagorikpathagar.org

যুগান্তর : পাকিস্তান কি সেই ৫২ সালের আইনের খোলনলচে বদল করেছে?

মে. জে. ইবরাহিম : পাকিস্তান সংশোধন করে ফেলেছে বহু আগে। পশ্চিম ইউরোপ, এমনকি ইংল্যাণ্ডও আর্মি অ্যাক্ট ১৯৯৭ সালে সংশোধন করেছে এবং নতুন করে ডিফেন্স অ্যাক্ট করেছে। এতে করে তিনটি বাহিনীই একসঙ্গে পরিচালিত হবে। এটা ইংল্যান্ড করেছে। আমাদেরকে মানবাধিকার, মানুষের লেখাপড়া, শিক্ষা, ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে আইনগুলোর যুপোপযোগী করতে হবে। তবে সেটা আমাদের দেশে করার চিন্তাও কেউ করে না। এটা ঝামেলা বা কষ্টের কাজ বলে কেউ এই উদ্যোগ নিতে চায় না।

যুগান্তর : সেনাবাহিনীতে কর্মরত থাকাকালে কি এসব ইস্যু নিয়ে আপনাদের আলোচনার সুযোগ ছিল?

মে. জে. ইবরাহিম : না। এই আইনগুলো সংশোধন করা হোক এই রকম দাবি উত্থাপনের কোন অবকাশ ছিল না। সেনাবাহিনী খুবই রক্ষণশীল একটি প্রতিষ্ঠান। সেনাবাহিনীতে কে কার গলাটা অন্যের জন্য বাড়িয়ে দেবে আপনিই বলুন। আমি সেনাবাহিনীর বর্তমান আইনটিকে খারাপ আইন কিন্তু বলছি না। আমি শুধু বলছি কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই আইনটিকে যুগোপযোগী করতে হবে এবং আমাদের সংবিধানকেও সে অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। আমাদের সংবিধানে সামরিক বাহিনী সম্পর্কিত কিছু কিছু ধারা অত্যন্ত পশ্চাৎপদ যা বর্তমান সময়ের উপযোগী মোটেই নয়। যদি সম্মানিত বিচারকগণ ইন্টারপ্রিটেশন দিয়ে তা পরিবর্তন করেন অর্থাৎ রায় দিয়ে এটাকে আইনে পরিণত করেন তাহলে এটা সম্ভব। অথবা সংসদের মাধ্যমে এই আইনটা করা যেতে পারে। আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে সেনাবাহিনী সংক্রান্ত আইনটি সঠিকভাবে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ প্রয়োগ করছেন কিনা তা দেখার মতো কোন কাঠামো বাংলাদেশে নেই।

একটা উদাহরণ দেই। ধরুন, মি. ক ও খ-এর ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর আইনটির সঠিক প্রয়োগ হল না। সে ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ক ও খ নালিশ জানাতে কার কাছে যাবে? সংবিধানে ১০২ ধারা অনুযায়ী, যে কোন সংক্ষুব্ধ নাগরিকের জন্য হাইকোর্টের দরজা খোলা। কিন্তু মি. ক ও খ এদেশের নাগরিক হয়েও কেবল সেনাবাহিনীতে চাকরি করার দায়ে তার জন্য সেই 'দরজা' বন্ধ। বলুন এটা কেমন যুক্তি? আমাদের সম্মানিত আদালতও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ।

জেনারেল নাসিমের ব্যাপারে দেয়া আদালতের সংক্ষিপ্ত রায় আমি পড়েছি। আমাদের আদালত বলছেন, আমাদের জন্য রিট করার সুযোগ নেই। প্রশ্ন হল, আমি যদি মাননীয় সেনাবাহিনী প্রধানের বিরুদ্ধে কোন নালিশ করতে চাই, বা তিনি যদি একটি ভুল করেন তাহলে সেটা আমি কার গোচরে আনব? একথাটা সংবিধানও বলছে না, সরকারও বলছে না, আদালতও বলছে না। অর্থাৎ তারা সবাই আমাদেরকে বাধ্য করছেন মনের ভিতর বিক্ষুব্ধ থাকতে, হয়ত অজান্তেই।



www.nagorikpathagar.org

যুগান্তর : ২০ মে'র ঘটনার ব্যাপারে যে ব্যবস্থাগুলো নেয়া হয়েছে, তার জন্য কেন আপনি আহত বোধ করছেন? কি হওয়া উচিত ছিল?

মে. জে. ইবরাহিম : আমরা প্রায় ১৪-১৫ জন চাকরি হারিয়েছি। তবে আমি আমার ব্যাপারটি নিয়েই বলছি। প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই নানা অভিযোগ আনা হয়েছে। আমার বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু সরকারিভাবে আজ পর্যন্ত অভিযোগটা কি তা আমি জানতে পারলাম না। চাকরিতে থাকা অবস্থায় আমার পদমর্যাদা এবং নিযুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাকে তা জানানো উচিত ছিল। তদন্ত চলাকালে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। আইন ভঙ্গ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর আইন আমাকে যতটুকু সুযোগ দেয় আমার সম্মান এবং চরিত্র রক্ষা করার জন্য সেটুকুও আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন অবকাশ পাইনি। অথচ দেশে সেনাবাহিনী আছে, সেনাপ্রধান আছেন, প্রধানমন্ত্রী আছেন, একজন রাষ্ট্রপতি এবং দেশে উচ্চ আদালতও আছে। তবু বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। একজন মেজর জেনারেলের ক্ষেত্রে যদি এত বড় একটা অবিচার আপনি করতে পারেন, তাহলে সৈনিকগণের ক্ষেত্রে কি হতে পারে এটা আমি সকলের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখছি। এই নালিশ আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দুবার দিয়েছি। কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। আজ আপনার মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে বলছি। আমি আমার চাকরি ফেরত চাই না। কিন্তু আমার সম্মানের ওপর হামলা করার অধিকার এই পৃথিবীতে আমি কাউকে দেইনি। আমার নামে কে কি নালিশ আনল, আইনের বই বলছে যে আমাকে এটা জানাতে হবে। অথচ সেটা আমাকে জানানো হল না। আমার বিরুদ্ধে কে কে সাক্ষ্য দিল, এটা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইনেই বলছে যে, সেটা আমার সামনে বলতে হবে। কিন্তু সেটাও আমাকে বলা হল না। অথচ আমাকে বলা হচ্ছে আমি নাকি রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছি। আমি নাকি একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করার কাজে সহযোগিতা করেছি।

যুগান্তর : কথিত রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ কি আপনার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে আনা হয়নি?

মে. জে. ইবরাহিম : আমাকে জানানোই হয়নি। তবে আমি শুনেছি। অনিয়মিতভাবে এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে কাগজপত্রও দেখেছি। কিন্তু আমি তো আনুষ্ঠানিকভাবে সেটা জানতে পারিনি।

যুগান্তর : যে আদেশ বলে আপনাকে চাকরি থেকে বিদায় দেয়া হয়েছে তাতেও কি কিছু লেখা হয়নি?

মে. জে. ইবরাহিম : না, একথা সেখানে বলা হয়নি। সেটা তো আরেক কাহিনী। সংবিধানের ১৩৪ ধারা বলে যে, 'এই সংবিধানের দ্বারা অন্যরূপ বিধান না করা হইয়া থাকিলে প্রজাতন্ত্রে কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী সময়সীমা পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।' এখানে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে 'এই সংবিধানের



www.nagorikpathagar.org

দ্বারা অন্যরূপ বিধান না করা হইয়া থাকিলে'। আমি বলতে চাচ্ছি, যারা আমার চাকরি খেলেন, অতীতেও অন্যের খেয়েছেন, আমার মতো লোকের ভবিষ্যতেও খাবেন বলে মনে হয়, তারা বলতে চাচ্ছে– এ ব্যাপারে অন্য কোন বিধান করা হয়নি। এটা ইন্টারপ্রিটেশনের ব্যাখ্যার প্রশ্ন। যারা চাকরি খাওয়ায় অভ্যস্ত তাদের বক্তব্য হল রাষ্ট্রপতি যদি তোমার উপর অসন্তুষ্ট হন বা তোমার কোন কর্মে অসন্তুষ্ট হন তাহলে তিনি যে কোন সময় চাকরি থেকে তোমাকে বিদায় দিতে পারেন। আমার বক্তব্য হল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন অফিসার দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করার কামলা নন। তাদেরকে গড়ে তুলতে অনেক সময় লাগে। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে খরচ লাগে, সুতরাং তাদের অভিজ্ঞতার মূল্য আছে। রাষ্ট্রপতি কেন অসন্তুষ্ট হচ্ছেন এ ব্যাপারটি অবশ্যই দেখতে হবে এবং এটা নিয়মানুগভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে। তারপরও যদি তার অসন্তুষ্টি থাকে তাহলে অ্যাকশন নিতে হবে। এই অসন্তুষ্টির ব্যবস্থাটি আমাদের সংবিধানে যেন এসেছে মধ্যযুগীর ব্যবস্থা থেকে। আগেকার রাজা বাদশাহরা অসন্তুষ্ট হলে গর্দান চলে যেত। সেই থিওরিতেই সেনাবাহিনীর কোন অফিসারের ওপর প্রেসিডেন্ট যদি অসন্তুষ্ট হন তাহলে ফস করে তার চাকরিটি চলে যাবে। এটা আমি কখনও মানতে রাজি নই। এমন তো হতে পারে যে সংবিধানকে ভুলভাবে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে বা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে বলেই আমরা অন্যায়ের শিকার হচ্ছি। অতএব এখানেও আমি গুরুত্ব দিব বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যার ওপর। সংবিধানে আমাদের আর্মির ওপর একটা ক্লজ আছে, Government can retire any time. আমি বারবার এর প্রতিবাদ করছি সরকার may retire any time does not mean without any cause. It can retire any time, of course, with reasonable cause. কিন্তু কর্তৃপক্ষ সবসময় এই ধারণাটি নেন যে may retire any time without cause. আমাদের ব্যাপারটি হচ্ছে ২০ মে সংক্রান্ত। কিন্তু অবসর দেয়ার কাগজে লেখা আছে অন্যসব কথা। সেখানে দু'লাইনে লেখা হয়েছে আপনার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়ায় সরকার আপনাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিচ্ছে এই মর্মে।

যুগান্তর : আনুষ্ঠানিকভাবে কোন অভিযোগই কি আপনার সম্পর্কে আনা হয়নি?

মে. জে. ইবরাহিম : সেটা আনা হলেও কখন এনেছে কার কাছে এনেছে এবং কি এনেছে সেটা এখন পর্যন্ত আমি জানি না। আমাকে বলা হয়নি। আমার সঙ্গে সে ব্যাপারে কোন যোগাযোগও করা হয়নি। আরো মজার বিষয় হল যে, এটা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অন্য সকলকে Communicate বা অবগত করা হয়েছে। অথচ আমাদের চাকরিচ্যুতির তিন-চারদিন পরে সেনাবাহিনীর সদর দফতর থেকে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মাহবুবের হুকুমে পাঁচ-ছয় পৃষ্ঠার একটা চিঠি সমস্ত সেনাবাহিনীতে পাঠানো হয়। সেখানে পুঁথির মতো করে ২০ মে ১৯৯৬-এর ঘটনাকে তাদের ভাষ্যমতে সাজানো এবং বলা হয়েছে। আমি যদি মামলা করার অধিকার পেতাম তাহলে আমি মানহানির মামলা করতাম। আমার অসম্মতিতে এবং আমি



www.nagorikpathagar.org

যেখানে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ পাইনি সেখানে আপনি কিভাবে এইরকম একটা কাগজ দিয়ে সমস্ত সেনাবাহিনীকে জানালেন। বিবিধ কারণে আমি আদালতে যেতে পারছি না।

যুগান্তর : ২০ মে'র ঘটনাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করছেন? রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস কি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?

মে. জে. ইবরাহিম : জনাব বিশ্বাস ও তার পক্ষের লোকেরা বলছেন, এটা জেনারেল নাসিমের ঔদ্ধত্য। অপরপক্ষে জেনারেল নাসিম বা তার পক্ষের লোকেরা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বলেছেন যে, ওটা রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস কর্তৃক সৃষ্ট একটি ষড়যন্ত্র, যাতে করে জেনারেল নাসিমকে অপসারণ করা যায়। এতে একটা কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছে।

যুগান্তর : এই কুহেলিকা থেকে কি আপনি এই এতো বছর পরে কি কোন সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন?

মে. জে. ইবরাহিম : এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। আমি মনে করি, উভয়পক্ষেরই ভুল ছিল।

যুগান্তর : আপনি কি বিষয়টি একটু খুলে বলবেন।

মে. জে. ইবরাহিম : অবশ্যই আমি এটা rationalize করব। প্রথমত, সংবিধানে যে ত্রয়োদশ সংশোধনী আনা হল সেই সংশোধনীতেই ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় একটা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ দেয়া হল। এটা হচ্ছে ১ নম্বর। ২ নম্বর হচ্ছে– ঐ যে বললাম, সরকার কর্তৃক চাকরি খাওয়ার যে অবকাশ আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিশ্বাসের অধীন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দুজন অফিসারের চাকরি খেলেন এবং তাদের অবসর দিলেন। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ, অন্যজন হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার মিরন হামিদুর রহমান। এটা নিয়েই ঘটনার উৎপত্তি এবং এটাই হচ্ছে 'আইসবার্গ'। জেনারেল নাসিমের প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু তিনি কতটুকু ভেবেচিন্তে প্রতিবাদ করলেন সে সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। অন্যদিকে জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস যেই নিয়মে জেনারেল নাসিমকে শায়েস্তা করতে গেলেন সেটা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত, আমি সেটাতেও সন্দিহান। দেখা যাচ্ছে যে, উভয় পক্ষেরই কিছু ভুল হয়েছে এবং সেই ভুলের মাশুল সেনাবাহিনী দিয়েছে। দেশ দিতে দিতে বেঁচে গেছে আর ব্যক্তিগতভাবে আমরা দিয়েছি।

যুগান্তর : ভুলের ব্যাখ্যা যেভাবেই দিন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সেনাবাহিনীকে মুভ করে ঢাকা আনার ব্যাপরটায় কি কোনও ধরনের মিস-এডভেন্চার রয়েছে বলে মনে হয়?

মে. জে. ইবরাহিম : এটাকেই মূল জিনিস ধরা হচ্ছে আর কি। জেনারেল নাসিমের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে, রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস সেনাবাহিনী প্রধানকে এড়িয়ে নিজে তার অধীনদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে সেনাবাহিনীর অংশবিশেষকে কমান্ড করেছিলেন এবং তাদের মাধ্যমে তিনি জেনারেল নাসিমকে প্রতিহত করেছিলেন।



www.nagorikpathagar.org

অন্যদিকে জেনারেল নাসিম বলছেন, সেনাবাহিনীর কিছু অংশ রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যোগসাজশ করে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফেরত আনার উদ্দেশ্যেই তিনি ভিন্ন ভিন্ন সেনানিবাস থেকে সেনাবাহিনী আনার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, অবশ্যই তিনি হুকুম দিয়েছিলেন। এটা তো না দেয়ার কোন প্রশ্ন নেই। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস যেমন দিয়েছিলেন তেমনি জেনারেল নাসিমও হুকুম দিয়েছেন। জেনারেল নাসিম হুকুম দিয়েছিলেন ময়মনসিংহ, বগুড়া, যশোর থেকে সেনাদল পাঠাতে। বগুড়া এবং ময়মনসিংহ থেকে সেনাদল সশরীরেই রওনা হয়ে গিয়েছিল। কিছুদূর এগিয়েও এসেছিল। যশোর থেকে কোন সেনাদল রওয়ানা হয়নি। তারা যশোরেই ছিল। কিন্তু কি পরিস্থিতিতে জেনারেল নাসিম কাকে কি আদেশ দিলেন এটা পরিষ্কার করার অবকাশ পাওয়া যেত যদি সুষ্ঠু তদন্ত হত। সেই তদন্তই অনিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হল বলে বিষয়টা আর স্পষ্ট হল না।

যুগান্তর : আপনি তখন কোথায় ছিলেন?

মে. জে. ইবরাহিম : ২০শে মে-আমি যশোর সেনানিবাসে ছিলাম দায়িত্বরত অবস্থায়। আমি ওখানকার জিওসি ছিলাম। আমার অধীনে দুটি পদাতিক ও একটি আর্টিলারী ব্রিগেড ছিল। তিন চারটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। সব মিলিয়ে ৫০০০ বা ৭০০০ সৈনিক ছিল।

যুগান্তর : ঢাকায় সৈন্যদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত আপনাকে কে Communicate করেন?

মে. জে. ইবরাহিম : আমাকে জেনারেল নাসিম নিজে বলেছেন টেলিফোনের মাধ্যমে। কিন্তু আমি বার বার তাকে জানিয়েছি যে, আপনার মৌখিক আদেশটি আমরা কার্যকর করতে পারব না, যতক্ষণ না আপনার কাছ থেকে আমরা লিখিত আদেশ পাই। তার লিখিত আদেশ পাওয়ার পর আমরাও লিখিত আদেশ দেই। কিন্তু আমি আমার ডিভিশনে সেটাকে বাস্তবায়িত করিনি এবং বাস্তবায়িত করার জন্যও আমি তোড়জোড় করিনি, কারণ ততক্ষণে পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে গেছে।

যুগান্তর : চিফ অব স্টাফের নির্দেশ সত্ত্বেও ঢাকায় সৈন্য মুভ করানোর ব্যাপারে আপনি কেন সংশয়ে ভুগছিলেন? জি.ও. সি হিসাবে তা করা কি সঠিক ছিল?

মে. জে. ইবরাহিম : আমি সংশয়ে ছিলাম এই জন্য যে, ১৯৮১ সালের জুন মাসের ঘটনা আমার চোখের সামনে ভাসছিল। ১৯৮১ সালে চট্টগ্রাম জেলে একটা কোর্ট মার্শাল হয়েছিল। জেনারেল মঞ্জুরের আমলে যে সেনা বিদ্রোহ হয় তার পরিণতিতে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শহীদ হন। সেই ঘটনায় যে কোর্ট মার্শাল হয় তাতে আমি ছিলাম আসামিদের পক্ষে সমর্থনকারী একজন কৌসুলি। আমি সেখানে উপস্থিত থেকে বুঝেছি, বিদ্রোহ কাকে বলে বা বিদ্রোহ কাকে বলে না। এই সংজ্ঞা আমি উদঘাটন



www.nagorikpathagar.org

করতে চেষ্টা করেছি। জেনারেল নাসিমের সঙ্গে কথা বলছি। জেনারেল নাসিম....অপমানিত বা বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। তার অধীন দুইজন অফিসারকে রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস হুট করে চাকরি থেকে বিদায় দিয়েছেন। সেটা জেনারেল নাসিমের ব্যাপার। আমার মূল্যায়ন তো ভিন্ন হবে। আমার মুভ করার জন্য ন্যূনতম যে গ্যারান্টি দরকার সেটা হচ্ছে জেনারেল নাসিমের লিখিত নির্দেশ।

যুগান্তর : সেটা বিদ্যমান আইনের আওতায় কতটা আবশ্যক?

মে. জে. ইবরাহিম : এতবড় একটা কাজ। এটা তো লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাল বাদে পরশু যদি তিনি স্মৃতিভ্রম হয়ে যান এবং যদি বলেন, না আমি এটা বলিনি। জেনারেল নাসিমের আদেশটি ছিল যশোর থেকে ঢাকা অভিমুখে সেনাদল পাঠানো। কিন্তু সত্যি বলতে কি, এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কাঙ্ক্ষিত অল্প সময়ে ঢাকা পর্যন্ত আসাটাই অবাস্তব। কিন্তু আদেশ দেয়াটা অবাস্তব নয়।

যুগান্তর : ঢাকাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যশোর থেকে কেন সেনাদল ডেকে পাঠানো হল?

মে. জে. ইবরাহিম : কারণ ঢাকার সাভারে অবস্থিত জিওসি মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামানের নেতৃত্বে যে সেনাদল যে কোন নিয়মেই হোক জেনারেল নাসিমের নিয়ন্ত্রণের বাইরে সরাসরি রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। জেনারেল নাসিম বলেছেন যে, জেনারেল ইমামুজ্জামান আমার অবাধ্য হয়েছেন। আমি তাকে শৃঙ্খলার মধ্যে ফেরত আনতে চাই, কিন্তু আমার মুখের কথায় কাজ হবে না। আমাকে অনুগত সেনাদল আনতে হবে। সমস্ত সেনাবাহিনীই তো সেনাপ্রধানের অনুগত থাকার কথা। এবং শুধু যশোর থেকে সেনাদল আনার প্রশ্নই ওঠে না। সবাই জানে ময়মনসিং এবং বগুড়া থেকে সৈন্য আনার আদেশ পূর্বেই দেয়া হয়।

যুগান্তর : জনাব নাসিম কি এ যুক্তিটিই দেখিয়েছেন?

মে. জে. ইবরাহিম : হ্যাঁ, তিনি এ যুক্তিটি তখনও দিয়েছিলেন, এখনও দিচ্ছেন। কিন্তু কি পরিস্থিতিতে ইমামুজ্জামান অবাধ্য হয়েছেন বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছেন ইত্যাদি তো আর আমাদের যশোর বসে থেকে জানার কথাও না বা বোঝার কথাও না। আমাদের সেনাপ্রধানের কথাকেই বিশ্বাস করার কথা। আমি যদি সেনাপ্রধানকে বলি যে, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি না। এটা কি ঠিক হবে? তাহলে আমি কাকে বিশ্বাস করব?

যুগান্তর : তাহলে আপনার ঠিক কি Position ছিল?

মে. জে. ইবরাহিম : I was not in any Position. There was a scope for me to either trust him or not to trust him. এবং কিছু তো ঘটেনি। আসা-যাওয়ার কাজটা যে অবাস্তব এটাতো আমি বুঝেছি।

যুগান্তর : এই আদেশটি পাওয়ার পরে আপনি কি করেছিলেন?



www.nagorikpathagar.org

মে. জে. ইবরাহিম : আমি একটা লিখিত আদেশ দেই। এতে বলা হয় যে, নিম্নলিখিত প্রয়োজনে আপনাদের ঢাকায় যেতে হবে। আপনারা প্রস্তুত হন।

যুগান্তর : আপনি কি সেখানে সেই প্রয়োজনটাও উল্লেখ করেছিলেন?

মে. জে. ইবরাহিম : সেনাবাহিনী প্রধানের আদেশে যেতে হচ্ছে সেটাই উল্লেখ করেছিলাম। সেখানে অন্য কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

যুগান্তর : এই আদেশ পাবার পর তারা কি মুভ করেছিল?

মে. জে. ইবরাহিম : না।

যুগান্তর : কিন্তু আপনি কি লিখিত আদেশ দিয়েছিলেন?

মে. জে. ইবরাহিম : হ্যাঁ, আমি লিখিত আদেশ দিয়েছিলাম। আমি অর্ডারটি দিয়েছিলাম বিকেল ৪-১৫ মিনিটে লিখিতভাবে এবং সেটা ঘটনার দিনে। আপনারা যারা ঢাকায় ছিলেন ততক্ষণে ঘটনাটা আপনারা জেনে গেছেন যে, ঐ সময় সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিমের অবস্থান অস্তমান। অর্থাৎ সূর্যাস্তের মতো অবস্থানে ছিলেন তিনি। বিকেল ৪টায় আদেশটি পেয়েছি। সেটা বিকেল ৪-১৫ মিনিটেই আমি আমার আদেশটি দিয়েছি। বিকেল ৫টার সময় আমার আদেশটি অকার্যকর হয়ে পড়ে। কারণ দেশবাসীকে সাক্ষী রেখে রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস ঘোষণা করলেন যে, 'আমি রাষ্ট্রপতি, সেনাপ্রধানকে অবসর প্রদান করছি'। সেটা আমার লিখিত আদেশটি দেয়ার ঘণ্টাখানেক পরে রেডিও ও টিভির মাধ্যমে জানতে পারলাম। রেডিও ও টেলিভিশনে এই ঘটনা জানার পর আমার সাধারণ জ্ঞান বলেছে যে, দেশে এখন Dual Command-এর Situation অর্থাৎ দ্বৈত আদেশের পরিস্থিতি চলছে। রাষ্ট্রপতি বলছেন সেনাবাহিনীর প্রধানকে আমি অবসর দিয়ে দিয়েছি। আবার সেনাবাহিনীর প্রধান বলছেন – আমি এখনও সেনাপ্রধান আছি। তখন আমি আমার Common sense ব্যবহার করে বলেছি যে, আমার সেনাদল যশোর থেকে যাবে না।

যুগান্তর : এতদিন পরে আপনি কি বলবেন যে, আপনি কোনভাবে বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ কিনা?

মে. জে. ইবরাহিম : আমার বিবেকের কাছে যে দায়বদ্ধতা আছে তা বলছি। একজন জিওসি হিসাবে আমার অধীনে তখন দুই থেকে আড়াইশ অফিসার ছিল। আমার অধীনে ৫০০০-এরও বেশি সৈনিক ছিল। আড়াইশ' অফিসার এবং পাঁচ হাজার সৈনিক তো আর ঢাকায় আসত না। দুই চারশ'র একটি দলকে ঢাকা আসার জন্য বলা হয়েছিল সেনাপ্রধানের হুকুমে। ঢাকায় তো কোন পিকনিক হচ্ছিল না যে আমি আসব। মাননীয় সেনাপ্রধান আদেশ দিয়েছেন। সে আদেশটা আমি নিচের দিকে দিয়েছি। সেনাবাহিনীর আইন মোতাবেক সে আদেশটা আমি বাস্তবায়িত করব স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। কিন্তু আমার বিবেকের কাছে এই মুহূর্তে খুব পরিষ্কার যে, যে মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি সেনাপ্রধানকে অবসর দিয়েছেন এই সিদ্ধান্তটি দেশবাসী এবং আমিসহ জেনে গেলাম তখন আমি



www.nagorikpathagar.org

সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি তাদের যাত্রা স্থগিত করেছি। আমি পুনরায় লিখিত আদেশ দিয়েছি রাত ১০টায়। তখন নতুন সেনাপ্রধানের লিখিত আদেশও আমার কাছে পৌঁছেছে। তাতে বলা হয়েছে যে, পূর্বতন সেনাপ্রধানের লিখিত আদেশ প্রত্যাহার করা হল। ওই ক্যানসেল অর্ডার পেয়েই আবার আমি অর্ডারটি ক্যানসেল করেছি। তা না হলে তো আমার সেনাদল ঢাকা অভিমুখে অর্ধেক পথে চলে যেত। কিন্তু আমি সেটা কার্যকর করিনি। বিকেল ৫টার পরে আর কোন কাজ আমি সেখানে করিনি। যদিও নিয়ম অনুয়ায়ী আমি করতে পারতাম, তবু আমি করিনি কেন? এর জবাবে আমি বলব- আমার অধীন আরও জ্যেষ্ঠ অফিসার ছিল তারাও সকলে দেখল যে, যে মুহূর্তে সেনাপ্রধানের নিযুক্তিটাই প্রশ্নের সম্মুখীন সেই মুহূর্তে সেনাপ্রধানের আদেশটি বাস্তবায়িত করতে যাওয়াটা হবে অবিবেচনাপ্রসূত। আজ এই যে কথাগুলো আপনি আমাকে যুগান্তরের পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করছেন এসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার কথা ছিল কিন্তু সরকারের তদন্তকারী দলের। তারা আমাকে এই প্রশ্ন করা তো দূরে থাক আমাকে একটিবারও ডাকেনি। তাদের চেহারাই আমি দেখিনি।

যুগান্তর : কোর্ট অফ ইনকোয়ারী নিয়ে কি আপনার মনে কোন প্রশ্ন আছে?

মে. জে. ইবরাহিম : অবশ্যই আছে। কোর্ট অফ ইনকোয়ারী অনিয়মতান্ত্রিকভাবে সেনাবাহিনীর আইন ভঙ্গ করে আমার মান-সম্মান হরণ করেছে। Existing law-এর যে Frame আছে সেই Existing law-কেই অমান্য করা হয়েছে। আমি নতুন কিছু দেশবাসীর কাছ থেকে চাচ্ছি না। আমি চাচ্ছি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিদ্যমান আইনের ফ্রেমেই যে সুরক্ষা আছে এই সুরক্ষাটুকু আমাকে দেয়া হোক, যা এখন পর্যন্ত আমাকে দেয়া হয়নি।

যুগান্তর : আপনি কি মনে করেন যে, বিদ্যমান আইনের আওতায় আপনাদের বিষয়টি পুনর্বার পরীক্ষা করার সুযোগ রয়েছে?

মে. জে. ইবরাহিম : অবশ্যই। আমি দেশের সরকার প্রধানের কাছে দুবার আবেদন করেছি। বলেছি, আমার এ প্রতিবাদ এ ক্ষোভ আমার মনে আছে। আমি আপনাকে জানালাম। তিনি সেনাবাহিনী কর্তৃপক্ষকে যে কোন সময় বলতে পারেন যে এটা তোমরা তদন্ত কর। দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগরিক মাত্রই জানেন যে সেনাবাহিনীর তদন্ত নিয়মবহির্ভূতভাবে করা হয়েছে।

যুগান্তর : ওই তদন্ত কমিটির বৈধতা কি সিভিল কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে?

মে. জে. ইবরাহিম : না। ওই কমিটির বৈধতা সিভিল কোর্টে চ্যালেঞ্জ করার অবকাশ নেই। কারণ ওই কমিটি গঠন করার বৈধ অধিকার তৎকালীন সেনাপ্রধান ও তৎকালীন সরকারের ছিল। কিন্তু ওই কমিটির কার্যক্রম নিয়েই রয়েছে প্রশ্ন। কমিটি গঠনেও ছিল অনিয়ম। যেমন কমিটিতে তদন্ত করার সময় এমন কোন ব্যক্তিকে নেয়া যাবে না যে ব্যক্তি ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা এতে তার কোন স্বার্থ আছে। কিন্তু ওই তদন্তে একাধিক ব্যক্তি ছিলেন যারা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ফলে এটা সম্পূর্ণভাবে আইনবহির্ভূত।



www.nagorikpathagar.org

যুগান্তর : উদাহরণ দিয়ে বলবেন কি ?

মে. জে. ইবরাহিম : আমার অধীন ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জাকির যশোরে আমার অধীনে চাকরি করেছেন. আমার নিকট থেকে হুকুম নিয়েছেন এবং পালন করেছেন। তিনিই আবার এই কমিটিতে তদন্তকারী দলের সদস্য হন। আমি সেনাপ্রধানের কাছ থেকে যে হুকুমগুলো পেয়েছি সেই হুকুমগুলো তো আমার অধীনদেরকে দিয়েছি। জিওসি একা তো কোন শক্তি নয়। তার মধ্যে একজন ব্রিগেড কমান্ডার যিনি আদেশ পেয়েছেন তিনি হচ্ছেন ব্রিগেডিয়ার জাকির। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে কমিশনপ্রাপ্ত। আমি তো ওকেও কিছু আদেশ দিয়েছি এবং তিনিও তা আইনানুগভাবেই পালন করেছেন। কিন্তু তিনিই আবার তদন্তকারী হিসাবে এসেছেন অর্থাৎ তিনি আমার বিচার করতে বসেছেন। এর জন্য দায়ী তৎকালীন সরকারপ্রধান ও সেনাপ্রধান। আমি উভয়কেই দোষী সাব্যস্ত করছি। কারণ রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস বেশ কয়েকবার বলেছেন "আমি একজন আইনবিদ। আমার অনেক বছরের আইনের অভিজ্ঞতা আছে।" তাহলে এটা তো চোখে আসা উচিত ছিল এবং সেনাবাহিনী প্রধানেরও ৩২/৩৫ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা ছিল। উনি ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের মানহানি করেছেন। ঠিক একইভাবে জেনারেল নাসিমের পক্ষ থেকে জেনারেল মতিউর রহমান সম্পর্কেও বক্তব্য আছে। কিন্তু সেটা আমি প্রকাশ করতে চাই না। জেনারেল নাসিম নিজ বক্তব্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যা বলেছেন, তা আমি আর বলতে চাই না। তিনি পত্রপত্রিকায় যে আর্গুমেন্ট দিয়েছেন এবং মৌখিকভাবে আমাদের কাছে যেটা বলেছেন তা সেনাবাহিনী এবং দেশবাসী সবাই জানেন। জেনারেল মতিউর রহমান সঠিক সময়ে ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংক থেকে মেজর জেনারেল পদে প্রমোশন পাননি। সঠিক সময় বলতে সমসাময়িকদের সঙ্গে। অর্থাৎ তিনি পাঁচ-সাত বছর 'সুপারসিডেড' অবস্থায় ছিলেন। দ্বিতীয়ত, ২০ মের ঘটনার কিছুদিন পূর্বেও দুতিনটা প্রশাসনিক অনিয়মের কারণে কয়েকজন অফিসার সাজাপ্রাপ্ত হন। কেউ বেশি সাজা পেয়েছেন কেউ কম সাজা পেয়েছেন। কেউ মাঝামাঝি সাজা পেয়েছেন। ব্রিগেডিয়ার মতিউর রহমান জেনারেল নাসিমের হাত থেকে মাঝারি আকারের সাজা পেয়েছিলেন। তার পরপরই এই ঘটনাটি ঘটে। জেনারেল নাসিম বলতে চাচ্ছেন যে, তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে ব্রিগেডিয়ার মতিউর রহমানকে সাজা দিয়েছেন এবং সেই ব্রিগেডিয়ার মতিউর রহমানকে ঘটনার দিন দিবাগত রাতে প্রমোশন দিয়ে তদন্ত কমিটির প্রধান করা হচ্ছে। এটা অনিয়ম এবং আমি নিজেও মনে করি এটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কথা। এরকম আরো অনেক আছে। আমি আর বলতে চাই না। ঘাঁটাঘাটি বেশি করতে খুব খারাপ লাগে। বিশেষত জেনারেল মতিউর রহমান এখন পরলোকে আমরা তার রুহের মাগফিরাত কামনা করি।

যুগান্তর : আপনার সঙ্গে অন্যান্য জিওসির বিরুদ্ধেও কি একই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল?



www.nagorikpathagar.org

মে. জে. ইবরাহিম : শুধু জিওসিই নয়, তদন্তে অনেক অফিসারের নামেই কঠোর বা মাঝারি শাস্তির কথা বলা হয়েছিল বলে শুনেছি এবং আমি সঙ্গতকারণেই তা বিশ্বাস করি। পরবর্তী সময়ে যেকোন নিয়মেই হোক আমরা কেউ কেউ এর শিকার হয়েছি। আবার কেউ কেউ বেঁচে গেছে। তবে এই লিখিত আদেশের ব্যাপার নিয়ে আর কোন ঘটনা নেই। কারণ আমরা তিনজন জিওসি চাকরি হারিয়েছি। জেনারেল নাসিম নির্দেশ দিয়েছিলেন জিওসি হিসাবে তিনজনকে সরাসরি এবং একজনকে বলেছিলেন পরে জানাবেন।

যুগান্তর : এদের সকলেই কি আপনার মতো ঢাকায় সেনাদল প্রেরণের জন্য লিখিত আদেশ দিয়েছিল?

মে. জে. ইবরাহিম : তারা আমার চেয়ে ঢের বেশিদূর এগিয়েছিল। তারা তো সৈন্য পাঠিয়েই দিয়েছিল। তারা অর্ডার পাওয়ার আগে না, পরে সৈন্য পাঠিয়েছিল সে সম্পর্কে আমি অবগত নই। তবে এই সৈন্য পাঠানোর সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব জেনারেল নাসিমের। তবে আদেশ আমরা পালন করেছি। আমি আমার ডিভিশন সম্বন্ধে শতবার বলব যে, আমার ডিভিশনে যা কিছু হয়েছে আমার আদেশে হয়েছে। তার জন্য আমি দায়ী। এর জন্য যদি শাস্তি পেতে হয় আমি পাব। আমার অধীনরা এজন্য কোনক্রমেই দায়ী নয়। আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে, আমার অধীনদের কারোই কোন প্রকার সাজা হয়নি। কিন্তু অন্যান্য এলাকায় বগুড়া ঢাকা বা ময়মনসিংহের অনেক অধীন ছোট ছোট অফিসার কমবেশি সাজা পেয়ে গেছে।

যুগান্তর : আপনি এসবকে কি কোন বিচারেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন না ?

মে. জে. ইবরাহিম : আমি কখনই এগুলোকে সামরিক রেওয়াজের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে করি না।

যুগান্তর : এটাকে কি আপনি নজিরবিহীন বলবেন?

মে. জে. ইবরাহিম : এটাকে নজিরবিহীন বলব না। হিরোইজমের বা বীরোচিত কাজের যেমন উদাহরণ আছে, তেমনই নন-হিরোইক বা অবীরোচিত কাজেরও উদাহরণ আছে। তবে বিবাহের কাবিননামায় যেমন লেখা থাকে ভদ্রজনোচিত খোরপোষ দিতে হবে, ঠিক সেরকমই সেনাবাহিনীতে একে অপরের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে বা আচরণ করবে, তার একটা Code of Conduct আছে। সেখানে একজন উপরের দিকে তাকায়। Senior Must take responsibility of the junior এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ২০ মের ঘটনা যেহেতু জেনারেল নাসিমের নির্দেশে হয়েছে সেহেতু তিনিই এর পূর্ণ দায়িত্ব নেবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

যুগান্তর : জেনারেল নাসিম কি ২০ মের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন?

মে. জে. ইবরাহিম : ওঁর বক্তব্য আপনারা নিজেরাও পড়েছেন। আমার কাছ থেকে কেন আর শুনতে চান।



www.nagorikpathagar.org

যুগান্তর : ২০ মের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট কি চিরদিনের জন্য Classified হয়ে থাকবে?

মে. জে. ইবরাহিম : বাংলাদেশে তথ্য বা দলিলপত্র প্রকাশের কোন ধারণা কেউ ফলো করে না। বিদেশে যেমন ২০ বা ২৫ বছর পর de-classification হয়। আমাদের দেশে এসবের ধারণা কেউ পোষণ করে না। আর দেশের বয়সও তো মাত্র ৩০ বছর। সুতরাং কোন তথ্য ডি-ক্লাসিফাই করতে হলে এখনই শুরু করতে হবে। অর্থাৎ ১৯৭২ থেকে শুরু করতে হবে। পরের বছর '৭৩ হবে, তার পরের বছর '৭৪ হবে। এ ধরনের নিয়ম করা যায়। তবে সংবেদনশীল বা স্পর্শকাতর যেগুলো আছে সেটা কখন করবে বা করবে না তারও একটা নির্দিষ্ট পলিসি থাকা দরকার। এটা সংরক্ষণ করাটা অবশ্য কর্তব্য, যাতে করে ইতিহাস যে কোন সময় সঠিকভাবে উদঘাটন করা সম্ভব হয়। Classify হোক বা না হোক, অন্তত এটাকে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে যেই অবস্থাতেই থাকুক না কেন ঐ অবস্থাতেই যেন সেটাকে পুনর্মূল্যায়ন করা যায়।

যুগান্তর : আমাদের সেনাবাহিনীতে ইতোমধ্যে অনেকগুলো দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেসব ব্যাপারে কোন দলিলপত্র কি কখনও আলোর মুখ দেখতে পারে?

মে. জে. ইবরাহিম : আসলে সেনাবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের নিকট জবাবদিহি করার প্রক্রিয়াটা গত চার/পাঁচ বছরে জোরদার হয়েছে। যদিও সেনাবাহিনী এবং রাজনীতি সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করা যায়। আমি সেটা না করে এই ভাল কথাটা বলতে চাই যে, সেনাবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের কাছে জবাবদিহি করার যে প্রক্রিয়া গত কয়েক বছর যাবৎ জোরদার হয়েছে, সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে কিছু কিছু নালিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিতে বা তাদের উপকমিটিতে হয়েছে এবং তারা সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সব খোঁজখবর নিচ্ছেন। এখন দেখার বিষয় হল সেনাবাহিনী এ বিষয়ে কি প্রতিক্রিয়া দেখায়। কি রকম সমঝোতা দেখায়? কতটা মানে? এ সম্বন্ধে তাই এ মুহূর্তে বিশদ বক্তব্য রাখা কঠিন।

যুগান্তর : আপনি কি মনে করেন যে সংসদীয় কমিটি ২০ মের ঘটনা খতিয়ে দেখতে পারে?

মে. জে. ইবরাহিম : হ্যাঁ, পারে। তবে কমিটির কাছে আমি নালিশ করিনি। আমাদের একজন দিয়েছেন বলে জানি। একজন তো রাষ্ট্রপতির কাছেও নালিশ দিয়েছেন।

যুগান্তর : রাষ্ট্রপতি কি কোন জবাব দিয়েছেন?

মে. জে. ইবরাহিম : না। কোন জবাব দেননি এবং এর কোন গতিও হয়নি। সংসদীয় কমিটি ইচ্ছা করলেই এটা তদন্ত করতে পারে। যদি সেনা বিদ্রোহ হয়ে থাকে তাহলে দোষীদের বিচার হতে হবে।

যুগান্তর : দোষী সাব্যস্ত না হলে আপনি কি চাকরি ফেরত পেতে পারেন?



www.nagorikpathagar.org

মে. জে. ইবরাহিম : অবশ্যই পেতে পারি। আইন তো মানুষেরই জন্য। তবে আমি তো আগেই বলেছি, চাকরি ফেরত পাওয়া আমার কাছে বড় নয়। বড় হল আমার শির উন্নত রাখার প্রশ্ন।

যুগান্তর : ২০ মে'র ঘটনার জন্য আপনি বিশেষভাবে কাউকে দায়ী মনে করেন?

মে. জে. ইবরাহিম : প্রশাসনের সঙ্গে জড়িতদের কিছুর সংশ্লেষ আছে। সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সংশ্লেষ আছে। রাষ্ট্রপতি এবং তার নেপথ্যের উপদেষ্টাগণের কিছু সংশ্লেষ আছে।

যুগান্তর : অনেকের মনে ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, ওই সময় একটা অভ্যুত্থান ঘটে যেতে পারত। এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কি?

মে. জে. ইবরাহিম : আসলে জেনারেল নাসিম কাউকে এমন কোনও আদেশ দেননি যে আদেশটাকে প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহ বলা যায়। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়। ধরুন, জেনারেল নাসিম একটা বক্তব্য রাষ্ট্রপতির কাছে রাখলেন। রাষ্ট্রপতি যদি জেনারেল নাসিমের কথা না শোনেন বা অনুরোধ না রাখেন তাহলে জেনারেল নাসিম কি করবেন, সেই ধারণা জেনারেল নাসিমের ছিল কি ছিল না, এটা খুবই কঠিন প্রশ্ন। জেনারেল নাসিমের কর্মকাণ্ডের এই অংশটিকে কেউ বলছেন সিদ্ধান্তহীনতা, কেউ বলছেন দুর্বল সিদ্ধান্ত, কেউ বলছেন রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক সিদ্ধান্ত কেউ বলছেন ইন্নোসেন্ট কর্মকাণ্ড যার অর্থ সে নিজেই জানে না। তবে পরিস্থিতি যে নাজুক ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

যুগান্তর : পরিস্থিতির নাজুকতা সম্পর্কে একটু খুলে বলবেন কি?

মে. জে. ইবরাহিম : দেশের সবচেয়ে বড় যে ব্যক্তি তার সঙ্গে ইমিডিয়েট দুই নং ব্যক্তির যদি বিরোধ দেখা দেয় তাহলে তার নিষ্পত্তি কি করে হবে আমাদের তৎকালীন সংবিধানে এমন কোন প্রক্রিয়া রাখা নেই। বাড়িতে যদি বাবা ও মা ঝগড়া লেগে যায়, বড় ছেলে বা মেয়ে এগিয়ে যায়। বড় ছেলে যদি হঠাৎ করে বাবা মায়ের সঙ্গে বেয়াদবি করে ফেলে আরেকজন এসে সেটাকে সামলে নেন। মেঝ ভাই যদি বড় ভাইয়ের সঙ্গে বেয়াদবি করে ফেলেন সেঝ ভাই এসে সেটা সামলে নেন। কিন্তু সেনাপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে তো আর কেউ নেই। এই পরিস্থিতিতে দুইজন যখন মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছেন তখনই, আমি বলতে চাচ্ছি বাংলাদেশে সবচেয়ে নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আমাদের আইন প্রণেতাগণের নিকট আমার বিনীত অভিযোগ যে, এ ব্যাপারে আপনারা দুর্বল কাজ করেছেন। ভবিষ্যতে আরেকটি নাজুক অবস্থা সৃষ্টি হলে কি হবে সেটা অবশ্যই বিবেচনায় রাখা এবং এখান থেকেই আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত।

যুগান্তর : এই সময় একটি ক্যু আদৌ হতে যাচ্ছিল বা যাচ্ছিল না-সেটা সম্পর্কে খুব স্পষ্ট করে কিন্তু কিছু বলছেন না বলে মনে হয়।



www.nagorikpathagar.org

মে. জে. ইবরাহিম : আমি স্পষ্ট করে বলছি না যে একটা ক্যু হতে যাচ্ছিল বা বলছি না যে হতে যাচ্ছিল না, কারণ আমি তো ছিলাম যশোরে। আমি ঢাকা সম্পর্কে ১০০ ভাগ মতামত দিতে পারছি না। জেনারেল নাসিমের হুকুম মোতাবেক যদি ঢাকার বাইরে থেকে সৈন্যসামন্ত এসে ঢাকা দখল করত, রেডিও স্টেশন দখল করত, সরকার দখল করত তাহলে এটাকে একটা ক্যু বলা যেত। জেনারেল নাসিমের বিপক্ষের লোকেরা বলছে, তুমি এটাই করতে চাচ্ছিলে। আমরা তোমাকে পথের মধ্যে বন্ধ করে দিয়েছি। আর জেনারেল নাসিম বলতে চাইছেন – না, আমি এটা করতে চাইনি। তোমরাই করেছ আমাকে সরিয়ে দেয়ার জন্য ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য। এই বিতর্কের নিষ্পত্তি আমার পক্ষে করা সম্ভব নয় । তবে আমি এটুকু বলতে পারব যে, আমার মতো আরও অনেক অফিসার আছেন যারা এ সমস্ত ঝামেলায় যেতে নারাজ। আমি একজন পেশাদার সৈনিক হিসাবে সারাজীবন থাকতে চেয়েছি। আমার এই পেশাদার জীবনকে হত্যা করা হয়েছে।

যুগান্তর : বলা হয়ে থাকে যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে অনেক মেধাবী সেনা অফিসার ক্যাজুয়েলটি হয়েছেন। ২০ মে'র আগে ঘটেছে এবং এ ধরনের রক্তক্ষরণ অব্যাহত থাকলে পেশাদার আর্মি গড়ে ওঠা তো খুবই মুশকিল।

মে. জে. ইবরাহিম : আমাদের সেনাবাহিনীর জন্য এটা খুবই দুঃখজনক। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আপনি যেটাকে রক্তক্ষরণ বলছেন সেটাকে আমি বলব মেধাহরণ। আমার চাইতেও অনেক মেধাবী অফিসার সেনাবাহিনীতে ছিল। তাদের অনেকেরও এরকম অপমৃত্যু হয়েছে। শুধু ২০ মে নয়, এর আগেও হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মেধার অপমৃত্যু অহরহ হয়েছে এবং এটাকে বিখ্যাত এক অর্থনীতিবিদের ভাষায় "Bad money drives good money out of circulation" এই থিউরিতে সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা দেখানো যায়।.

যুগান্তর : ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে আপনি কি কোন সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখবেন?

মে. জে. ইবরাহিম : আমি এ সম্বন্ধে চারটি বা পাঁচটি পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলব। ১নং সংবিধানের ১৩৪-এর ধারার পুনর্মূল্যায়ন, ২নং রাষ্ট্রপতি সর্বাধিনায়ক হিসাবে তার দায়িত্ব পালনের নিয়ম এবং তার প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধকরণ, ৩নং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকবেন কি থাকবেন না সেটা সুস্পষ্টকরণ, যদি থাকেন সেটা কি নিয়মে থাকবেন সেটা স্পষ্ট এবং উপদেষ্টা পরিষদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে সেটা লিখে দেয়া, ৪ নং ২০ মে'র ঘটনার পুনঃতদন্ত। সেই তদন্ত হবে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতির নেতৃত্বে এবং সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট বিভাগের অন্য একজন বিচারপতির সমন্বয়ে। সেনাবাহিনীর জ্যেষ্ঠ মেজর জেনারেলকে সদস্য করা এবং সরকারের বিবেচনায় অন্য যে কোন দুজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বা একজন প্রাক্তন ডিফেন্স সেক্রেটারিকে শামিল করা যেতে



www.nagorikpathagar.org

পারে। সেনাবাহিনী আইন যে নিয়মে তদন্ত করতে বলেছে ঠিক সেই নিয়মেই তদন্তটি করতে হবে। সর্বশেষ ৫ নং সামরিক বাহিনীর সদস্যদের উচ্চ আদালতে যাবার বিষয়ে পুনর্মূল্যায়ন।

যুগান্তর : অতীতের লিগেসি শুদ্ধিকরণে আপনার প্রস্তাব কি?

মে. জে. ইবরাহিম : ১৯৮১ সালের ঘটনা ও ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের ঘটনা সেনা অ্যাক্টে তদন্তের দাবি রাখে। ১৯৭৫-এর ৭ই নভেম্বরের ঘটনাও তদন্তের দাবি রাখে। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে বা ১৯৮১ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে হত্যা সেনাবাহিনী করেনি। সেটা সেনাবাহিনীর একদল অফিসার করেছে। কি কারণে তারা এ কাজটা করলেন বা কোন পরিস্থিতিতে এটা করার সুযোগ পেলেন সেটা যদি উদ্‌ঘাটন করা যায় তাহলে কারণগুলো দূরীভূত হবে এবং যে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তারা কাজটা করে ফেলল তাও দূর করা সম্ভব হবে। এটা হচ্ছে গোয়েন্দা সংক্রান্ত। শৃঙ্খলা সংক্রান্ত।

যুগান্তর : বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা উচ্চ আদালতে বিচারাধীন। কিন্তু সেনাবাহিনী নিজে কখনও এই ঘটনা তদন্ত করেনি এবং সেনা আইনেও বিষয়টাকে কখনও Court of enquiry গঠন করে অভ্যন্তরীণভাবে দেখা হয়নি বলে জানা যায়।

মে. জে. ইবরাহিম : এটা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞান খুবই সীমিত এজন্য যে তখন আমি মেজর ছিলাম এবং ঘটনার সঙ্গে মোটেই জড়িত ছিলাম না। সেজন্য এটাকে নিজের স্মৃতি থেকে হুবহু বলতে পারছি না। কে তদন্ত করেছেন, কিভাবে করেছেন, ফলাফল কি, এসব কিছুই জানি না। শুনেছি এটা নিয়ে ঐ সময় খুবই হৈচৈ হয়েছে। ইদানীং বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তাদের বই পুস্তকে অনেক কিছুই লেখা হচ্ছে।

যুগান্তর : আর্মি অ্যাক্টে আনুষ্ঠানিক তদন্ত হয়েছিল কিনা?

মে. জে. ইবরাহিম : আনুষ্ঠানিক তদন্ত কমিটির কথা আমরা শুনিনি, ১৯৭৫-এর নভেম্বরের ৭ তারিখের ঘটনারও কোন তদন্তের কথা শুনিনি। ১৯৮১ সালের মে মাসে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। সে সময় এ ব্যাপারে তদন্ত হয়েছে বলে শুনেছি। সেনাবাহিনীর একজন জেনারেল এর তদন্ত করেছেন। একজন বিচারপতিকে দিয়েও এর তদন্ত করা হয়েছিল। কিন্তু এগুলো কোনদিনও সূর্যের আলো দেখেনি। অনেকের কাছে বলতে শুনেছি যে ঐ তদন্তগুলো সেনাবাহিনীর নিয়ম ভঙ্গ করে করা হয়েছে এবং ১৯৮১ সালের ঘটনায় জড়িতদের কোর্ট মার্শাল আত্মপক্ষ সমর্থনকারীদের পক্ষে কৌসুলি হিসাবে আমরা তিনজন ছিলাম। সে সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা আছে। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হয়েছেন এটা সূর্যালোকের মতো সত্য। সেনা বিদ্রোহ হয়েছে এটাও সত্য। কিন্তু কে করেছেন সেই সঠিক ব্যক্তিকে সাজা দিতে হবে তো। আর তার পরে ১৯৯৬ সালের এই ঘটনা তো আছেই।


www.nagorikpathagar.org

যুগান্তর : জেনারেল মঞ্জুরকে নিয়ে একটা যে ভাবনা উনিই জিয়া হত্যা মামলার মুখ্য আসামি ছিলেন, এ ব্যাপারে কি আপনি কিছু বলবেন? সঙ্গে সঙ্গে ৮১'র মার্শাল ল সম্বন্ধে?

মে. জে. ইবরাহিম : কোর্ট মার্শালের সময় যেসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর আইনের অধীনে বিদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়েছিল তাদের কোর্ট মার্শালের মাধ্যমে বিচার হয়। সেই বিচারের সময় আসামিদের অনুরোধে কর্তৃপক্ষ তিনজন অফিসারকে আসামি পক্ষের কৌসুলি নিযুক্ত করেন। সেনাবাহিনীর আইনের ভাষায় বলা হয় 'ডিফেন্ডিং অফিসার'। আমি এই তিনজনের একজন ছিলাম। আমি তখন লেফটেনেন্ট কর্নেল, ১৯৮১ সালের জুন-জুলাই এর কথা। আমি হেড কোয়ার্টারে ছিলাম। আমার মনে হয়েছে যে, ঢাকার জ্যেষ্ঠ কয়েকজনের সাথে যোগসাজসে, ১৯৮১ সালে মে মাসে চট্টগ্রামে কর্মরত জেনারেল মঞ্জুরের ঘনিষ্ঠ তিনজন অফিসার এই ঘটনার হোতা। তাদের মুখের দিকে চেয়ে বা পরিস্থিতির চাপে জেনারেল মঞ্জুর দায়িত্ব স্বীকার করে নেন। কিন্তু জেনারেল মঞ্জুরের বিরুদ্ধে অভিযোগকারীরা তো তাকে জীবিতই রাখেননি। যা অত্যন্ত দুঃখজনক। আর ১৯৮২ সালের মার্শাল ল এর কথা সম্বন্ধে বললে, পুরো দায়িত্ব জেনারেল এরশাদের। এরশাদ এবং তার অধীন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা এটা পরিকল্পনা করেছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে কখনই সেনাবাহিনীর শাসন বা সামরিক শাসনের পক্ষে ছিলাম না। বর্তমানেও নেই। তবে সেনাবাহিনী ভোট দিয়ে ডিসিশন নিয়ে মার্শাল ল' জারি করে না। সেনাবাহিনীর হয়ে সেনাবাহিনীর একজন বা দুইজন বা চারজন বা কয়েকজন মিলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা কাজ করে ফেলে. কিন্তু এতে পুরো সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযোগ এসে যায়।

যুগান্তর : সামরিক আদালতে '৮১-র বিচারটি কি পুনর্মূল্যায়নের দাবি রাখে? ওটা সুষ্ঠু হয়েছে কিনা?

মে. জে. ইবরাহিম : আমি তো ডিফেন্ডিং অফিসার হিসাবে ছিলাম, এখানে ফেয়ার বা আনফেয়ার শব্দটি ব্যবহার না করে আমি বলতে চাই আইনের ব্যত্যয় ঘটেছে।

যুগান্তর : ৭ই নভেম্বর সম্পর্কে বলুন?

মে. জে. ইবরাহিম : ৭ই নভেম্বর তো ২৫ বছর আগের ঘটনা। তখন আমি ছোট অফিসার ছিলাম। কিন্তু নিজের চোখে একটা অংশ দেখার সুযোগ হয়েছিল। সেখানে আমার প্রশ্ন হল সেনাবাহিনীতে কি করে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। এইসব বিদ্রোহাত্মক কর্মকাণ্ড সেনাবাহিনীতে কিভাবে ঢুকেছিল? কিভাবে প্রচার পেয়েছিল? এগুলো অবশ্যই জানা উচিত। যাতে ভবিষ্যতে এ রকম কর্মকাণ্ড না ঘটে।

যুগান্তর : যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে ২০ মে'র ঘটনার যদি পুনঃতদন্ত হয় তবে তার আগের ঘটনাগুলোরও হতে হবে তখন কোথা থেকে শুরু হবে?



www.nagorikpathagar.org

মে. জে. ইবরাহিম : এটার উত্তর দুটি নিয়মে বলা যায়। একটা নিয়ম হল, আমি যদি স্বার্থপরের মতো বলি, তাহলে আমি বলব ২০ মে'র ঘটনাটি আগে দেখ। কারণ এটা সবচেয়ে নিকট ইতিহাসের ঘটনা এবং এতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা সবাই জীবিত আছেন। কথা বলতে পারছেন। জবানবন্দি দিতে পারবেন। তবে আমি নিজেই স্বীকার করছি এতে আমি স্বার্থপরের পরিচয় দেব। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছু না কিছু স্বার্থপর। তবে আমার স্বার্থটা কোথায়, কি জন্যে এই প্রশ্ন করলে তার উত্তর হচ্ছে আপনি যদি আমাকে বলেন যে, আপনি কি চাকরি ফেরত চান? তদন্তে আপনাকে চাকরি দেয়া হয় আপনি কি চাকরি করবেন? এটা কি আপনার মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহলে আমি লিখিতভাবে জবাব দিতে পারি এটা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আমার মুখ্য উদ্দেশ্য সেনাবাহিনীতে জাববদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা। অন্যায়ভাবে তদন্ত হয়ে থাকলে সেটা পুনরায় করা হবে ভবিষ্যতে। তাহলে ভবিষ্যতে আর অন্যায়ভাবে কেউ তদন্ত করবে না। আর যে উদাহরণগুলো আপনি টানছেন সেগুলো সঠিক। সেগুলো অবশ্যই পুনরায় তদন্ত হতে পারে। কিন্তু ওগুলোর ব্যাপারে যে বাধাটা আছে সে হচ্ছে অনেক সাক্ষী নেই। অনেক সাক্ষী মরে গেছে। তবে কাউকে না কাউকে এটা শুরু করতে হবে এবং নিকট ঘটনা হিসাবে ২০ মে'র ঘটনা দিয়েই তা শুরু করা যায়।

দৈনিক যুগান্তর ২০/২১ ও ২২ মে ২০০০



www.nagorikpathagar.org

# সেনাপ্রধান নিয়োগসংক্রান্ত প্রশ্নে আরো কিছু কথা

আমি কোনো পত্রিকারই নিয়মিত কলামিস্ট নই। সেই ঝোঁক বা প্রবণতাও নেই। 'প্রথম আলো'র সম্মানিত পাঠকগণ বিশেষভাবে আমাকে চেনেন কারণ 'প্রথম আলো'র বয়স দু'মাস পার হওয়ার পূর্বেই একনাগাড়ে ২৩ দিন পত্রিকাটিতে আমার লেখা বের হয়েছিল। এর পরেও মাঝে মধ্যে লেখা বেরিয়েছে। অনেকদিন হয় 'প্রথম আলো'তে লিখিনি। গত চার মাস যাবৎ একটি দৈনিক পত্রিকায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে লিখছি। সেজন্য অন্য দিকে মন দেওয়া হয়ে ওঠে না। এরপরও রয়েছে জীবন-সংগ্রামের বিবিধ কর্ম। এত কিছু সত্ত্বেও আজকের লেখাটা লিখতে একরকম বাধ্য হচ্ছি।

প্রথম কারণ হচ্ছে, কয়েকজন সাংবাদিক ভাইয়ের ব্যক্তিগত অনুরোধ। তাদের অনুরোধের প্রেক্ষাপট হচ্ছে এই, গত ১৮ সেপ্টেম্বর প্রথম আলো পত্রিকার প্রথম এবং সপ্তম পৃষ্ঠায় 'প্রথম আলো'-এর সম্মানিত সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান নিজ নামে একটি মন্তব্য প্রতিবেদন লেখেন। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল 'কে হচ্ছেন সেনাপ্রধান...'। এই সাহসী ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদনটির প্রত্যুত্তরে ২৫ সেপ্টেম্বর প্রখ্যাত কলামিস্ট জনাব আবেদ খান একটি নিবন্ধ লেখেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সাংবাদিক শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধ হচ্ছে যে, সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান অবসর জীবনের বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বস্তুনিষ্ঠ মন্তব্য যেন করি। তাই করব।

দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে, গত কয়েকদিন যাবৎ ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে চাকরিরত বয়োজ্যেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষীগণের মুখে মুখে একটা কথা চলছে। অনেকটা এরকম, 'মতিউর রহমান সাহেব আসলে নিজে লেখেননি, হয় জেনারেল ইবরাহিম নিজে লিখে দিয়েছেন, নয় লেখার তথ্যগুলো দিয়েছে। নিজের নামে না লিখে ইবরাহিম সাহেব অন্যের নামে লেখায় কেন? আর সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ এত কথা সাংবাদিকদের জানায় কেন? ক্যান্টনমেন্টের ভেতরের রটনাটা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর থেকে যেমন শুনেছি তেমনি অন্য কয়েকজন সাংবাদিক বা লেখক শুভাকাঙ্ক্ষীর মুখ থেকেও শুনেছি। সম্পাদক মতিউর রহমানের নামে এরকম অপবাদ দেওয়াটা অকল্পনীয়। মতিউর রহমান নিজে যথেষ্ট সাহসী, বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ। কারো কাছ থেকে শুনে লেখার কোনো প্রয়োজন তার নেই। নিজের ব্যস্ততার জন্য আমি এরকম লেখালেখির দিকে মন দিতে পারিনি। কিন্তু এখন বাধ্য হয়ে দিতে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে কাদম্বিনী মরে প্রমাণ করেছিল সে প্রথমে মরে নাই। আমিও মনে করলাম, নিজ নামে লিখে অবস্থান পরিষ্কার করাটাই শ্রেয়।



www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় কারণ হচ্ছে, সেনাপ্রধানের নিযুক্তি নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত অফিসারগণের মধ্যেও কৌতূহল ও জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই। সেনাপ্রধানের কর্মকাণ্ড বা নীতিমালা বা বক্তব্য দেশবাসীর সঙ্গে সঙ্গে অবসরপ্রাপ্তগণকেও এফেক্ট করে। ঢাকা মহানগরীর উত্তরাংশে নবগঠিত কাফরুল থানা এলাকার মহাখালীতে একটি ক্লাব আছে। নাম রাওয়া (আরএওডব্লিউও) ক্লাব। এটির সদস্য সংখ্যা ৮০০-র বেশি। সবাই সামরিক বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আমার নিজস্ব ক্রমিক নম্বর ৭৯৬। জীবিত অন্তত ৫০ জন মেজর জেনারেল র‍্যাঙ্কের অফিসার, ১৩০ জন ব্রিগেডিয়ার র‍্যাঙ্কের অফিসার ও ২ শতাধিক কর্নেল বা লে. কর্নেল র‍্যাঙ্কের অফিসার ঢাকা মহানগরীতে অবসর জীবনে বিবিধ কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত আছেন। তাদের প্রত্যেকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যদি তিনজন করে হয় তাহলে প্রায় ১ হাজার ২০০ জন বার্তা প্রাপকের কাজ করতে পারে। সেনাবাহিনী নিয়ে আলাপ-আলোচনা, আড্ডা, গল্প এখন আর কোনো প্রকারের ভয়ের বা আশঙ্কার বা লজ্জার কাজ নয়। ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে হাজারো বেসামরিক ব্যক্তি বিবিধ কাজে যাওয়া-আসা করেন। সেনাবাহিনীর সঙ্গে কয়েক রকমের ব্যবসায় কয়েকশ ব্যক্তি জড়িত আছেন, যাদের মধ্যে মুখ্য হচ্ছেন গম ক্রেতা ব্যবসায়ী ও এমইএসের সম্মানিত ছোট-বড় নির্মাণ কন্ট্রাক্টরগণ। ঢাকার বাইরে অন্যান্য সেনানিবাসেও একই পরিস্থিতি, যদিও ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম। এ ধরনের সম্মানিত ব্যবসায়ীদের বহু ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পর্যায়ের সামরিক অফিসারদের বাসস্থানেও যাতায়াত আছে। ব্যবসায়ীগণ সেনাবাহিনীর অনেক কনফিডেন্সিয়াল বা গোপনীয় তথ্য জানেন যেগুলো বহু দায়িত্বশীল অফিসারও জানেন না। এ কথাটি, লিখিত-পড়িতভাবে প্রমাণ করা মুশকিল, কিন্তু এটাই বাস্তব।

অন্তত ২০ হাজার অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক বাংলাদেশে বর্তমানে বসবাস করছেন। তারাও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আধার। কারণ সৈনিকগণ সবচেয়ে ভালো জানে তাদের উপরস্থ অফিসার কে কেমন। এছাড়াও বিগত ঠিক চার বছরে সেনাবাহিনী সম্পর্কে ভোরের কাগজ, আজকের কাগজ, সংবাদ, জনকণ্ঠ, ইনকিলাব ও প্রথম আলো পত্রিকায় এতকিছু লেখালেখি হয়েছে যে, পত্রিকা পাঠকগণ '৯৬-এর পূর্বের ২৬ বছরে যা না জেনেছেন গত চার বছরে তার থেকে বেশি জেনেছেন। চার বছর আগে জনাব মতিউর রহমান ভোরের কাগজ পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক ছিলেন। এখন থেকে ৫০ মাস আগে ভোরের কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় তিনি মন্তব্য প্রতিবেদন লিখেছিলেন, 'আইএসপিআর-এর এই হুমকি কেন'? দিনে দিনে তথ্যপ্রবাহের স্বাধীনতা ও মাত্রা বাড়ছে। বর্তমানের অর্থাৎ সপ্তম পার্লামেন্টের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটিতে বাহিনী প্রধানগণ সশরীরে উপস্থিত হয়ে অনেক বিষয়ে জবাবদিহিতা করছেন। এসব কিছুই পাঁচ বছর আগেও অভাবনীয় ছিল। আমাদের সবাইকেই পরিবর্তনশীল অবস্থা ও মানসিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে। এমনকি প্রতিবেশী পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে যে শাসন চলছে সেটার সত্যিকার নাম 'মার্শাল ল' এবং যিনি শাসন করছেন তিনি সুনিশ্চিতভাবেই জেনারেল আইয়ুব খান, জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও জেনারেল জিয়াউল



www.nagorikpathagar.org

হকের পদাঙ্ক অনুসরণকারী প্রধান সামারিক আইন প্রশাসক। কিন্তু বিশ্বের বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য, পরিবর্তিত বিশ্ব কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তিনি নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে প্রকাশ করেননি। তিনি নিজেকে প্রধান নির্বাহী হিসেবে পরিচয় দেন। পরিবর্তনশীল বাস্তবতাকে চিহ্নিত করতেও মেধা লাগে এবং স্বীকার করে নিতে মেধা ও সাহস উভয়ই লাগে।

সেনাবাহিনীতে ১০/২০ বছর আগে অন্তত দুজন মেজর জেনারেল র‍্যাঙ্কের অফিসারের কথা জানি যারা মিরপুর স্টাফ কলেজে প্রশিক্ষণার্থীগণের জন্য মাস্টার্স ডিগ্রি প্রোগ্রামের পরোক্ষ বিরোধিতা করেছিলেন। তাদের মনের কথা ছিল, আর্মি অফিসার এত লেখাপড়া করে কি করবে? আর আজকে ওই মিরপুর সেনানিবাসেই এমআইএসটি বা মিলিটারি ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পড়ালেখা হচ্ছে। মেয়েদের অফিসার হিসেবে নেয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সরকারি ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাইভেট ইনস্টিটিউটে অন্তত ৫০ জন সামরিক অফিসার বিবিএ বা এমবিএ পড়ছেন। নৌবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কনিষ্ঠ অফিসার এবং সেনাবাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত কনিষ্ঠ অফিসার সরেজমিন পেশাগত সাংবাদিকতা করছেন। এগুলো সবই বাস্তবতা।

সম্মানিত সম্পাদক মতিউর রহমান হঠাৎ করে তার মন্তব্য প্রতিবেদন কেন লিখলেন, তিনি এবং তার অন্তর্যামী তা ভালো জানবেন। তবে লেখাটি সময়োপযোগী হয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

জনাব আবেদ খান ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত তার কলামের তৃতীয় অনুচ্ছেদে লিখেছেন, 'কিন্তু আমরা যদি বিষয়টিকে অন্য আরেকটা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি তাহলে দেখব, এমন একটা সময়ে এই নিবন্ধটি (অর্থাৎ মতিউর রহমানের নিবন্ধটি) প্রকাশিত হলো যখন.....।' জনাব আবেদ খান সময়ের পাঁচটি আঙ্গিক ব্যাখ্যা করেছেন। একটি আঙ্গিক ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়ই হোক উল্লিখিত হয়নি যখন সেনাপ্রধান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটিতে এমন একটা কথা বলেছেন বলে কথিত, যেটি নিয়ে সকলে খুব আতঙ্কিত ও আশঙ্কিত ছিলেন। ১৯৮১ সালের মে মাসে চট্টগ্রাম সেনা বিদ্রোহের কোর্ট মার্শাল সম্পর্কিত কাগজপত্র সংসদীয় কমিটি দেখতে পারবে কি পারবে না এটা নিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মুস্তাফিজের একটা কথিত মন্তব্য তোলপাড় সৃষ্টির সূত্রপাতকারী। ওই মন্তব্যটি যে মতিউর রহমানকে লিখতে উৎসাহ যোগায়নি, তা কে বলবে?

সেনাপ্রধানের কথিত বক্তব্য সম্পর্কিত ঘটনাটি উল্লেখ করছি। সোমবার ৪ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখের সকল প্রধান দৈনিক পত্রিকায় একটা খবর ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিতে একটি আলোচনা করা বা ঘটনা। একটি দৈনিকের হেড লাইন ছিল : 'জেনারেলরা যা করেন তা ঠিকই করেন'-সেনাবাহিনী প্রধান এবং 'সেনা



www.nagorikpathagar.org

প্রধানের বক্তব্য ঔদ্ধত্যপূর্ণ'-কর্নেল শওকত। কর্নেল শওকত ১৯৬৮-৬৯ সালের বিখ্যাত আগরতলা মামলার একজন আসামি। ক্যাপ্টেন র‍্যাঙ্কে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে ওই মামলার কারণে চাকরি হারান। একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। একজন স্থিতিশীল আওয়ামী লীগার এবং কয়েক দফা সংসদ সদস্য। অপরদিকে জেনারেল মুস্তাফিজও একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা, বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকারের অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি। তাহলে সাংসদ শওকত এবং সেনা প্রধানের মধ্যে মতপার্থক্যটা কি নিয়ে? পত্রিকাসমূহের ভাষ্য মোতাবেক সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর '৮১ সালের কোর্ট মার্শালের বিবরণী বা প্রসিডিংস সংসদীয় কমিটিকে দেখাবে না। পত্রিকাসমূহের ভাষ্য অনুযায়ী সেনাপ্রধান কমিটিকে বলেন, 'রাষ্ট্রপতি চাইলেও এ কাগজ দেখাতে পারব না। সেনাবাহিনীর জেনারেলরা যা করেন তা ঠিকই করেন। সেনাপ্রধান যদি এ কথা বলে থাকেন, তাহলে আমার মনে হয় সংসদীয় কমিটিতে আলোচনা চলাকালে একটি উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে উচ্চারিত এটি একটি উত্তপ্ত বাক্য, যেটি বস্তুগতভাবে সঠিক নয়। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে সেনা সদর থেকে দেয়া একটি ব্যাখ্যা সকল প্রধান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি আরো কিছু মন্তব্য নিবন্ধের শেষ পর্যায়ে করব।

জনাব মতিউর রহমান ও জনাব আবেদ খান উভয়েই অনেক কথা লিখেছেন। এ দুজনের কলাম পড়ে অনেকগুলো অস্বাভাবিক তথ্য জানা যায়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে জেনারেল মুস্তাফিজসহ আটজন সেনাপ্রধান হয়েছেন। '৭২-এর এপ্রিল জেনারেল শফিউল্লাহ্ প্রথম সেনা প্রধান হন। পরিস্থিতি ছিল স্বাভাবিক, সিদ্ধান্ত ছিল অস্বাভাবিক, কারণ জেনারেল জিয়াউর রহমান শফিউল্লার সিনিয়র ছিলেন। '৭৫-এর ২৪ কিংবা ২৫ আগস্টে আধা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক আদেশে জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান হন। '৭৫-এর নভেম্বর অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তথা সেনা বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে জিয়াউর রহমান বন্দী হন এবং আপাতত পদচ্যুত হন। অধিকতর অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তথা সিপাহী-জনতার বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে ৭ নভেম্বর তারিখে জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধানের পদ ফিরে পান। ৭ নভেম্বরের মতো পরিস্থিতি যেন আর না হয় সেটা কামনা করেই বলতে হয় যে, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত নিলে মানানো যায়, অন্যথায় নয়। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক নিয়মে '৭৮-এ জেনারেল এরশাদ সেনাপ্রধান হন। তিনি সেনাপ্রধান থাকাকালে প্রেসেডেন্ট জিয়া নিহত হন এবং তিনি ২৪ মার্চ '৮২-তে সামরিক আইন জারি করেন। কয়েক বছর নিজের এক্সটেনশন নিজের আদেশেই নেওয়ার পর তিনি স্বাভাবিক নিয়মে ও পরিস্থিতিতে জেনারেল আতিককে সেনাপ্রধান করেন। জেনারেল আতিকের পর স্বাভাবিক নিয়মে ও পরিস্থিতিতে জেনারেল নূরউদ্দীন সেনাপ্রধান হন। স্বাভাবিক নিয়মে ও পরিস্থিতিতে '৯৪-এর আগস্টের শেষ দিনে জেনারেল নাসিম সেনাপ্রধান হন। স্বাভাবিকতার এখানেই শেষ। সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম নিজের বুদ্ধিতে, কোনো না কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মাথায় রেখে তৎকালীন মেজর



www.nagorikpathagar.org

জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে চাকুরিতে এক্সটেনশন দেয়ার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সুপারিশ গ্রহণ করেন। ১২ মাস পর প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহ ছিল মাহবুবুর রহমান পুনরায় এক্সটেনশন পাক, কিন্তু সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম সুপারিশ করতে আগ্রহী ছিলেন না। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির চাপে নাসিম সুপারিশ করেন। চিঠি লিখে বা গেজেট নোটিফিকেশন করে কেউ কোনো দিন দেশবাসীকে জানাবে না যে কেন জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে এক্সটেনশন দিয়ে রাখা হয়েছিল। তবে অনুমান করা যায় যে, তিনি ওই আমলের সরকারের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও অনুগত ছিলেন এবং আপদে-বিপদে সরকারের পাশে দাঁড়াবেন এই ভরসাতেই তাকে এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছিল। ওই সময়ই সেনাবাহিনীতে এই কাজটি মন্দ কাজ হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং এই মন্দ কাজটি যাঁরা করেন তাঁরা নীরব সমালোচনার পাত্র হন। মাহবুবুর রহমানের ঘটনাকে প্রিসিডেন্স বা অগ্রবর্তী উদাহরণ মনে করেই হয়তো-বা বর্তমান সরকারের আমলে জেনারেল মুস্তাফিজকে নরমাল এক্সটেনশন না দিয়ে অ্যাবনরমাল এক্সটেনশন দিয়ে সেনাপ্রধান করা হয়। যা হোক, সেনা প্রধানগণের বিদায় সম্পর্কে যা বলছিলাম।

২০ মে '৯৬ তারিখে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিমকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি তাকে চাকরি ও পদচ্যুত করেন এবং গ্রেপ্তার করেন। একজন সেনা প্রধানের জন্য ইতিহাসে এটাই ছিল সবচেয়ে নির্মম অস্বাভাবিক বিদায়। এরূপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জেনারেল মাহবুবুর রহমান সেনাপ্রধান হন। তার পুরো নিযুক্তিটাই অস্বাভাবিক তথাপি একটা স্বাভাবিক নিয়মে তিনি '৯৭-এর ডিসেম্বরে বাড়ি যান। একটি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সর্বতোভাবে পরিহার্য এবং অকাম্য একটি অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় জেনারেল মুস্তাফিজ সেনাপ্রধান হন। জেনারেল মাহবুবের ক্ষেত্রে যেমন, ঠিক তেমনি জেনারেল মুস্তাফিজের ক্ষেত্রে সেনাপ্রধানের নিয়োগ অস্বাভাবিক। অফিসারগণ নিশ্চয় এক্সটেনশন পাওয়ার জন্য বা এক্সটেনশনকালীন সেনাপ্রধান হওয়ার জন্য আবেদন করেনি। '৯৪ এবং '৯৫-এ গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার জেনারেল মাহবুবকে এক্সটেনশন দিয়ে '৯৬-এ সেনাপ্রধান হওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। ১৯৯৭-এ আরেকটি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকার জেনারেল মুস্তাফিজকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে সেনাপ্রধান বানান। উভয় ক্ষেত্রে সরকার দায়ী। ২৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত জনাব আবেদ খানের কলামের একদম শেষ অংশে জেনারেল মুস্তাফিজের নিযুক্তির অনুকূলে যে যুক্তি দেওয়া হয়েছে সেটা আবেগদীপ্ত মানসিকতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু যুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মনে করুন আগামী সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যতীত অন্য কেউ....তাহলে সেই আগামী প্রধানমন্ত্রীও কি নীতি ও যুক্তি বাদ দিয়ে একমাত্র নিজের নিরাপত্তা দিক খেয়াল করে '৯৮ বা '৯৯ সালে অবসরে যাওয়া কাউকে ডেকে এনে সেনাবাহিনীর প্রধান বানাবেন? '৭৫ সালে সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে



www.nagorikpathagar.org

বিদ্রোহ করেননি, '৮১ সালেও সেনাপ্রধান এরশাদ শহীদ জিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি। বিদ্রোহ করেছেন কনিষ্ঠরা। ব্যক্তি জেনারেল মাহবুব বা ব্যক্তি জেনারেল মুস্তাফিজ জ্যেষ্ঠ অফিসার হিসেবে সম্মানিত এবং সম্মানিয়া। এই কলামে বা অন্যত্র ব্যক্তিগত সমালোচনার কোনো গন্ধ যেন কেউ না খোঁজেন সেই বিনীত অনুরোধ করব। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য এখন স্বাভাবিক নিয়মে একজন সেনাপ্রধান নিয়োগ সকলেরই আন্তরিক কামনা বলে মনে হয়। বাংলাদেশী সমাজের বেশির ভাগ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেখানে দুর্নীতি ও অসততায় নিমজ্জিত সেখানে সেনাবাহিনীর মাথাস্বরূপ তথা প্রধান হিসেবে এমন একজন ব্যক্তি পাওয়া প্রয়োজন যিনি জ্যেষ্ঠতা, পেশাগত দক্ষতা ও সততার সংমিশ্রণে সকলের নিকট প্রিয় হবেন।

'৯৭-এর ডিসেম্বরে ফেরত যাই। যদি কেউ বলে যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী স্বাভাবিকভাবে চাকরিরত মেজর জেনারেলগণের মধ্যে সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত কোনো মেজর জেনারেল নেই, তাহলে সেনাবাহিনীর প্রতি অত্যন্ত নির্দয় ব্যবহার করা হবে এবং চাকরিরত জ্যেষ্ঠ মেজর জেনারেলগণের সততা, মেধা ও আনুগত্যের প্রতি অসম্মান করা হবে। '৯৭-এর ডিসেম্বর ঠিক এ কাজটিই হয়েছিল। আমার আবেদন, এরকমটি যেন আর না হয়। একান্তভাবেই মেধা তথা দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা ও সততা এ তিনটি আঙ্গিকের ওপর ভিত্তি করেই যেন সেনাপ্রধান নিয়োগ হয়। অতীতের উদাহরণ দিয়ে যেন অনিয়মিত কাজ আর না হয়।

বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর রাজনীতিকরণ নিয়ে সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান এবং কলামিস্ট জনাব আবেদ খান উভয়েই বক্তব্য রেখেছেন। ৩০টি বছর ধরে এটি চলছে। বাংলাদেশে সব মন্দ জিনিসের যেমন প্রবৃদ্ধি হয়েছে এটিরও প্রবৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু এটা কি চলতে দেওয়া উচিত? আমার মতে কখনই না। ঘনবসতিপূর্ণ সেনানিবাসগুলোকে বা সেনাসদস্যগণকে বৃহত্তম নাগরিক জীবন থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা যাবে না। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব দূরে রাখতে হবে। এখনকার আমলের কনিষ্ঠ অফিসাররা আগের তুলনায় বহুগুণে বেশি পেশাদারিত্বের প্রতি আগ্রহী। অফিসাররা এখন একাধিক পত্রিকা পড়ে, ম্যাগাজিন পড়ে এবং ডজনে ডজনে বিভিন্ন কর্তব্যে বিদেশে যায়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অন্তত ৮০০ অফিসার এ পর্যন্ত জাতিসংঘ মিশনে বা কুয়েত বা সৌদি আরবে বা উচ্চতর প্রশিক্ষণে বিদেশ গিয়েছেন। উন্নত বিশ্বের মানসিকতা ও পরিবেশের সঙ্গে তাদের যে ইন্টার-অ্যাকশন, তার একটা প্রভাব তাদের পেশাগত চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়তে বাধ্য। তারা বর্তমানে বৈষয়িক স্থিতিশীলতার প্রতি আগ্রহী এবং রাজনীতিকরণের প্রতি অনাগ্রহী। রাজনীতির প্রতি অনাগ্রহী হলেও তারা রাজনীতি সচেতন। আইন করে রাজনৈতিক আলাপ নিষিদ্ধ করা যাবে বা কোনো সরকারের আমলে কোনো পত্রিকাকে সেনানিবাসে অঘোষিত নিষিদ্ধ করা যাবে কিন্তু অফিসারগণের মন বা মস্তিষ্কের মধ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে চিন্তা করা বা মত গঠন নিষিদ্ধ করা অসম্ভব। এখন থেকে ৮/১০ দিন



www.nagorikpathagar.org

আগের ঘটনাটাই খেয়াল করুন। ঢাকা শহরের ভদ্র এলাকা সার্কিট হাউস রোডে একজন পুলিশ সদস্য কর্তৃক একজন অফিসার (মেজর)-এর স্ত্রীর সঙ্গে সাংঘাতিক অশোভন আচরণের প্রেক্ষাপটে, পরের দিনের পত্রিকার ভাষ্যমতে সিভিল পোশাকে একজন অফিসার ওই রাত্রি বেলাতেই রমনা থানায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। লক্ষণটা ফেলে দেয়ার মতো না।

১৯৯৬ সালের মে মাসের ২০ তারিখের পর থেকে সেনাবাহিনীতে অফিসারগণের মনমানসিকতায় বিবিধ পরিবর্তন এসেছে, যেগুলো তার আগের ২৪ বছরে আসেনি। সেনাবাহিনীর ইতিহাসের প্রথম ১০/১৫ বছর মুক্তিযোদ্ধা ও পাকিস্তান প্রত্যাগতদের প্রভাবে অফিসারগণের মধ্যে মানসিক বিভক্তি ছিল। '৮২-তে মার্শাল ল' আসার পর রাজনীতিকরণ গতি পায়। এটি বন্ধ করা প্রয়োজন। যেকোনো মূল্যে বন্ধ করা প্রয়োজন।

আগামী বছর সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ বা দায়িত্বশীল পদগুলোতে বিভিন্ন অফিসারকে নিয়োগ দেওয়া হবে এমন অনুমান একদম উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর কারণ মাত্র একটাই। আজ পর্যন্ত বিগত ৩০ বছরের প্রতিটি সরকারই যেহেতু প্রশাসনে এরূপ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন সেহেতু ভবিষ্যতেও যে হবে না সেটা কেমনে বলি। এমনিতেই, আগামী বছর অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা-আশঙ্কা ইত্যাদির শেষ নেই। বহু বিদগ্ধজনকে বলতে শুনেছি যে, আগামী নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হবে। বারিধারা বা গুলশানের বড়, মেজ, সেজ সর্বস্তরের কূটনীতিকগণের বাসায়ও এ প্রসঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে তার আলামত মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়। বাংলাদেশকে যারা বৈদেশিক সাহায্য দেয় সেসব দেশ বা সংস্থাও আগামী নির্বাচনের প্রতি দৃষ্টি রাখছে। বহু পত্রপত্রিকায় বহু কলামিস্ট লিখেছেন যে, বিদ্যমান ও ক্রমশ অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এবং প্রধান রাজনৈতিক শিবিরসমূহের মধ্যে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রেক্ষাপটে আগাগী নির্বাচনের ফলাফল অস্বাভাবিক রকমের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এছাড়া আমাদের প্রতিবেশী অন্তত দুটি দেশ দুটি ভিন্নমুখী নির্বাচনী ফলাফলের প্রতি আগ্রহী বলে মনে হয়। এরূপ জটিল পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে, ভবিষ্যতের কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের পক্ষেও স্বচ্ছ ও সময়মতো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হবে কি না এ প্রশ্নটিও আলোচনায় এসেছে। আমি যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেটির উদ্যোগে ১১ মার্চ ও ৩রা আগস্ট ২০০০ তারিখে দুটি ভিন্ন আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'আগামী নির্বাচনকালে নিরাপত্তার উন্নয়ন'। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা অপরিহার্যভাবেই এসে পড়ে। সেনাবাহিনী থেকে কী উপকার/সেবা নেওয়া যায় সেটি হচ্ছে প্রকাশ্য গবেষণার বস্তু। সাধারণভাবে সেনা সদস্যগণ এখনো রাজনৈতিকভাবে নির্দলীয় মনোভাবাপন্ন। কিন্তু সেনাপ্রধানের নিয়োগ



www.nagorikpathagar.org

বা অন্যান্য জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণের নিয়োগ-বদলির মাধ্যমে যদি কোনো দলের পক্ষীয় বা বিপক্ষীয় মনোভাব প্রকাশিত হয় বা উদ্ভাসিত হয় তাহলে সেটা সেনাবাহিনী ও জাতির জন্য ক্ষতিকারক হবে। এ কথাটি মনে রেখেই সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান সেনাপ্রধানের ভবিষ্যৎ নিযুক্তি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বলে আমার মনে হয়। '৭৫-এর আগস্ট, নভেম্বর, '৮১-এর মে, '৮২-এর মার্চ বা '৯৬-এর মে মাসের মতো কোনো পরিস্থিতি যেন সৃষ্টি না হয় সেটি আমাদের একান্ত কামনা।

লিখতে যখন বসলামই তখন সেনাবাহিনী সম্পর্কিত আরো একটি বিষয়ে না লিখলেই নয়। এটি হচ্ছে সেনাবাহিনী আইনকে অর্থাৎ বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্টকে যুগোপযোগী করা। এ বিষয়ে ১৯৯৬ সালের ২০ মের পূর্বে বলাবলি হয়েছে বলে শুনিনি বা লেখালেখি হয়েছে বলে দেখিওনি।

২০ মে '৯৬-এর ঘটনার প্রেক্ষাপটে আমি বাধ্যতামূলকভাবে অবসর পাই। এরকম বাধ্যতামূলক অবসর আমার আগেও ডজনকে ডজন অফিসার পেয়েছে এবং আমার পরেও ডজনের কাছাকাছি পেয়েছে। আমার বা আমার সঙ্গে আরা ১০/১২ জনের বাধ্যতামূলক অবসরগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট রুলস গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, এ লঙ্ঘনের প্রতিবাদ করা প্রয়োজন। আমার এ কর্মকাণ্ডের সমালোচনাও হলো। সমালোচকদের বক্তব্য হচ্ছে, জেনারেল ইবরাহিম এখন এত কথা বলছেন, কিন্তু আর্মিতে থাকা অবস্থায় কিছু বলেননি কেন? এর উত্তর হচ্ছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে গঠনমূলক সমালোচনার ইতিহাস অত্যন্ত নবীন ও প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বলতে গেলে প্রায় অসম্ভব। সুতরাং সেনাবাহিনীতে থাকা অবস্থায় প্রতিবাদের অবকাশ প্রায় অনুপস্থিত। অবসর জীবনে প্রতিবাদের অন্যতম কারণ, ভবিষ্যতে এরূপ লঙ্ঘন ও অনিময়, অন্যায় যেন আর না হয়। '৯৮ সালের মে মাসের ৯ তারিখ ঢাকা মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে প্রেসক্লাবের পাশে অবস্থিত সিরডাপ মিলনায়তনে একটি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হয়েছিল। অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান রচনাটি আমি উপস্থাপন করেছিলাম। ১০ মে '৯৮ তারিখের যেকোনো দৈনিক পত্রিকা খুললে এ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পাওয়া যাবে। তিন-চার দিন পর, শুক্রবারে, পুরো রচনাটি ঢাকার অন্যতম প্রধান ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারে ছাপানো হয়। দৈনিক সংবাদ এবং দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায়ও পুরো রচনা ছাপানো হয়।

আজকের এই কলামে বিস্তারিত না বলে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, আমার বলা আমি শেষ করিনি। এখনো বলছি, ভবিষ্যতেও বলব। আলোচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে : ১. বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, সেনাবাহিনী আইন তথা বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট মোতাবেক চলার কথা কিন্তু চলছে কিনা এটা তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ও স্তর কোথায় তা নিরূপণ করতে হবে এবং নিরূপণের পর বাস্তবায়ন করতে হবে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখের প্রধান দৈনিকসমূহে সেনা সদরের একটা বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৮১



www.nagorikpathagar.org

সালে তৎকালীন সেবাবাহিনীর প্রধান কোর্ট মার্শালের বিবরণী বা প্রসিডিংস সুনিশ্চিত বা কনফার্ম করেছিলেন। ১৯ বছর পর এখনো স্মৃতিতে যতটুকু আছে ততটুকুর বরাত দিয়ে বলতে পারি যে, ওই কোর্ট মার্শাল চলাকালে আইনের বিধানের ব্যতিক্রম হয়েছিল। কোর্ট মার্শাল অস্বাভাবিকভাবে হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। সেনাপ্রধান কনফার্ম করার সময় এই সকল ব্যত্যয় ধরা উচিত ছিল কিন্তু তিনি ধরেননি। কঠিন প্রশ্নটি হলো, তিনি যে ধরেননি এই কথাটি কোথায় প্রমাণিত হবে? এই নালিশটা কার কাছে দেয়া যাবে? উত্তরগুলো বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট বা বাংলাদেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে দেয়া নেই। আরেকটি উদাহরণ। '৯৬ সালের মে মাসের ২০ তারিখে রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস ও সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিমের মধ্যকার দ্বন্দ্বজনিত বিপদসঙ্কুল ঘটনার পর সেনাবাহিনীতে একটি তদন্ত আদালত বা কোর্ট অফ ইনকোয়ারি হয়। ঘটনা ঘটেছে, আইন ও নিয়ম মোতাবেক তদন্ত হবে এবং দোষী হলে শাস্তি হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তদন্তের জন্য প্রযোজ্য সেনাবাহিনীর আইনের বিধান যদি প্রকাশ্যে দুজন মেজর জেনারেল এবং একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল (সেনাপ্রধান) কর্তৃক লঙ্ঘন করা হয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কোন নিয়মে কার কাছে এর প্রতিকার চাইতে পারে সেটি সেনাবাহিনী আইন বা সংবিধান কোনোটিতেই সুস্পষ্টভাবে দেয়া নেই। চার বছর ধরে বলছি এবং ভবিষ্যতেও বলব যে, আমাদের আর্মি অ্যাক্টকে যুগের উপযোগী করতে হবে।

২. বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই সামরিক বাহিনীর সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু সামরিক বাহিনীসমূহের নিজস্ব আইনেই থাকা আর্মি অ্যাক্টেই সেনাবাহিনীর সদস্যগণের জন্য কিছু মৌলিক অধিকার দেয়া আছে। এই আর্মি অ্যাক্টে বর্ণিত মৌলিক অধিকার যদি লঙ্ঘিত হয় তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত একজন সেনাসদস্য প্রতিকারের জন্য সর্বশেষ ধাপে কার কাছে বা কোনখানে যেতে পারবে এ বিষয়টি আর্মি অ্যাক্টে অস্পষ্ট, বাংলাদেশের সংবিধানে এবং এ প্রসঙ্গে অধুনা প্রদত্ত ব্যাখ্যাগুলো যুগের অনুপযোগী। অতএব এ বিষয়ে মনোযোগ দেয়া এবং আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কার আসা একান্ত জরুরি। হিমালয় পর্বত ডিঙানোর মতো কঠিন কোনো কাজ এটি নয়। উপযুক্ত সদিচ্ছা ও মানসিকতারই প্রয়োজন।

৩. জনগণের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত পার্লামেন্ট। সামরিক বাহিনী সম্পর্কে পার্লামেন্টের এখতিয়ার তথা সংসদীয় কমিটির এখতিয়ার নিয়ে অতি সম্প্রতি যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, পার্লামেন্ট কর্তৃকই আইনের সংস্কারের মাধ্যমে তার অবসান হওয়া উচিত। সামরিক বাহিনীসমূহকে কখনই রাষ্ট্রের কোনো অঙ্গের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ অবস্থানে যেতে দেয়া উচিত নয়। অর্থাৎ সংঘাত লাগতে পারে বা গুরুতর মতপার্থক্য হতে পারে এমন কোনো পরিস্থিতিই যেন সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা অতীব প্রয়োজন। অভ্যাস একদিনে হয় না, কিছুদিন ধরে গড়ে ওঠে।

দৈনিক প্রথম আলো ০৩/১০/২০০০ইং



www.nagorikpathagar.org

# সেনাবাহিনী আইন, '৮১-এর সেনা বিদ্রোহ ও সংসদীয় কমিটি

ইদানীংকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ১৯৮১ সালের সেনাবিদ্রোহ তথা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা ঘটনা ইত্যাদি পত্রিকাগুলোর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। ঘটনাটা কিন্তু হঠাৎ করে হয়নি। সেজন্য গোটা বিষয়ের প্রেক্ষাপটের বিবরণসহ মন্তব্য করতে চাই। দু'একটি বিষয় সাংঘাতিক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করেছে বলেও প্রতীয়মান হচ্ছে। যেমন, ১৯৮১ সালের কোর্ট মার্শালের রায় বাতিল সংক্রান্ত বা কোর্ট মার্শালের ডিফেন্ডিং অফিসারদের ভূমিকা সংক্রান্ত। এসব আলোচনার সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যদের মনোবল, সেনাবাহিনীর প্রতি জনগণের মনোভাব এবং সেনা নেতৃত্বের প্রতি জনগণের মনোভাব জড়িত বলে আলোচনা সতর্কভাবে করা প্রয়োজন।

এছাড়া যেহেতু পাঠক সমাজের একটি বৃহৎ অংশের জন্য এগুলো অজানা ইতিহাস সেহেতু নাতিদীর্ঘ প্রেক্ষাপট বিবৃত না করলে নিবন্ধটি সম্যকভাবে বোধগম্য হবে না।

প্রথমে ১৯৮১ সালের সেনাবিদ্রোহ সম্পর্কিত সাধারণ আলোচনা করব। এরপর ৩০ মে ১৯৮১-এর বিষয়টি কিভাবে বর্তমানের অর্থাৎ সপ্তম সংসদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে এল সে সম্পর্কে এবং শেষে বাংলাদেশের সংবিধান ও সেনাবাহিনীর আইনের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

## ১৯৮১ সালের ৩০ মে'র ঘটনা

ওই সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীরোত্তম। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান তথা চিফ অব আর্মি স্টাফ ছিলেন লেফট্যানেন্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। ওই সময় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে বিন্যস্ত ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের এরিয়া কমান্ডার ছিলেন মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আবুল মঞ্জুর, বীরোত্তম। ১৯৭১ সালে মঞ্জুর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভিজাত সংগঠন বা ফরমেশন একমাত্র প্যারাসুট ব্রিগেড (সংক্ষেপে প্যারা ব্রিগেড)-এর প্রধান অপারেশনাল স্টাফ অফিসার বা ব্রিগেড মেজর ছিলেন। ১৯৭১-এর জুলাই-আগস্ট তিনি আরও কয়েকজনের সঙ্গে মিলে সপরিবারে পাকিস্তান থেকে পলায়ন করেন। অনেক কষ্ট স্বীকার করে তিনি শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের কাছে পৌঁছতে পারেন। আসামাত্রই বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তের রণাঙ্গনে অন্যতম সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত হন। স্বাধীন বাংলাদেশে কর্নেল মঞ্জুর যশোর সেনানিবাসে প্রথম ব্রিগেড কমান্ডার ছিলেন। ৭২-এর শেষদিকে তাঁকে নতুন দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রথম ডিফেন্স অ্যাটাশে হিসাবে নিযুক্ত



www.nagorikpathagar.org

করা হয়। ১৯৭৫ সালের নভেম্বরের পর ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর সেনাবাহিনীর সদর দফতরে চিফ অব দি জেনারেল স্টাফ বা সিজিএস নিযুক্ত হন।

উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম ৮দিন উত্তপ্ত ঘটনায় উত্তাল ছিল। ৩ নভেম্বর তৎকালীন সেনাবাহিনীর চিফ অব দি জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে খন্দকার মুশতাক আহম্মদ সরকারের বিরুদ্ধে একটি সামরিক ক্যু হয়। ক্যু সংঘটিত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মাথায় (সঠিক হোক বেঠিক হোক) এটি একটি ভারতপন্থী ক্যু হিসেবে অনেকের কাছে চিহ্নিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ৬ নভেম্বর দিবাগত রাত ১২টা পর সত্য সত্যই একটি সেনা বিদ্রোহ শুরু হয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সিপাহী-জনতার বিপ্লবে রূপ নেয়। ৪দিনের মাথায় নতুন দিল্লি থেকে ঢাকায় ফেরৎ আনা হয় জেনারেল মঞ্জুরকে।

এ বর্ণনা দেয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পরোক্ষভাবে বলা যে, তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান তথা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক তথা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের সঙ্গে জেনারেল মঞ্জুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ১৯৮১ সালের মে মাসের ২৯ তারিখ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, বীরোত্তম চট্টগ্রামে যান এবং প্রতিবারের মতো সেবারও শহরের কেন্দ্রস্থলে স্টেডিয়ামের পাশে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত সার্কিট হাউজে রাত্রিযাপনের জন্য ওঠেন। ২৯ তারিখ দিবাগত রাত তথা ৩০ মে ১৯৮১ সালের ভোররাতে চট্টগ্রামে সেনানিবাসে অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা এবং লক্ষণ পর্যালোচনা করে ঢাকার সবাই এটাকে বিদ্রোহ বলে। অর্থাৎ ১৯৮১ সালের মে মাসের ৩০ তারিখে চট্টগ্রামে একটা সেনাবিদ্রোহ ঘটে। বিদ্রোহ চলাকালে কোন এক সময় কোন একজনের বা একাধিক সেনা অফিসারের গুলিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সার্কিট হাউজে তার রুমের দরজাতে নিহত হন। ফলে ওই সেনাবিদ্রোহ এবং রাষ্ট্রপতি হত্যার ঘটনা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়।

চট্টগ্রামের ওই সেনাবিদ্রোহের পুঙ্খানুপুঙ্খ সঠিক ইতিহাস আজ পর্যন্ত রচিত হয়নি। এবং রচনা করা অসম্ভব। কারণ ঘটনার অন্তত ৩ জন সম্ভাব্য হোতা ঘটনার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই নিহত হন। এই ৩ জনের হত্যার ঘটনাও পরিকল্পিত বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। তৎকালীন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের লেফট্যানেন্ট কর্নেল মতিউর রহমান এবং লেফট্যানেন্ট কর্নেল মেহবুবুর রহমান, উভয়েই ফটিকছড়ির জঙ্গলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পূর্ব মুহূর্তে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে একের প্রতি অন্যের ফায়ার করা গুলিতে নিহত হন। জিওসি মেজর জেনারেল মঞ্জুরকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে হত্যা করা হয়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক আরও পাঁচ-সাত জন অফিসার যারা ৩০ মে '৮১-এর প্রত্যুষে সৈন্য নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে তথা সার্কিট হউসে যান, তারাও মৃত্যুদণ্ড পেয়েছেন। অতএব এই ঘটনার সঠিক পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিহাস জানা অসম্ভব।

চট্টগ্রামে যে সেনাবিদ্রোহ হয়েছিল সে বিষয়ে ওই সময়ে কারও কোন দ্বিমত ছিল না এবং বোধকরি এখনও নেই। রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে অদৃশ্য কোন মানব বা



www.nagorikpathagar.org

অশরীরী কোন আত্মা বা অন্য কোন বস্তু এসে হত্যা করেননি। চট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে বের হয়ে যাওয়া একদল সেনা অফিসারই এ কাজটি করেছিল। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের সকালে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার ঘটনা যেমন সত্য তেমনই ৩০ মে ১৯৮১-এর প্রত্যুষে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার ঘটনাও সত্য। হত্যার ঘটনা যখন ঘটেছে তখন হত্যাকারী নিশ্চয়ই আছে। সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে হত্যাকারীকে চিহ্নিত করা ও দণ্ডিত করা। সেনাবিদ্রোহের প্রান্তিকলগ্নে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন। যে কোন হত্যাকাণ্ডে এক বা একাধিক জড়িত থাকে। যেমন, পরিকল্পনাকারী, উৎসাহদাতা, উস্কানিদাতা, যোগাড়-যন্ত্রকারী এবং বাস্তবায়নকারী। আপাতদৃষ্টিতে, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার সঙ্গে জড়িত এ ধরনের সবাইকেই চিহ্নিত করা হয়নি। বা দণ্ডিত করা হয়নি।

চট্টগ্রামে সেনাবিদ্রোহ ও রাষ্ট্রপতি হত্যা ঘটনার পর দু'টি ভিন্ন তদন্ত হয়। একটি তদন্তের (তদন্ত আদালত) প্রধান ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন মেজর জেনারেল। অপর তদন্তের প্রধান ছিলেন হাইকোর্টের একজন বিচারপতি। তদন্তের পর সঠিক বা বেঠিক (যেটিই হয়), অভিযুক্তদের বিচারের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইনের আওতায় একটি কোর্ট মার্শাল গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন প্রধান লেফটেনান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এটি গঠনের আদেশ দেন। এই কোর্ট মার্শাল চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত চট্টগ্রাম জেলা কারাগারের অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হয়। এই ধরনের কোর্ট মার্শাল চলাকালে অভিযুক্তদের আইনগত সহায়তা প্রদান বা তাদের পক্ষ সমর্থন করার বন্দোবস্ত আছে। অভিযুক্তদের সামনে দুটি বিকল্প ব্যবস্থা থাকে। একজন অভিযুক্ত একজন কাউনসেল (Counsel) অর্থাৎ বেসামরিক ব্যারিস্টার বা অ্যাডভোকেট অথবা ডিফেন্ডিং অফিসার নিযুক্ত করতে পারেন। ডিফেন্ডিং অফিসার চাকরিরত সেনা অফিসারদের মধ্য থেকেই নেয়া হয়। ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন কর্তৃপক্ষ অভিযুক্তদের কাউন্সেলের বদলে ডিফেন্ডিং অফিসার লাভের সুযোগ দেন। ২৯ জন অভিযুক্তের জন্য মোট তিনজন সেনাবাহিনীর অফিসারকে ডিফেন্ডিং অফিসার হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়।

ডিফেন্ডিং অফিসার কারা হবেন তা নির্ধারণের ব্যাপারে প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তি সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে চাহিদা জানান। কর্তৃপক্ষ মাত্র ৩ জনকে মনোনয়ন করেন। এই সংখ্যা অপ্রতুল ছিল।

ওই ডিফেন্ডিং অফিসাররা ছিলেন তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার আনোয়ার হোসেন (মেজর জেনারেল হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত), তৎকালীন কর্নেল মোহাম্মদ আইনুদ্দিন, বীরপ্রতীক (১৯৯৬ সালে মেজর জেনারেল র‍্যাঙ্কে বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত), তৎকালীন লেফট্যানেন্ট কর্নেল সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বীরপ্রতীক (১৯৯৬ সালের মেজর জেনারেল র‍্যাঙ্কে বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত)। ওই কোর্ট মার্শালে ডিফেন্ডিং অফিসারের কাজ সুনিশ্চিতভাবেই এই ছিল না যে, ৩০ মে তারিখের বিদ্রোহকে সমর্থন করা বা



www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রপতি হত্যাকে সমর্থন করা। যে কোন কোর্ট মার্শালে ডিফেন্ডিং অফিসারের কাজ কি সেটা আর্মি অ্যাক্ট ও আর্মি অ্যাক্ট রুলসে দেয়া আছে। তাদের কাজের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করা। এ কাজটি সন্দেহাতীতভাবে করা হয়নি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

তৎকালীন ডিফেন্ডিং অফিসারদের তিনজনই এখনও জীবিত আছেন। কোর্ট মার্শালের রায় মোতাবেক ১৩ জন অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড এবং ১০ জন অফিসারকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেয়া হয়। কয়েকজন অফিসার বেকসুর খালাস পান এবং একজন বা দু'জন দণ্ডপ্রাপ্ত হলেও পরবর্তীকালে আইনগতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দণ্ড থেকে রেহাই বা মার্জনা লাভ করেন বা দণ্ডের মেয়াদ কমানো হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮১ তারিখে বাংলাদেশের বিভিন্ন কারাগারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের দণ্ড কার্যকর করা হয়। যারা কারাদণ্ড পান তারা যথাযথ মেয়াদ বা হ্রাসকৃত মেয়াদ ভোগের পর মুক্ত হন। এই ঘটনায় যাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় তারা সবাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা।

সেনাবাহিনীর আইন মোতাবেক সেনাবিদ্রোহের সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দোষী সাব্যস্ত হলেই সাজা দেয়া যেতে পারে। অন্যথায় নয়। আলোচ্য কোর্ট মার্শালের বিচার প্রক্রিয়া ন্যায়ানুগ ও স্বচ্ছ ছিল কিনা সেটা দেখার দায়িত্ব তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধানের। আইন সেনাবাহিনী প্রধানের স্কন্ধে এই আস্থা বা বিশ্বাস ন্যস্ত করেছে। যদি এ বিশ্বাস রক্ষিত হয় তাহলে সেটা যেমন সবার চোখে ধরা পড়ে, তেমনি যদি রক্ষিত না হয় তাহলে সেটাও ধরা পড়তে বাধ্য।

এখন থেকে বেশ কয়েক বছর আগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তদের আত্মীয়-স্বজনরা এবং অন্য দণ্ড ভোগকারীরা একত্রিত হয়ে একটি স্মৃতি সংসদ করেন। ওই স্মৃতি সংসদের উদ্যোগে গত চার বা পাঁচ বছর যাবৎ প্রতিবছর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে একটা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অনেক বক্তা অনেক বক্তব্য প্রদান করে থাকেন।

যতদিন চাকরিতে ছিলাম ততদিন এসব আলোচনায় অংশগ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠেনি। অবসর গ্রহণের পর অবশ্যম্ভাবীভাবে এসব আলোচনায় আমার ডাক পড়ে। এসব আলোচনায় যোগ দেয়ার মানে এটা নয় যে, আমি সেনাবিদ্রোহ বা হত্যাকাণ্ড সমর্থন করছি। বরং তার অর্থ এই যে, সেনাবিদ্রোহের সব ধরনের দোষী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা এবং সাজা দেয়া ও নির্দোষদের রেহাই দেয়ার অব্যাহত আকুতিতে সুর মেলানো।

১৯৯৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর এরকম একটা আলোচনা সভা হয়েছিল। অন্যতম আলোচক ছিলেন প্রখ্যাত ভাষাসৈনিক অ্যাডভোকেট গাজীউল হক। তিনি আলোচনাকালে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন। যেটা অনেকেরই জানা ছিল না। সেটা পরের দিনের সংবাদপত্রে এসেছিল।

প্রত্যেক বছর এরকম আলোচনায় কোন না কোন নতুন তথ্য বের হয়ে আসে। আয়োজক সংসদের সভাপতি হচ্ছেন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অফিসার লেফট্যানেন্ট কর্নেল এম দেলোয়ার হোসেন, বীর প্রতীক, পিএসসি-এর স্ত্রী নূরজাহান দেলোয়ার (এককালে



www.nagorikpathagar.org

ক্যাডেট কলেজের অধ্যাপিকা)। ওই সংসদের সাধারণ সম্পাদক হচ্ছেন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা অফিসার মেজর মোহাম্মদ করিম। ১৯ বছর আগে যেদিন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কথা জানা গিয়েছিল সেইদিনেই চেষ্টা করা হয়েছিল বিষয়টির সাথে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টকে জড়িত করার। সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮ বছর পর ক্ষতিগ্রস্তরা সপ্তম সংসদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে সুবিচার চেয়ে আবেদন করেন। ওই আবেদনের প্রেক্ষাপটে সংসদীয় কমিটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন যে, তাদের কোন কোর্ট মার্শালের নথিপত্র ও বিবরণী দেখানো হয় না। সংসদীয় কমিটি বা তাদের প্রতিনিধি হিসাবে সংশ্লিষ্ট সাবকমিটি নথিপত্র পর্যালোচনা করতে চায়। পাঁচ-ছয় মাস যাবৎ এই নিয়ে টানাহেঁচড়া চলে। ৩ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বর্তমান সেনাবাহিনী প্রধান লেফট্যানেন্ট জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান বীরবিক্রমের সঙ্গে অন্তত তিনজন সদস্যের তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়। এর বিবরণ ৪ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে সকল দৈনিক সংবাদপত্রে আসে। আবার ৩ অক্টোবর ২০০০ তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে সেনাপ্রধান জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান তার বক্তব্য এবং মতামত সংশোধন করেন এবং কমিটির সঙ্গে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এর মধ্যে যে কয়েকটি কঠিন প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে,- প্রথম প্রশ্ন : কোর্ট মার্শালের নথিপত্র তলব ও পর্যালোচনা করার অধিকার সংসদীয় কমিটির আছে কিনা? থাকলে কতটা? দ্বিতীয় প্রশ্ন : ১৯৮১ সালের কোর্ট মার্শালের রায় বা কার্যবিবরণী কে বাতিল করতে পারে? বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্টের ১৩১ নং সেকশনে বলা আছে যে, কোর্ট মার্শালের রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কোন অভিযোগ থাকলে সে অভিযোগ কার কাছে করতে হবে। অভিযোগ জানানোর সর্বোচ্চ জায়গা হল সেনাপ্রধান এবং তার উপরে বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন ১৩২-এ বলা আছে যে, সরকার বা সেনাবাহিনী প্রধান কোর্ট মার্শালের কার্যবিবরণী বাতিল করতে পারেন দু'টি কারণে। যথা- ওই বিবরণী বেআইনি (Illegal) বা বৈষম্যমূলক (Unjust) হলে। বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন ১৩৩ মোতাবেক কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টসহ বাংলাদেশের কোন আদালতে কোন প্রকারের আপিল করা যাবে না। তৃতীয় প্রশ্ন : আইনের বাধার কারণেই যদি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা না যায় তাহলে ক্ষতিগ্রস্তরা শেষ পর্যন্ত কার কাছে নালিশ দিতে পারবে ? চতুর্থ প্রশ্ন : সংসদীয় কমিটির সুপারিশে যদি ১৯৮১ সালের কোর্ট মার্শালের রায় বাতিল করা হয়, তাহলে এই প্রবণতা কি সৃষ্টি হবে না যে, সব কোর্ট মার্শালের ক্ষতিগ্রস্তরাই আবেদন-জট (Appeal-jam) সৃষ্টি করবে? পঞ্চম এবং শেষ প্রশ্ন ; মনে করুন রায় বাতিল ঘোষিত হল, তাহলে ১৯৮১-এর মে মাসে সেনাবিদ্রোহ ও রাষ্ট্রপতি হত্যার বিচারের কি হবে ? এসব অতি জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের সংবিধানের ও সেনাবাহিনী আইনের কিছু ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করতেই হবে। অতএব সম্মানিত পাঠক নিজেই একটা মতামত গঠন করতে পারবেন যে, বিদ্যমান জটিল পরিস্থিতিতে কি করলে সবদিক দিয়ে ভাল হয়।



www.nagorikpathagar.org

সংবিধান, মৌলিক অধিকার ও সেনাসদস্যদের সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হচ্ছে আমাদের সংবিধান। এই সংবিধানের বাংলা এবং ইংরেজি ভাষ্য আছে। তবে বাংলা ভাষ্যই আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত। সংবিধানটি যাতে বোঝা, অনুসরণ করা সহজ হয় সেভাবেই বিন্যস্ত করা হয়েছে। সংবিধানে ১১টি ভাগ (ইংরেজিতে Part) এবং ৪টি তফসিল (ইংরেজিতে Schedule) রয়েছে। কোন কোন ভাগ একের অধিক অনুচ্ছেদ (ইংরেজিতে Chapter) সংবলিত। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত আছে মৌলিক অধিকার। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মোট ২৩টি আর্টিক্যাল বা অনুচ্ছেদ আছে। এর মধ্যে ৬টি আর্টিক্যাল বা অনুচ্ছেদ হচ্ছে ঘোষণামূলক (Declaration) বা ব্যতিক্রমমূলক (Exceptions) ও মার্জনামূলক (Indemnities)। বাকি ১৭টি আর্টিক্যাল বা অনুচ্ছেদ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত। সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদ বা আর্টিক্যাল এখানে হুবহু উদ্ধৃত করছি '৭। (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ : এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে। (২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল হইবে।' সংবিধানের তৃতীয় বিভাগের প্রথম অনুচ্ছেদ হল সংবিধানের ২৬ নং অনুচ্ছেদ। এটি একটি ঘোষণামূলক অনুচ্ছেদ। এটিও এখানে হুবহু উদ্ধৃত করছি।

'২৬। (১) এই ভাগের বিধানবলীর সহিত অসামঞ্জস্য সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই সংবিধান প্রবর্তন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। (২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোন আইন প্রণয়ন করিবে না, এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে। [(৩) সংবিধান দ্বিতীয় সংশোধন আইন, ১৯৭৩ (যাহা ১৯৭৩ সালে ২৪ নং আইন,..এর দুই ধারা বলে এই (৩) দফা সংযোজিত, যাহা ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।] (৩) সংবিধানে ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।'

আমরা সংবিধানের তৃতীয় ভাগের আলোচনায় ফেরত যাই। অনুচ্ছেদ ২৭ থেকে শুরু করে সামনের দিক এগুতে থাকি। ৩১ নং অনুচ্ছেদ এখানে হুবহু উদ্ধৃতি করছি।

৩১। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার। আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির



www.nagorikpathagar.org

অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।'

লক্ষণীয় যে, এতে কোন সুনির্দিষ্ট আইনের কথা বলা হয়নি কারণ নাগরিক জীবনের বিভিন্ন আঙ্গিক বা দিক বিভিন্ন আইন দ্বারা পরিচালিত। সামরিক বাহিনীর সদস্যরাও নাগরিক। তবে তাদের পেশাগত জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনের বৃহদাংশ তাদেরই জন্য প্রযোজ্য আইন দ্বারা পরিচালিত; যেমন– বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট দ্বারা পরিচালিত। অতএব সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩১-এর বক্তব্য মোতাবেক সেনাবাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশে বিদ্যমান অন্য যে কোন আইনের আশ্রয় পাক বা না পাক, তাদের নিদেনপক্ষে বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট-এর আশ্রয় লাভের অধিকার অলঙ্ঘনীয়। সংবিধানের তৃতীয় ভাগের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। অনুচ্ছেদ ৪৪ হল-মৌলিক অধিকার বলবৎ করা সম্পর্কিত। এই অনুচ্ছেদটি হুবহু উদ্ধৃত করছি।

'৪৪। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের কাছে মামলা রুজু করিবার অধিকার নিশ্চয়তা দান করা হইল। (২) এই সংবিধানের ১০২ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।'

যদি কোন পাঠক সংবিধান পাঠকালে এখানে এসে থেমে যান, তাহলে কোন সমস্যা নেই। সব পাঠকই সংবিধান পাঠ করে আনন্দিত হবেন এজন্য যে, তিনি মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য হাইকোর্টে যেতে পারবেন। কিন্তু পাঠক যদি আরেকটু অগ্রসর হন এবং অনুচ্ছেদ ৪৫ পাঠ করেন, তখন একটি বিশেষ শ্রেণীর পাঠক আহত হবেন, । আর সেই আহত শ্রেণী হল শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর সদস্যরা। সংবিধানে আর্টিক্যাল ৪৫-এর মার্জিনে শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন, এই হেডিং থাকলেও বাস্তবে তাকে পরিবর্তন হিসাবে বিবেচনা না করে নিষেধাজ্ঞা হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আর্টিকেল ৪৫ হুবহু উদ্ধৃত করা হল।

'৪৫। কোন শৃঙ্খলা-বাহিনীর সদস্য-সম্পর্কিত কোন শৃঙ্খলামূলক আইনের যে কোন বিধান উক্ত সদস্যদের যথাযথ কর্তব্য পালন বা উক্ত বাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করিবার উদ্দেশে প্রণীত বিধান বলিয়া, অনুরূপ বিধানের ক্ষেত্রে এই ভাগের কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।'

অতএব, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৫'এর আলোকে, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৬ থেকে অনুচ্ছেদ ৪৪ (১৯টি অনুচ্ছেদ) এবং অনুচ্ছেদ ৪৬ থেকে অনুচ্ছেদ ৪৭ ক (তিনটি



www.nagorikpathagar.org

অনুচ্ছেদ) শৃঙ্খলামূলক আইনের যথা– বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট-এর কোন বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, কারণ বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট-এর সেই বিধানগুলো সেনাবাহিনীর সদস্য কর্তৃক যথাযথ কর্তব্য পালন এবং সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত। এই আপাত বিরোধের কোন আইনগত বিশ্লেষণ নয়, বরং একটা কাণ্ডজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ এরকম হতে পারে। আর্মি অ্যাক্ট-এর অনেক বিধান আছে। আর্মি অ্যাক্ট-এ যেসব বিধান সেনাসদস্যদের যথাযথ কর্তব্য পালন এবং সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে বলে বলা হয়েছে, সেগুলো যদি সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সংঘাতপূর্ণ বা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হয় তাহলে কোন সেনা সদস্য সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের জন্য হাইকোর্টে যেতে পারবে না। কিন্তু যেকথাটি সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি বা বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট-এও বলা নেই, সেটি হচ্ছে এই-কথাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ হচ্ছে : এই....আইনের আশ্রয় লাভের যে মৌলিক অধিকার সে সম্পর্কিত। একজন সেনাসদস্য আর্মি অ্যাক্ট মোতাবেক কর্তৃপক্ষ বা সরকার থেকে বিবেচনা পাওয়ার অধিকারী। যদি আর্মি অ্যাক্ট মোতাবেক বিবেচনা না পায় তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াবে এই যে, ওই সেনা সদস্য তার জন্য প্রযোজ্য সুনির্দিষ্ট আইনের আশ্রয় লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই নিবন্ধে কিছু আগে সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করা আছে, সেটি দেখুন। সুস্পষ্টভাবে অনুল্লিখিত কথাটির দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আইনের কোন সংবিধান যদি সংবিধানের বর্ণিত তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধানাবলীর পরিপন্থী না হয়ে অনুপূরক বা অনুকূল হয়....তাহলে কি হবে ? সংবিধানে অনুচ্ছেদ ৪৫-এর মূল চেতনা হচ্ছে আর্মি অ্যাক্টকে প্রাধান্য দেয়া। মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের নামে যদি আর্মি অ্যাক্টকে চ্যালেঞ্জ করা হয় তাহলে সেনাবাহিনী চলবে না। কথাটা বাস্তব এবং যুক্তিসঙ্গত। একজন অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ সেনাসদস্য হিসাবে যতটুকু জোর দিয়ে বলা সম্ভব ততটুকু জোর দিয়েই বলতে চাই যে, মৌলিক অধিকার বনাম সেনবাহিনী আইনের প্রশ্নে সেনা আইনই প্রাধান্য পাবে। তবে আমার মতো একজন নগণ্য নাগরিকের নগণ্য উপলব্ধি হল যে, সংবিধান রচনাকারীরা সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ বর্ণিত মৌলিক অধিকার রচনাকালে একটি ভুল করেছেন। সেনাবাহিনীর সদস্যরা তাদের জন্য প্রযোজ্য আইনের আশ্রয় লাভ সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে হাইকোর্টে যেতে পারেন সংবিধানে সেই অধিকার রাখা উচিত ছিল। একজন সেনাবাহিনী সদস্য সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত, যুগপৎ সেনাবাহিনী আইনের আশ্রয় লাভ থেকেও বঞ্চিত....তিনি কি সার্বিকভাবেই আইনের আশ্রয় লাভের বাইরে চলে গেলেন না ? তিনি প্রতিকারের জন্য কার কাছে যাবেন? এটিই হচ্ছে লাখ টাকা মূল্যের প্রশ্ন,–মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চন।

## বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি 'শৃঙ্খলা বাহিনী'। এই শৃঙ্খলা বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে আইনটি প্রচলিত



www.nagorikpathagar.org

সেটাকে বলা হয় বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট। এই আর্মি অ্যাক্ট-এর কোন অফিসিয়াল বা সরকারি বাংলা ভাষ্য নেই।

বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট-এর জন্ম ১৯১১ সালে। ওই আমলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি এই উপমহাদেশ শাসন করত। ছোট ছোট আদেশ বিধি-বিধান আইন, হুকুম, ফরমান, ডিক্রি ইত্যাদি দ্বারা ১৮৫৭ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী পরিচালিত হচ্ছিল। এগুলোকে গুচ্ছ বানিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রথমবারের মতো আইন করা হয় ১৯১১ সালে। আইনের নাম ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যাক্ট ১৯১১ (Act viii of 1911)। এই আইনের অধীনে যেসব রুল বা নোটিফিকেশন বা আদেশ জারি হতো সেগুলোরও আইনের সমান ক্ষমতা ছিল।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭-এ। ১৯৪৭ সালের ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স অ্যাক্ট-এর ১৮ নং সেকশনের বদৌলতে স্বাধীন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও ১৯১১ সালের ইন্ডিয়ান আর্মি অ্যাক্ট মোতাবেক পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৫২ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের আইন পরিষদ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জন্য আইন পাস করে। ওই আইনটি ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫ তারিখ থেকে বলবৎ হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তান আমলে অন্যান্য বহু আইনের সঙ্গে আর্মি অ্যাক্টও (Existing Law) হিসেবে প্রচলিত হয়ে যায়। আনুষ্ঠানিকভাবে পাকিস্তান আর্মি অ্যাক্ট ১৯৫২-কে যথাযথ সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশের জন্য গ্রহণ করা হয়। সংশোধন হয়েছিল যৎসামান্যই। তাই ১৯১১ সালের আইন এবং ১৯৫২ সালের আইনের মধ্যে যেমনই তফাৎ ছিল কম, অনুরূপভাবে ১৯৫২ সালের আইন ও বিদ্যমান বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট-এর মধ্যেও তফাৎ খুবই কম।

বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট-এ ১৫টি অনচ্ছেদ (Chapter) রয়েছে। যার মধ্যে ১৫২টি সেকশন (১ থেকে ১৭৭-এ) বিধৃত আছে। বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট-এর সেকশন-১৭৩-এর ক্ষমতাবলে সরকার আর্মি অ্যাক্ট-এর বিধানকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে রুলস্ প্রণয়ন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান সরকার যে রুলস প্রণয়ন করেছিল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ওই রুসলগুলোই 'বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট রুলস' নামে পরিচিত ও প্রচলিত আছে। বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট সেকশন '৭১৬ এ'-এর ক্ষমতাবলে সরকার সেনাবাহিনী পরিচালনা, শৃঙ্খলারক্ষা, চাকরির শর্তাবলী ইত্যাদি বিষয়ের জন্য রেগুলেশন্স প্রণয়ন করতে পারে। রুলস্-এর মতো রেগুলেশনস্ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ও প্রচলিত।

বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট-এ ২৪ নং থেকে ৫৯ নং পর্যন্ত মোট ৩৬টি সেকশনে বিভিন্ন অপরাধ এবং প্রযোজ্য শাস্তি বর্ণনা করা আছে। আর্মি অ্যাক্ট সেকশন ৩১ হচ্ছে (Mutiny and insubordination)। এই শব্দ দুটির নিকটতম বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে; বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতা/অবশ্যতা। ইংরেজিতে বর্ণিত ভাষ্যটি আমরা নিজস্ব ভাষায় অনুবাদ করছি :

'৩১। বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা। বাংলাদেশ আর্মি অ্যাক্ট-এর আওতাধীন কোন ব্যক্তি



www.nagorikpathagar.org

যদি নিম্নে বর্ণিত অপরাধগুলোর মধ্যে যে কোন একটি করে, অর্থাৎ (ক) কোন বিদ্রোহ শুরু করে বা বিদ্রোহে উস্কানি দেয় বা বিদ্রোহ ঘটায় বা অন্য কারো সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিদ্রোহ ঘটায় বা কোন বিদ্রোহে যোগ দেয় বা (খ) কোন চলমান বা ঘটমান বিদ্রোহে উপস্থিত থেকে ওই বিদ্রোহ দমন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ না করে বা (গ)া একটা বিদ্রোহ হবে এমন কথা জানে বা অতি সঙ্গত কারণেই মনে করে যে বিদ্রোহ ঘটবে বা ঘটার কোন যড়যন্ত্র হচ্ছে তাহলে অনতিবিলম্বে উপরস্থ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাকে সংবাদ না দেন বা (ঘ) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোন সদস্যকে সিডিউস করে (মানে প্রোরোচিত বা প্রলুব্ধ করে) তার কর্তব্য বা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তার আনুগত্য থেকে সরিয়ে নিতে চেষ্ট করে, তাহলে কোন কোর্ট মার্শাল কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ড বা আইনে বর্ণিত অন্য কোন লঘু শাস্তি দেয়া যাবে।'

এই সেকশনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা আছে। তবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা হল এই-কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে যদি মিউটিনির অভিযোগ আনা হয় এবং তিনি যদি দোষ স্বীকার করে নেন তাহলেও ঝামেলা মিটবে না। পূর্ণ বিচার প্রক্রিয়া চলার পর আদালত কর্তৃকই মাত্র তাকে দোষী বা নির্দোষী সাব্যস্ত করতে হবে।

### সংসদীয় কমিটির এখতিয়ার সংক্রান্ত

বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ পরিচ্ছেদ বা চতুর্থ চ্যাপ্টার হচ্ছে প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ সম্পর্কিত। অনুচ্ছেদ ৬২-এর একটি অংশ এখানে হুবহু উদ্ধৃত করছি-৬২। (১) সংসদ আইনের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন : (ক) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ ও উক্ত কর্মবিভাগসমূহের সংরক্ষিত অংশসমূহ গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ....(ঘ) উক্ত কর্মবিভাগসমূহ ও সংরক্ষিত অংশসমূহ সংক্রান্ত শৃঙ্খলামূলক ও অন্যান্য বিষয়।'

যেই সংসদের আইনের দ্বারা সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করার কথা, ওই সংসদের সংসদীয় কমিটি সেনাবাহিনীর আইনের বাস্তবায়ন কেমন হল বা হল না এ প্রসঙ্গে খোঁজখবর নিতে পারবে, এটাই স্বাভাবিক। এতদিন মানে গত ২৯ বছরে এ ধরনের কোন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গৃহীত হয়নি বলেই বিষয়টি নজিরবিহীন আখ্যায়িত হচ্ছে। নজিরবিহীন অবশ্যই কিন্তু উদ্যোগটি বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

দৈনিক যুগান্তর ১০/১০/২০০০ইং



www.nagorikpathagar.org

# প্রেক্ষাপট ৭ নভেম্বর : সংহতি কাদের মধ্যে এবং কেন?

২৫ বছর আগের ঘটনা তাই এখনও যা বলাবলি হবে তা স্মৃতিনির্ভর। আজকে (৩০-১০-২০০০) এ নিবন্ধটি যখন লেখা হচ্ছিল তখন যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত একটি সংবাদ পত্রিকায় পড়লাম। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একদম শেষ পর্যায়ে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওই যুদ্ধ নিয়ে কি ভাবছিলেন ও বলছিলেন তার লিখিতরূপ সম্প্রতি আমেরিকায় সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছেন। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ওই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মনোভাবের মূল্যায়ন ভিন্নভাবে হতে বাধ্য। সমকালীন ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে এ ধরনের দলিলাদি প্রকাশ অত্যন্ত গঠনমূলক ভূমিকা রাখে। আমাদের দেশে ওইরকম কোন রেওয়াজ নেই। তবে গত চার বছরে সংবাদপত্রসমূহ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঐতিহাসিক তথ্য উদঘাটনে ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে দেশবাসী অনেক কিছু জানতে পেরেছে। ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলী সম্পর্কেও ১৯৯৬-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বা Interview ইত্যাদি বের হয়েছে। প্রত্যেক বছর ভিন্নধর্মী আঙ্গিকে, ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন দিবসটি স্মরণ ও উদযাপন করে। তাই এই নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। '৭৫-এর ৭ নভেম্বর ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলীর একটি আঙ্গিক অনেকটা এরকম।

'৭২ থেকে '৭৫ পুরো ৪টি বছরই দেশের জন্য ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য সময়টা অস্থিতিশীল ছিল কোন না কোন প্রকারে। ইংরেজিতে যাকে Teething Problem বলে। তার থেকে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিল নবজাত বাংলাদেশ ও তার সেনাবাহিনী। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেসব জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাদের প্রত্যেকের ইতিহাসেই বোধ করি এ ধরনের সমস্যা হয়। ৫৩ বছর আগে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের সময় যে রাজনৈতিক দল ধাত্রীর ভূমিকায় ছিল, সেই পাকিস্তান মুসলিম লীগ শক্ত বিরোধিতার মুখোমুখি হয় ছয়-সাত বছর পর। '৭১-এ বাংলাদেশের জন্মের সময় যে রাজনৈতিক দল ধাত্রীর ভূমিকায় ছিল তারা প্রথম বিরোধিতার স্বাদ পায় দু'বছরের মাথায়। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর পক্ষ থেকেই তৎকালীন সরকারি দল বিরোধিতার স্বাদ পায়। জাসদের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীবাহিনীর বিপুল অংশ ছিল মুক্তিযোদ্ধা। জাসদের দর্শন, আকাঙ্ক্ষা, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদিকে বর্ণনা করতে গেলে পুস্তক হয়ে যাবে। সংক্ষিপ্ততম ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায় যে, জাসদ একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও ভিন্নতর শাসনপদ্ধতি কামনা করেছিল।



www.nagorikpathagar.org

সেনাবাহিনীর গঠন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জাসদের ধারণাগুলো ব্যতিক্রমধর্মী তো বটেই বিপ্লবাত্মকও ছিল। গত ১০-১৫ বছর যাবৎ রাজনৈতিক দল হিসাবে জাসদ ম্রিয়মাণ অবস্থায় আছে। আশির দশকের শেষদিকে এটি ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টির বিপরীতে জাতীয় সংসদে বিরোধী দল। সমালোচকগণ এটিকে 'গৃহপালিত বিরোধী দল' বলতেন। বর্তমান সরকারের আমলে এটি তথাকথিত ঐকমত্যের সরকারের অংশীদার। কিন্তু ২৫ বছর আগে জাসদ ছিল একটি তরুণ বাঘের মতো। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য বিকল্প, যদিও উভয়ের শেকড় একখানে ছিল। সেই জাসদ এবং ৭ নভেম্বর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জাসদ একটি ব্যতিক্রমধর্মী দল। যেকোন সমাজেই ব্যতিক্রমধর্মী বা বিপ্লবাত্মক ধারণা বা মতবাদ বা কর্মপদ্ধতি বাস্তাবায়ন করা খুব কঠিন কাজ। গতানুগতিকতার ধারক ও বাহকগণের জন্য ব্যতিক্রম ও বিপ্লব হচ্ছে মৃত্যু ও বিলুপ্তির পরোয়ানা। তাই গতানুগতিকতার ধারক ও বাহকগণ ব্যতিক্রম এবং বিপ্লবের সর্বাত্মক বিরোধিতা তরে। ব্যতিক্রমের জন্য সফলতার অন্যতম বাহনই হচ্ছে বিপ্লব তথা কোন না কোন প্রকারের বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড। ১৯৭৪-৭৫ সালে তৎকালীন জাসদের নেতৃবর্গ এরকমই কিছু ব্যতিক্রমের বাস্তবায়ন কামনা করেছিলেন। এর জন্য তারা কিছুটা প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন, কিন্তু ওই প্রস্তুতি পর্যাপ্ত ছিল না বলে ঘটনার পরপরই প্রতীয়মান হয়। সেনাবাহিনীর সৈনিকদের ভেতরে জাসদের মতবাদের পক্ষে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল, যদিও বিদ্যমান সেনাবাহিনী আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি ছিল মস্তবড় অপরাধ। সৈনিকদের নিয়ে গড়ে তোলা গোপন সংগঠনের নাম ছিল 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'।

গত দুই-তিন বছরে ৭ নভেম্বরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত কিছু কিছু ব্যক্তিত্বের বক্তব্য বা Interview পত্রিকায় পড়ে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, আলোচ্য ঘটনাটি ৭ নভেম্বর তারিখেই ঘটানোর জন্য ৭ দিন আগেও প্রস্তুতি ছিল না। ঘটনাটি যে ৭ নভেম্বরের ঘটানো হবে, সেই সিদ্ধান্তটি নেয়া হয়েছিল ৩ নভেম্বরের ঘটনার পর। পাঠক (বিশেষত ৩০ বছরের নিচে বয়স এমন পাঠক), অতি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রশ্ন করতে পারেন, যে, ৩ নভেম্বর কি হয়েছিল এবং ৭ নভেম্বর কি হয়েছিল?

১৫ আগস্ট '৭৫-এ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। সরকারে তো বটেই আংশিকভাবে সেনাবাহিনীতেও দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় এবং অন্যান্য সম্ভাব্য রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুইজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নেতৃত্বে ৩ নভেম্বর একটি সামরিক ক্যু ঘটে যায়। ওই দু'জন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দফতরের তৎকালীন সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীরউত্তম এবং তৎকালীন ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের



www.nagorikpathagar.org

ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল সাফায়াত জামিল বীরবিক্রম। ৩ নভেম্বরের ঘটনার নায়কঘন তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দি করেন। ১৫ আগস্টের ও ৩ নভেম্বরের ঘটনা জাসদ সমর্থিত গোপন সেনা সংগঠনসমূহের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত ছিল। এরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনা যেন পুনরায় না ঘটে এবং তাদের পরিকল্পনাকে যেন ভেস্তে না দেয়, সে জন্যই জাসদ এবং তাদের সমর্থিত সেনাবাহিনীর ভেতরে গোপন সংগঠনসমূহ সিদ্ধান্ত নেয় একটি বিপ্লব ঘটানোর জন্য। ৭ নভেম্বর সংঘটিত বিপ্লবটি ছিল তার পূর্ববর্তী দুই বছর যাবৎ তাদের মানসপটে লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল যে, তারিখটি হঠাৎ করেই সাব্যস্ত হয়। অনেক লেখালেখি ও বলাবলি হলেও একটি কথা শতকরা ১০০ ভাগ পরিষ্কার এখনও হয়নি। সে কথাটি হল, সফল বিপ্লবের পর জাসদ সেনাবাহিনীর জন্য কোন ধরনের Command Structure পরিকল্পনা করেছিল? এ কথাটি এজন্য বলছি যে, ৭ নভেম্বর সৈনিক বিপ্লব চলার সময় কিছুসংখ্যক সৈনিক স্লোগান দিয়েছিলেন–'সিপাহী-সিপাহী ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই।' বাস্তবে সেদিন বেশ কয়েকজন সেনা অফিসারকে হত্যা করা হয়। তবে দেশের প্রতি নিয়তি প্রসন্ন ছিল। যার ফলে পুরো সেনাবাহিনী ওই অস্পষ্ট বিপ্লবের ধারণায় আচ্ছন্ন হয়নি। নিষ্কলুষ সৈনিকরা সেনাবাহিনীর Command Structure পেশাদার দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী কর্মকর্তাদের হাতে রাখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সৈনিকরা জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে এবং তিনি পুনরায় সেনাবাহিনীর হাল ধরেন। নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী রক্ষা পায়। ওই ৭ নভেম্বরের সকালে নিষ্কলুষ দেশপ্রেমিক সৈনিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহস, প্রেরণা ও সহযোগিতা যুগিয়েছিলেন দেশের বিশেযত ঢাকা মহানগরীর জনগণ। তাই ৭ নভেম্বর চিহ্নিত হয়ে আসছে সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসাবে।

৭ নভেম্বর বিপ্লবী সৈনিকরা এবং অফিসার হত্যাকারী সৈনিকরা পরবর্তী সময়ে বিচারের সম্মুখীন হন এবং বহু সৈনিকের সাজা হয়। পুরো বিপ্লবের প্রধান অধিনায়ক কর্নেল তাহেরও বিচারের সম্মুখীন হন। বিচার প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ছিল না বলেই বিশদভাবে বিশ্বাস করা হয় এবং আজ অবধি এ বিচারটি বিতর্কিত বলে আখ্যায়িত। স্বাধীনচেতা, স্পষ্টভাষী, মেধাবী অফিসার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি যা বিশ্বাস করতেন, সেই বিশ্বাস থেকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও তিনি একচুল সরে আসেননি। বিপ্লবী হিসাবে তিনি ব্যর্থ কিন্তু একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে ইতিহাসে তার নাম অমোচনীয়। বিপ্লব ব্যর্থ হলেও ৭ নভেম্বর দিবসটি সেনাবাহিনীর কিছু উপকারও করে। অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার সম্পর্ক নতুন পেক্ষাপটে সংজ্ঞায়িত হয়। ব্রিটিশ



www.nagorikpathagar.org

ও পাকিস্তান আমলের কিছু কিছু অভ্যাস বা রেওয়াজ তাৎণিক ঝেড়ে ফেলা হয়। '৭২ থেকে '৭৫ সময়কালে গোয়েন্দা বাহিনীসমূহের ব্যর্থতা স্পষ্ট করে তোলে।

দুই শতাব্দীর মধ্যবর্তী ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে বাংলাদেশ। পৃথিবীর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ও আঙ্গিকে বাংলাদেশী সমাজ আজ বহুধাবিভক্ত এবং বিবিধ সংঘাতে লিপ্ত। গত তিন বছর যাবত বহু জ্ঞানীগুণী জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে আসছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। অপ্রিয় হলেও আমার মতে সত্য যে রাজনৈতিক ঐকমত্য বাংলাদেশে অদূরভবিষ্যতে অসম্ভব। অতএব, ঐকমত্য সৃষ্টির চেষ্টা ফলপ্রসু হবে না বলেই ধরে নেয়া যায়। যেসব কারণে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বিভক্ত, সে কারণগুলো বিভক্তি রেখার উভয় পাশের রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে আপসের অযোগ্য। তাই ইস্যুভিত্তিক ঐকমত্যই কাম্য হতে পারে। যে বিষয়টিতে ঐকমত্যের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে আমরা দেশ, জাতিও শক্তি হিসাবে কোন দিকে যাচ্ছি সেটা নিরূপণ করা বা সংজ্ঞায়িত করা। আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নে আমরা অবনতির দিকে যাচ্ছি, ধ্বংসের দিকে যাচ্ছি। বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছি। '৭১ থেকে ২০০০-এই ৩০ বছর হেলায় নষ্ট করেছি। আগামী ৩০ বছর নষ্ট না করার জন্য ঐকমত্য প্রয়োজন। এই ঐকমত্য আসতে হবে জনগণের মধ্য থেকে। জনগণের চাপে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ যেন সঠিক কর্মপন্থা নেন, সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। আগামী নির্বাচনের আগে যদি সঠিক নির্বাচনমুখী রাজনৈতিক পরিবেশ এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিবেশ সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য সংসদীয় নির্বাচনটি প্রয়োজনীয় মাত্রায় বিশ্বাসযোগ্যতা পাবে না। বিশ্বাসযোগ্যতা না পেলে ফলাফল সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা আরও ঘনীভূত হতে পারে। এখন একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক সরকার থাকা সত্ত্বেও যখন আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এতটা অবনতি এবং জান-মালের এতটা নিরাপত্তাহীনতা বিদ্যমান, তখন সেই অস্থায়ী প্রশাসনের আমলে পরিস্থিতির যে কতটা অবনতি হতে পারে সেটা কল্পনা করতেও ভয় হচ্ছে। বাংলাদেশ পুলিশবাহিনীর হাতে যত অস্ত্র আছে তার সমপরিমাণ অস্ত্র যে চরমপন্থী ও গোপন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের হাতে ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মাস্তান তথা রাজনৈতিক ক্যাডারদের হাতে নেই, সেই নিশ্চয়তা কে দেবে? পরিস্থিতির একজন নীরব পর্যবেক্ষক হিসাবে বলতে চাই, সব বেআইনি ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করার সশস্ত্র ক্ষমতা ও পরিকল্পনার ক্ষমতা সরকারের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আছে কিনা এটা সন্দেহপূর্ণ। বলতে চাচ্ছিলাম, ২০০১ সালে পুনরায় সিপাহী-জনতার সংহতি প্রয়োজন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি জাতীয় সেনাবাহিনী। জাতির সেবা করাই এর প্রধান কর্তব্য। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরের কোন একটি দিনের কথা মনে পড়ছে। তৎকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ ঢাকা সেনানিবাসে সেনাবাহিনীর সদর দফতরের কনফারেন্স রুমে তিন বাহিনীর জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের



www.nagorikpathagar.org

উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন। তার মুখের কথাগুলো হুবহু এখন আর মনে নেই. কিন্তু স্পিরিট বা চেতনা ছিল অনেকটা এরকম। 'আপনারা জনগণের পাশে দাঁড়ান। আপনারা আমার পাশে দাঁড়ান। আপনারা আমার হাতকে শক্তিশালী করুন। জাতি আমার ওপর, একটি বিরাট দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে। আপনাদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতা ছাড়া আমার পক্ষে ওই দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। আপনারাই জাতীয় সংহতির প্রতীক।' আজকে ২০০০ সালের নভেম্বরের ৭ তারিখে এসে পুনরায় মনে করছি, বস্তুতই আমাদের সেনাবাহনী জাতীয় সংহতি প্রধান অংশীদার। আগামী নির্বাচনের আগে আবার সেনাবাহিনীর খেদমত প্রয়োজন হবে- এতে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। আর একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন হল যে, সেই সংহতির অভিব্যক্তি বা অভিপ্রকাশ কি হবে এবং কিভাবে হবে? বিদ্যমান প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মধ্যে অবস্থিত থেকে সৈনিকরা জনগণের সঙ্গে কাঁধ মিলানোর জন্য রাস্তায় নামতে পারবে না। আগামী নির্বাচনে জাতীয় সেনাবাহিনী ব্যতিক্রমধর্মী ও অতীতের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী ভূমিকা রেখে এই সংহতি প্রকাশ করবে। সেনাবাহিনীকে সেই অবকাশ দেয়ার জন্য আমি বিনীতি আবেদন জানাচ্ছি। সংহতি দিবসে এই হোক কামনা।

দৈনিক যুগান্তর ০৭/১১/২০০০ইং



www.nagorikpathagar.org

# সিপাহী জনতার বিপ্লব

৭ নভেম্বর '৭৫ একটি আলোচিত দিবস। কিন্তু একমাত্র নয়। প্রথম আলোর সম্মানিত পাঠকদের মধ্যে যারা বাংলাদেশের প্রজন্ম বা মুক্তিযুদ্ধকালে ৮/১০ বছর বয়সী ছিলেন তাদের কাছে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ৮/১০ বছরের ইতিহাস নিবিড়ভাবে জানা না থাকারই কথা।

দেশ যেমন নতুন ছিল, সেনাবাহিনীও নতুন ছিল। দেশের যেমন সমস্যা ছিল, সেনাবাহিনীরও সমস্যা ছিল। '৭২ থেকে '৭৫-এই চার বছর সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত ঘটনাবহুল সময় ছিল।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার মধ্যে একটি হলো পাকিস্তান থেকে বাঙালি অফিসার ও সৈনিকগণের প্রত্যাবর্তন এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ। অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল '৭৫-এর শুরুতে নবগঠিত একমাত্র রাজনৈতিক দল বাকশালে সেনাবাহিনী প্রধানকে সদস্য করা। '৭৪-এ প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় ব্যাপকভাবে সেনা মোতায়েন এবং এসব ত্রাণকার্যে রত থাকা অবস্থায় সেনাসদস্যগণের সঙ্গে স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের গুরুতর মতপার্থক্য- এটি ছিল তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চতুর্থ ঘটনা ছিল ১৫ আগষ্ট '৭৫-এ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা এবং পরবর্তীকালে এর প্রতিক্রিয়ায় কিছু ঘটনা।

নতুন দেশের নতুন সেনাবাহিনীতে বস্তুগত কষ্ট ছিল এবং থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কিছুসংখ্যক সেনাকর্মকর্তা এবং কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদ এটাকে অস্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করেন। পাঠকের স্মরণ আছে যে, জন্মের পর থেকেই জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা জাসদ সরকার পরিচালনায় তৎকালীন আওয়ামী লীগের ভুল ত্রুটিসমূহের প্রকাশ্য এবং বলিষ্ঠ সমালোচনা করছিলেন। রাজপথে তারা পুলিশ ও সরকারি দলের মোকাবিলা করছিলেন। সেই মোকাবিলার প্রহরগুলো বহু ক্ষেত্রে রক্তস্নাত হয়েছিল। রাজপথে মোকাবিলা করে আওয়ামী লীগের মতো একটি শক্তিশালী দলকে ক্ষমতা থেকে সরানো যাবে কিনা এই ধরনের একটি প্রশ্ন তৎকালীন জাসদের নেতৃবৃন্দের কাছে উপস্থাপিত হচ্ছিল।

জাসদের প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম জ্যেষ্ঠ সদস্য ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল। মেজর জলিল আমার থেকে চাকরিতে এবং বয়সে বড় ছিলেন অনেক। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরে কোন একটি ঘটনার কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।



www.nagorikpathagar.org

বন্দী অবস্থায় তাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পুলিশ কন্ট্রোল রুমসংলগ্ন লাইনে দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেফাজতে রাখা হয়েছিল। ওই সময় পার্শ্ববর্তী রুমসমূহে অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে আমিও থাকতাম। আর কোনো জ্যেষ্ঠ অফিসার মওজুদ না থাকায় আইনের ধারা মোতাবেক আমি তার পাহারাদার অফিসার ছিলাম। ওই সুবাদে গল্পস্বল্প হতো। গল্পের মাধ্যমেই দেশ ও জাতি সম্বন্ধে তার চিন্তাভাবনার কিছুটা ইঙ্গিত তখন পেয়েছিলাম। যথাসময় কোর্ট মার্শালে তার বিচার হয়েছিল। বিচারের পর তিনি চাকরিচ্যুত হন। অতঃপর তিনি জাসদে যোগ দেন। আরেকজন মেধাবী সেনা অফিসার ও সিপাহী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন '৭১-এর মেজর আবু তাহের। পরে তিনি বীরোত্তম খেতাব পান। '৭৩-এর শুরুতে তিনি স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তিনি একটি পা হারিয়েছিলেন। অবসরের সময় তিনি কর্নেল ছিলেন। অবসরের কয়েক মাস পর তিনি জাসদ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। দেশবাসীর চিন্তাভাবনা করার জন্য এবং দেশের মঙ্গলের জন্য ব্যতিক্রমধর্মী বিষয়াদি উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি বহুলোকের শ্রদ্ধাভাজন হন এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেনাবাহিনীতে তিনি বিতর্কিত হয়ে পড়েন। তবে মেধাবী এবং ব্যতিক্রমধর্মী ব্যক্তিবর্গের বিতর্কিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তার মধ্যে যদি সেই ব্যক্তি স্পষ্টবাদী হয় তাহলে তো আর কথাই নেই। মেজর জলিল এবং কর্নেল তাহেরের মতো ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এসে উদীয়মান জাসদ অধিকতর উত্তাপ পায়। কেউ আনুষ্ঠানিক জবানবন্দিতে না বললেও এখন পেছনের দিকে তাকিয়ে বলা যায় যে, তারা সেনাবাহিনীতে এবং সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দেশের প্রশাসনের ব্যাপক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন কামনা করেছিলেন।

'৭৫-এর ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একটি ক্যু-দে-তা বা সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়। অভ্যুত্থানটির লক্ষ্য ছিল খোন্দকার মোশতাক আহমেদের পরিচালনাধীন সরকারের উৎখাত। এই সামরিক অভ্যুত্থানটিতে প্রথম থেকে কিছু কিছু অপেশাদারিত্বের লক্ষণ ফুটে ওঠে। অভ্যুত্থানের দিন অর্থাৎ ৩ নভেম্বর সকালেই ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে চার জাতীয় নেতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ৩,৪,৫ এবং ৬ নভেম্বর এই ৭২ ঘন্টা সময় সরকার সম্বন্ধে দেশবাসী অন্ধকারে এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন। সেনাবাহিনীও এক সাংঘাতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটায়। ১৫ আগস্ট '৭৫-এর ঘটনা জাসদকে সতর্ক করে। জাসদের প্রেরণায় এবং নিয়ন্ত্রণে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে যে গোপন সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল সেই গোপন সংগঠনের সদস্যরাও সতর্ক হয়ে যায়। তাদের মাথায় প্রশ্ন আসে,তাদের পরিকল্পিত বিপ্লবের কী হবে। এ রকম প্রেক্ষাপটে যখন ৩ নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে তখন জাসদ নেতৃবর্গ এবং আলোচ্য গোপন সংগঠনের সদস্যগণ চিন্তায় পড়ে যায়। তাদের মূল্যায়নে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানটি ছিল 'ভারতপন্থী'। এই মর্মে সেনানিবাস-সমূহের অভ্যন্তরে এবং রাজধানীতে লিফলেট বিতরণ করা হয়।



www.nagorikpathagar.org

একটি প্রচারণা চালানো হয় যে, জাসদের বিপ্লব যদি এই মুহূর্তে বাস্তবায়ন করা না হয় তাহলে বাকশালীয় শাসন পুনরায় প্রবর্তিত হতে পারে। এরকম পরিস্থিতেই ৭ নভেম্বর সৈনিকগণের দ্বারা সৈনিকগণের বিপ্লবের দিন ধার্য হয়। চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছিলেন কর্নেল তাহের।

৬ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত্রি ১২ টার সময় অর্থাৎ ৭ নভেম্বর প্রথম প্রহরে সেনানিবাসের মাঝামাঝি অবস্থানরত দ্বিতীয় ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির সুবেদার মেজর আনিসুল হকের ইঙ্গিতে অভ্যুত্থান শুরু হয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা সেনানিবাসের সকল কোণ থেকে অভ্যুত্থান শুরু হয়। অভ্যুত্থান সৈনিকগণের তিনটি কাজ এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ হলো, জেনারেল জিয়াকে বন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করা এবং তাকে নেতৃত্বের আসনে পুনর্বহাল করা(ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফদের অনুগত দল ৩ নভেম্বর প্রত্যুষে তাকে বন্দী করেছিলেন)। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, রাত ১টা ৩০ মিনিটের দিকে ঢাকা বেতার কেন্দ্র দখল করাও বিপ্লবের কথা ঘোষণা করা। তৃতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল নেতিবাচক। অর্থাৎ অফিসার হত্যা করা। ৭ নভেম্বর সূর্যোদয়ের পর সেনানিবাসসমূহ থেকে সৈন্যগণ গাড়ির পর গাড়ি করে শহরে চলে যায় এবং বিপ্লবীগণের সঙ্গে যোগ দেয়। ততক্ষণে বিবিধ নাটকীয় ঘটনার মাধ্যমে জেনারেল জিয়া সম্পূর্ণ অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেন।

যে সিপাহি বিপ্লব ধ্বংসের প্রবণতা নিয়ে শুরু হয়েছিল সেটাকে তিনি অনেকটা স্থিতিশীল পর্যায়ে ফেরত আনার উদ্যোগ নেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহের বাংলাদেশের সমাজের যে পরিবর্তন সৈনিকগণের বিদ্রোহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের জনগণ এবং আপামর সৈনিকবৃন্দ সে বিষয়ে মোটেও সচেতন ছিলেন না। জাসদ তথা কর্নেল তাহেরের বিপরীতে জেনারেল জিয়াউর রহমানের পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা বহুগুণ বেশি ছিল বিধায় জেনারেল জিয়া সেদিন নেতৃত্ব দিতে পেরেছিলেন।

৭ নভেম্বর একটি ব্যর্থ বিপ্লবের তারিখ। উদ্দেশ্য ভালো বা মন্দ যাই থাকুক না কেন ব্যর্থতার পর এটি চরম অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত হয়। অপরাধের বিচার হয়। বিচার তথা বিচারের প্রক্রিয়া বিতর্কিত ছিল অবশ্যই। বিচারে কর্নেল তাহেরের ফাঁসি হয়েছিল। বিবিধ নিয়মে আরো বহু সৈনিক প্রাণ হারায়। সেজন্য ৭ নভেম্বরের স্মৃতি বহুজনের নিকট মিশ্র।

দৈনিক প্রথম আলো ০৭/১১/২০০০ইং



www.nagorikpathagar.org

# সৈনিক থেকে রাষ্ট্রনায়ক

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের ঘটনাবহুল ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অনেকগুলো তারিখের মধ্যে একটি হচ্ছে ৩ নভেম্বর ১৯৭৫। ওই দিন অতি প্রত্যুষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন চিফ অফ দ্য জেনারেল স্টাফ বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, বীরোত্তমের নেতৃত্বে একটি সেনাবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। বিদ্রোহীদের প্রথম কাজ ছিল তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীরোত্তমকে তাঁর বাসস্থানে বন্দী করা। একই দিন দুপুর বেলা জেনারেল জিয়া তাঁর এডিসি ক্যাপ্টেন জিল্লুর রহমানকে বলেন, 'ওরা তো আমাকে রাখবে না, আর আমিও এ বাড়িতে আর থাকব না। তোমরা ৪ থেকে ৫ হাজার টাকার মধ্যে একটা বাড়ি দেখ। 'ক্যাপ্টেন জিল্লুর প্রথমেই যার শরণাপন্ন হলেন, তিনি হলেন জেনারেল জিয়ার অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ও অনুরক্ত সেনা কর্মকর্তা মেডিকেল কোরের পরিচালক কর্নেল খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ। '৬৮-'৬৯-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে অনেকের সঙ্গে ওই সময় মেজর খুরশিদ উদ্দিন আহমেদও চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন। সময়ের ডাকে খুরশিদ মুক্তিযুদ্ধে যান এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের সঙ্গে অতি আন্তরিক হয়ে পড়েন। পরবর্তী দুদিন খুরশিদ এবং জিল্লুর না সস্তা না দামি এরকম ভাড়ায় একটা বাড়ি খোঁজায় ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু ভবিতব্য ছিল অন্যরকম। জিয়াউর রহমানকে ওই বাড়ি ছেড়ে যেতে হয়নি, তিনি ওই বাড়ি থেকেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। সেই দীর্ঘ কাহিনীতে এখন যাব না। এডিসি হওয়ার সুবাদে জিল্লুর জেনারেল জিয়াউর রহমানের প্রতি অনুরক্ত অবশ্যই ছিলেন। ওই সময় ক্যাপ্টেন মেজর এসব র‍্যাঙ্কে অনেক অফিসার ছিলেন যারা জেনারেল জিয়াউর রহমানের অন্ধ ভক্ত ছিলেন। ওই রকমই কয়েকজন নভেম্বর ৪/৫ তারিখে জিল্লুরের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন যে, ৫ তারিখ রাতে তারা কিছু সৈন্য নিয়ে কমান্ডো স্টাইলে অপারেশন চালিয়ে জেনারেলকে মুক্ত করবে। জিল্লুর যেন জেনারেলকে সপরিবারে প্রস্তুত রাখে। জিল্লুরের কাছ থেকে কথাগুলো শুনে জেনারেল জিয়া তাকে ভীষণভাবে ধমক দিলেন এবং বললেন, 'বিশৃঙ্খলার সঙ্গে জড়াবে না, পাগলামি করবে না।' জেনারেল জিয়া নিজে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষী ছিলেন না, কিন্তু অদৃশ্য সৃষ্টিকর্তা জাতির ইতিহাসে তার জন্য একটা নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন অপরিহার্য করে রেখেছিলেন।

জিয়াউর রহমান প্রথমে ছিলেন সৈনিক, পরে হয়েছেন রাষ্ট্রনায়ক। একাত্তরের ২৬ মার্চের ঐতিহাসিক ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধে তাঁর যুগপৎ মেধা ও বীরত্বের মধ্যে সুপ্ত ছিল রাষ্ট্রনায়কের পরিচয়।

ব্যক্তিজীবনে, অতি সাদামাঠা জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন জেনারেল জিয়া। সবজি, ডাল এবং এক টুকরা মাছ হলেই তার ভোজপর্ব সম্পাদিত হতো। মিষ্টির প্রতি আগ্রহ



www.nagorikpathagar.org

ছিল। খাওয়ার পরে যে কোনো প্রকারের একটুকরা মিষ্টি খেতেন। সরকারি কাজে কোনোখানে গেলে ভোজসভার মেন্যু অবশ্যই সাদাসিধা দেখতে চাইতেন তিনি। চকলেট খাওয়া খুব পছন্দ করতেন এবং বাচ্চাদের মধ্যে স্নেহের পরশ লাগিয়ে সবসময় বিতরণ করতেন। যে সময়টুকু বাসায় থাকতেন, পুরোটাই স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়ের সঙ্গে কাটাতেন। দামি কাপড় পরতেন না বললেই চলে। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রথম ৫ বছরে তিনি মাত্র একবার নতুন স্যুট সেলাই করেন। সেনা অফিসারের যে বেতন তা দিয়েই অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে সংসার চালাতেন। তিনি তো আর চালাতেন না, তাঁর স্ত্রী চালাতেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের উদ্যোগে সাভারে একটি হাউজিং প্রকল্প চালু করা হলে সেনাবাহিনীর উপপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, নিজের অনিচ্ছায় শুভাকাঙ্ক্ষীদের চাপে, একটা প্লট কিনেছিলেন। ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত রূপালী ব্যাংকের তৎকালীন শাখা ব্যবস্থাপক জনাব কিবরিয়া, ওভার ড্রাফট (ওডি) দিয়েছিলেন এই ব্যয় মেটানোর জন্য। যেটাকে এখন পুরনো ডিএএইচএস বা ডিওএইচএস বনানী বলা হয়, তার ৩ নং সড়কে, ১৭ নং প্লটটি তাঁর নামে বরাদ্দ অর্থাৎ ৯৯ বছরের লিজ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব উপস্থাপিত হলে তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই বলে যে, 'সাভারে আমার ৫ কাঠা জমি আছে, আমার আর লাগবে না।' ১৯৮২ সালে ওই প্লটটি দ্বিখণ্ডিত করে ৫ কাঠা হারে দুজন ব্রিগেডিয়ারকে বরাদ্দ দেওয়া হয়।

ব্যক্তিজীবনে কৃচ্ছ্রতার পূজারী, দেশের উন্নয়নের জন্য ছিলেন উদারহস্ত। কেউ বিশ্বাস করবেন কেউ করবেন না, কিন্তু আমার বিশ্লেষণ হলো ১৯৭২ থেকে ২৫ আগস্ট ১৯৭৫ পর্যন্ত সময় জেনারেল জিয়াউর রহমানের জীবনে অতি মূল্যবান সময় ছিল। কারণ নিয়তি তাঁকে এ সময় পরবর্তী অজানা গুরুদায়িত্বের জন্য প্রস্তুত হতে সুযোগ দিয়েছিল। জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং তাঁর সঙ্গীরা ১৯৫৫ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন পান। বাল্য ও কিশোরকালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের লেখাপড়া হয়েছিল কলকাতা ও করাচিতে। জেনারেল জিয়া জানতে এবং জ্ঞান বাড়াতে পরিশ্রমের সঙ্গে চেষ্টা করতেন। অর্থনীতি শাস্ত্রের বই, ভূগোলের বই, দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসের বই একটার পর একটা পড়তেন। অফিসে কোনো কোনো সময় ইত্তেফাক পত্রিকা তার ব্যক্তিগত স্টাফ অফিসারদের সামনে জোরে জোরে পড়তেন এবং তাদের বলতেন তাঁর পড়া, উচ্চারণ বা বাচনভঙ্গি সংশোধন করে দিতে। অনেক সময় স্টাফ অফিসারদের বলতেন পড়তে এবং তিনি শুনতেন। জ্ঞানার্জনের এই অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি সেনাবাহিনীতে অনেকের অনুকরণীয় হয়েছিল। অফিসে বা অন্য কোনোভাবে কোনো মিটিংয়ে তিনি অন্যের বক্তব্য শুনতেন বেশি। নিজে বলতেন কম। কিন্তু যেটুকু বলতেন তা অতি পরিষ্কার এবং সহজবোধ্য হতো। জ্ঞানার্জনে তাঁর এই প্রচেষ্টা '৭৬ থেকে '৮১ সময়কালে রাষ্ট্রের নির্বাহী দায়িত্ব পালনকালে তাঁর জন্য আশীর্বাদ ছিল। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি লক্ষণীয় দোষ ছিল যে, অগ্রহণযোগ্য বা অপ্রিয় পরিস্থিতিতে অতি অল্প সময়ে বেশি মাত্রায় রেগে যেতেন।



www.nagorikpathagar.org

বঙ্গবন্ধুর মতো ভীষণ বড় মাপের একজন নেতা তথা দেশের নির্বাহী কর্তার পর জাতীয় জীবনের নেতৃত্বে যে শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয় সেটা তিন বছরের মাথায় জেনারেল জিয়াউর রহমান পূরণ করেন। তাঁর রাজনীতি ছিল সমন্বয়ের ও দেশ গঠনের। জেনারেল জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা করতেন এবং বঙ্গবন্ধুও তাঁকে আপন জানতেন। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের শেষদিকে যখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য প্রথম সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্তির প্রশ্ন ওঠে তখন (এখনো প্রকাশের অনুচিত এমন কিছু সম্ভাব্য কারণে) বঙ্গবন্ধু তাঁকে সেনাপ্রধান না বানিয়ে তাঁরই বন্ধু এবং একই ব্যাচের অফিসার মেজর জেনারেল কে এম সফিউল্লাহ, বীরোত্তমকে সেনাপ্রধান বানান। তখন সেনাবাহিনীতে বড় রকমের গুজব রটে গিয়েছিল যে, জিয়াউর রহমান বোধহয় তাৎক্ষণিক পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি পদত্যাগ করেননি। কারণ তিনি ধৈর্যে বিশ্বাস করতেন। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় বা তাঁর নিজের জীবদ্দশায় তিনি বঙ্গবন্ধুকে সম্পৃক্ত করে ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ রাত্রির ঘটনাবলি নিয়ে কোনোদিন কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করেন বলে শোনা যায়নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ১৫ নং খণ্ড (ডিসেম্বর ১৯৮৫-তে প্রকাশিত) এর ১৮৮ থেকে ১৯২ পৃষ্ঠায় চট্টগ্রামের তৎকালীন অন্যতম প্রধান আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম এ হান্নানের সাক্ষাৎকার মুদ্রিত আছে। জনাব হান্নান বর্ণনা করেছেন '..২৭ শে মার্চ বিকেলে মেজর জিয়াউর রহমানও রেডিও মারফত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পর ঘোষণার বক্তব্য নিয়ে জনমনে কিছুটা বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তাই সেই দিন রাত্রে আমি, মির্জা আবু মনছুর ও মোশারফ হোসেন ফটিকছড়িতে অবস্থানরত সাবেক মন্ত্রী এ কে খান সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পুনঃঘোষণার জন্য তিনি একটি খসড়া করে দেন। আমরা ফটিকছড়ি থেকে কালুরঘাট ট্রান্সমিটার সেন্টারে উপস্থিত হই। সেখানে মেজর জিয়াউর রহমানের কাছে আমি এ কে খান কর্তৃক লিখিত খসড়াটি দেই। পুনরায় ২৮শে মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে মেজর জিয়াউর রহমান সর্বাধিনায়ক হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। অতি সম্প্রতি ২৬ মার্চ ২০০১ তারিখে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা যুগান্তর-এর স্বাধীনতা দিবস সংখ্যায় অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মীর শওকত আলী বীরোত্তমের একটি ইংরেজি লেখার বাংলা অনুবাদ প্রবন্ধ আকারে বেরিয়েছে। সেখানেও বর্ণনা করা আছে কী প্রেক্ষাপটে জাতির প্রয়োজনে কোন ধরনের শব্দচয়নে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁর সাহসিকতা ও বাস্তববাদিতা অধীনস্থদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সম্মান ও আনুগত্য আনতো।

জিয়াউর রহমান বিশ্বাস করতেন সমন্বয়ের রাজনীতিতে, উদারনৈতিক রাজনীতিতে এবং দেশগড়ার রাজনীতিতে। দেশ গঠনের প্রধান উপাত্ত ঐক্যবদ্ধ জাতি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি ছিল। কিন্তু সেটি ছিল পক্ষের শক্তির তুলনায় ক্ষুদ্র। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তোলার যে প্রয়াস



www.nagorikpathagar.org

বঙ্গবন্ধু হাতে নিয়েছিলেন. রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সেই পদরেখা অনুসরণ করেই বিস্তৃত পথের সৃষ্টি করেন। ১৯৭৫-এর নভেম্বরের ৭ তারিখে সিপাহী জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে তাঁর উত্থান এবং ৩০ মে ১৯৮১ তারিখে চট্টগ্রামে আর একজন মুক্তিযোদ্ধা জেনারেলের নেতৃত্বাধীন সামরিক বিদ্রোহে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। বস্তুত জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে বেশকিছু কঠোর কিন্তু যুগপৎ ফলপ্রসু ও বিতর্কিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর সে প্রচেষ্টার সুফল পরবর্তী সেনাপ্রধানগণ ভোগ করেন।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যার বিচার আক্ষরিক অর্থে আজও হয়নি। ১৯৮১ সালের জুলাই মাসে যে কোর্ট মার্শাল হয়েছিল সেটি আক্ষরিক অর্থে ছিল সেনাবিদ্রোহের বিচার। বিদ্রোহী তথা অভিযুক্তদের পক্ষে কৌসুলি হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনজনের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। ওই সময়েই আমি বিশ্লেষণ করার সময় পাই দেশ কাকে হারিয়েছে।

চাকরি জীবনে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে আমি প্রথম দেখি জয়দেবপুরের রাজবাড়িতে অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কর্মরত উপ-অধিনায়ক হিসাবে মাত্র কয়েক দিনে জন্য। সেটা ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বর অক্টোবরের কথা। তারপর '৭৩ ও '৭৬-এর জুন পর্যন্ত সময় আর্মি হেড কোয়ার্টারে চাকরিকালে কিছুটা কাছে থেকে দেখেছি। ১৯৭৭ সালে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম খুলনার গিলাতলা সেনানিবাসে. ভোলার লালমোহন থানার জনসভায় নিরাপত্তা দিতে গিয়ে এবং ১৯৭৮-এর এপ্রিল মাসে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে চন্দ্রঘোনার বিপরীতে রায়খালী গ্রামে উপজাতীয় জনগণের এক সভায়। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অতি বিখ্যাত 'এক্সারসাইজ আয়রনশিল্ড' চলাচলে একদিন রাতের বেলা কর্তব্যরত অবস্থায় তাঁর সামনে পড়েছিলাম দোষী অবস্থায়। আর্মি হেড কোয়ার্টারের চাকরি করার সময় আমরা কনিষ্ঠরা, উপ-সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকতাম কারণ শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতার ব্যাপারে পান থেকে চুন খসলে কারো রক্ষা ছিল না। আশ্চর্যের বিষয়. আমি সরাসরি কোনো দিন তাঁর চোখ দেখিনি। কারণ তিনি সব সময় সানগ্লাস পরতেন। এত অল্প অভিজ্ঞতায় এত বড় ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু লেখা কঠিন কাজ বৈকি। আরো কঠিনতর হলো অল্প কথায় গভীর অনুভূতি প্রকাশ করা।

দৈনিক প্রথম আলো ১৪/০৪/২০০১



www.nagorikpathagar.org

# ৭ নভেম্বর : রাজনীতিবিদ থেকে রাষ্ট্রনায়কে সম্ভাব্য উত্তরণের লগ্ন

এ বছর ১৪ এপ্রিল (অর্থাৎ ১ বৈশাখে) প্রথম আলো পত্রিকা ব্যতিক্রমধর্মী একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করেছিল। ওই ক্রোড়পত্রের নাম ছিল 'আমাদের কালের নায়কেরা'। সেখানে মোট ১৬ জন মহৎ বাঙালি সন্তানের ওপর ক্ষুদ্র বা নাতিদীর্ঘ লেখা ছাপানো হয়। ১৬ জনের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেখানে সম্পাদক মহোদয়ের আমন্ত্রণে আমি শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ওপর ক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম, 'সৈনিক থেকে রাষ্ট্রনায়ক'। সময় এসেছে স্বচ্ছভাবে আরো কিছু জানার।

১৯৭৫ সালের নভেম্বরের ঘটনাবলি নিয়ে স্বচ্ছ কথা-বার্তা প্রকাশ হয়ে আসছে এবং আরো আসা প্রয়োজন। ২৬ বছর আগের ঘটনা। তাই এখন যা বলাবলি বা লেখালেখি হবে সেটা স্মৃতিনির্ভর। তবে জীবন্ত বা প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের স্মৃতিনির্ভর বক্তব্য, বিতর্কিত গবেষণালব্ধ নিবন্ধ নয়। গত বছর এমন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত একটি সংবাদ পত্রিকায় পড়েছিলাম। ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একদম শেষ পর্যায়ে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওই যুদ্ধ নিয়ে কী ভাবছিলেন ও বলেছিলেন তার লিখিতরূপ সম্প্রতি (অর্থাৎ বছরের এই সময়ের অল্পপূর্বে) আমেরিকার সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেছেন। পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ওই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মনোভাবের মূল্যায়ন ভিন্নভাবে হতে বাধ্য। সমকালীন ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে এ ধরনের দলিলাদি প্রকাশ অত্যন্ত গঠনমূলক ভূমিকা রাখে। আমাদের দেশে ওইরকম কোনো রেওয়াজ নেই। তবে গত চার বছরে সংবাদপত্রসমূহ অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটনে ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে দেশবাসী অনেক কিছু জানতে পেরেছে। ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলি সম্পর্কেও ১৯৯৬-এর পরে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বা নিবন্ধ ও বই ইত্যাদি বের হয়েছে। প্রত্যেক বছর ভিন্নধর্মী আঙ্গিকে, ভিন্ন ভিন্ন সংগঠন দিবসটি স্মরণ ও উদযাপন করে। তা-ই এই নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। নভেম্বর ও তৎপরবর্তী ঘটনাবলির একটি আঙ্গিক অনেকটা এরকম।

'৭২ থেকে '৭৫ পুরো চারটি বছরই দেশের জন্য ও বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর জন্য সময়টা অস্থিতিশীল ছিল কোনো না কোনো প্রকারে। অনেক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছিল নবজাত বাংলাদেশ ও তার সেনাবাহিনী। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেসব জাতি স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তাদের প্রত্যেকের ইতিহাসেই বোধ করি এ ধরনের সমস্যা হয়। ৫৩ বছর আগে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের সময় যে রাজনৈতিক দল ধাত্রীর



www.nagorikpathagar.org

ভূমিকায় ছিল সেই পাকিস্তান মুসলিম লীগ শক্ত বিরোধিতার মুখোমুখি হয় ছয়-সাত বছর পর। '৭১-এ বাংলাদেশের জন্মের সময় যে রাজনৈতিক দল ধাত্রীর ভূমিকায় ছিল তারা প্রথম বিরোধিতার স্বাদ পায় দু'বছরের মাথায়। ১৯৭৩ সালে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)-এর পক্ষ থেকেই তৎকালীন সরকারী দল বিরোধিতার স্বাদ পায়! জাসদের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মী বাহিনীর বিপুল অংশ ছিল মুক্তিযোদ্ধা। জাসদের দর্শন, আকাঙ্ক্ষা, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদিকে বর্ণনা করতে গেলে পুস্তক হয়ে যাবে। সংক্ষিপ্ততম ভাষায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায় যে, জাসদ একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও ভিন্নতর শাসনপদ্ধতি কামনা করেছিল। সেনাবাহিনীর গঠন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জাসদের ধারণাগুলো ব্যতিক্রমধর্মী তো বটেই, বিপ্লবাত্মকও ছিল। গত ১৫-২০ বছর যাবৎ রাজনৈতিক দল হিসাবে জাসদ ম্রিয়মাণ অবস্থায় আছে, আশির দশকের শেষ দিকে এটি ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রপতি এরশাদের প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতাসীন জাতীয় পার্টির বিপরীতে জাতীয় সংসদে বিরোধী দল। সমলোচকরা এটাকে 'গৃহপালিত বিরোধীদল' বলতেন। গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এটি তথাকথিত ঐকমত্যের সরকারের অংশীদার দল। কিন্তু ২৫ বছর আগে জাসদ ছিল একটি তরুণ বাঘের মতো। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য বিকল্প, যদিও উভয়ের শেকড় একখানে ছিল। সেই জাসদ এবং ৭ নভেম্বর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। জাসদ ছিল একটি ব্যতিক্রমধর্মী দল। যেকোনো সমাজেই ব্যক্তিমধর্মী বা বিপ্লবাত্মক ধারণা বা মতবাদ এবং কর্মপদ্ধতি বাস্তবায়ন করা খুব কঠিন কাজ। গতানুগতিকতার ধারক ও বাহকদের জন্য ব্যতিক্রম ও বিপ্লব হচ্ছে মৃত্যু ও বিলুপ্তির পরোয়ানা। তাই গতানুগতিকতার ধারক ও বাহকরা ব্যতিক্রম এবং বিপ্লবের সর্বাত্মক বিরোধিতা করে। ব্যতিক্রমের জন্য সফলতার অন্যতম বাহনই হচ্ছে বিপ্লব তথা কোনো না কোনো প্রকারের বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড।

১৯৭৪-'৭৫ সালে তৎকালীন জাসদের নেতৃবর্গ এরকমই কিছু ব্যতিক্রমের বাস্তবায়ন কামনা করেছিলেন। এর জন্য তারা কিছুটা প্রস্তুতিও নিয়েছিলেন, কিন্তু এই প্রস্তুতি পর্যাপ্ত ছিল না বলে ঘটনার পরপরই প্রতীয়মান হয় সেনাবাহিনীর সৈনিকদের ভেতরে জাসদের মতবাদের পক্ষে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছিল, যদিও বিদ্যমান সেনাবাহিনী আইনের পরিপ্রেক্ষিতে এটি ছিল মস্ত বড় অপরাধ। সৈনিকদের নিয়ে গড়ে তোলা গোপন সংগঠনের নাম ছিল 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'। গত দুই-তিন বছরে ৭ নভেম্বরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত কয়েকজন বিপ্লবী সংস্থার সদস্যের ও অন্য কয়েকজন ব্যক্তিত্বের বক্তব্য বা ইন্টারভিউ পত্রিকায় পড়ে আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, আলোচ্য ঘটনাটি ৭ নভেম্বর তারিখেই ঘটানোর জন্য সাতদিন আগেও কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রস্তুতি ছিল না। ঘটনাটি যে ৭ নভেম্বর ঘটানো হবে, সেই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়েছিল ৩ নভেম্বর '৭৫-এর ঘটনার পর। পাঠক (বিশেষত ৪০ বছরের নিচে বয়স এমন পাঠক) অতি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রশ্ন করতে পারেন যে, ৩ নভেম্বর কি হয়েছিল এবং ৭ নভেম্বর কী হয়েছিল ?



www.nagorikpathagar.org

১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হন। এর ফলে সরকারে তো বটেই আংশিকভাবে সেনাবাহিনীতেও দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় এবং অন্যান্য সম্ভাব্য রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দুজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার নেতৃত্বে ৩ নভেম্বর একটি সামরিক ক্যু ঘটে যায়। ওই দুজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের তৎকালীন সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীরোত্তম এবং তৎকালীন ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল সাফায়াত জামিল বীরবিক্রম। ৩ নভেম্বরের ঘটনার নায়করা তৎকালীন সেনা-প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দি করেন। ১৫ আগস্ট ঘটনার প্রেক্ষাপট, ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ও দেশবাসী কর্তৃক নিশ্চুপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এখানে কিছুই বলছি না। কিন্তু যে দ্বৈতশাসনের উল্লেখ করলাম তার প্রতিক্রিয়া সেনাবাহিনীর সর্বস্তরে গুরুতর ছিল। এই প্রতিক্রিয়ারই অংশ হিসেবে ৩ নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় থেকে একজন জনপ্রিয়, সৈনিকপ্রিয় সাহসী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত লাভ করেছিলেন। সমকালীন ('৭২ থেকে) আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা নিবিড় ছিল। তার আপন ভাই হলেন (কিছুদিন আগেও যিনি সরকারের ভূমি প্রতিমন্ত্রী ছিলেন এবং বর্তমানেও বাংলাদেশ কৃষক লীগের সভাপতি হিসেবে আছেন) জনাব রাশেদ মোশাররফ। যতটুকু মনে পড়ে ৫ নভেম্বর '৭৫ সালে দিনের বেলা ঢাকা মহানগরীর কলাবাগান-সোবহানবাগ এলাকায় খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের সমর্থনে আওয়ামী লীগের আয়োজনে একটি মাঝারি আকারের মিছিল বের হয়। সেখানে কিছু জনমানস বা সমকালীন জনআকাঙ্ক্ষাবিরোধী স্লোগান দেওয়া হয়েছিল। ওই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন খালেদ ও রাশেদ মোশাররফ ভ্রাতৃদ্বয়ের মা এবং রাশেদ মোশাররফ নিজে। এই কারণে সেনাবাহিনীতে ৩ নভেম্বরের সামরিক অভ্যুত্থানটি আওয়ামী লীগ ও ভারতীয়পন্থী হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং সাধারণ জনগণ ও সৈনিকদের কাছে ৩ নভেম্বরের ক্যু গ্রহণযোগ্যতা হারায়।

১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের ঘটনা জাসদ সমর্থিত গোপন সেনা সংগঠনসমূহের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপ্রত্যাশিত ছিল। এরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনা যেন পুনরায় না ঘটে এবং তাদের পরিকল্পনাকে যেন ভেস্তে না দেয়, সেজন্যই জাসদ এবং তাদের সমর্থিত সেনাবাহিনীর ভেতরে গোপন সংগঠনসমূহ ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত নেয় একটি বিপ্লব ঘটানোর জন্য। ৭ নভেম্বর সংঘটিত বিপ্লবটি ছিল তার পূর্ববর্তী দুই বছর যাবৎ তাদের মানসপটে লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন।

এখানে সর্বচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হলো এই যে, তারিখটি হঠাৎ করেই সাব্যস্ত হয়। বিগত বছরগুলোতে অনেক লেখালেখি ও বলাবলি হলেও একটা কথা এখনো শতকরা ১০০ ভাগ পরিষ্কার হয়নি– সে কথাটি হলো, সফল বিপ্লবের পর জাসদ সেনাবাহিনীর জন্য কোন ধরনের কমান্ড স্ট্রাকচার পরিকল্পনা করেছিল? এ কথাটি এ



www.nagorikpathagar.org

জন্য বলছি যে, ৭ নভেম্বর সৈনিক বিপ্লব চলার সময় কিছুসংখ্যক সৈনিক স্লোগান দিয়েছিলেন– 'সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই, অফিসারের রক্ত চাই।' বাস্তবে সেদিন বেশ কয়েকজন সেনা অফিসারকে হত্যা করা হয়। তবে দেশের প্রতি নিয়তি প্রসন্ন ছিল। যার ফলে পুরো সেনাবাহিনী ওই অস্পষ্ট বিপ্লবের ধারণায় আচ্ছন্ন হয়নি। নিষ্কলুষ সৈনিকেরা সেনাবাহিনীর কমান্ড স্ট্রাকচার পেশাদার দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী কর্মকর্তাদের হাতে রাখার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ৭ নভেম্বরের প্রথম প্রহরেই সৈনিকেরা জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে এবং তিনি পুনরায় সেনাবাহিনীর হাল ধরেন। নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে সেনাবাহিনী রক্ষা পায়। ওই ৭ নভেম্বরের সকালে নিষ্কলুষ ও দেশপ্রেমিক সৈনিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহস, প্রেরণা ও সহযোগিতা যুগিয়েছিলেন দেশের বিশেষত ঢাকা মহানগরীর জনগণ। তাই ৭ নভেম্বর চিহ্নিত হয়ে আসছে সিপাহী-জনতার বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে ৭ নভেম্বরের প্রথম ৭-৮ ঘন্টার ঘটনাবলির একটা অংশের প্রত্যক্ষদর্শী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকরিরত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল ইসলাম চৌধুরী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এনামুল হক তখন দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে চাকরি করতেন। ৭ নভেম্বর ভোররাত আনুমানিক ১টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সৃষ্ট পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সময় আমি দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্ষণস্থায়ী অধিনায়ক ছিলাম। আমরা তিনজন অফিসার এবং কয়েকজন এনসিও মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টকে তাৎক্ষণিকভাবে নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে বিপ্লবে সংশ্লিষ্ট করার। উল্লেখ্য, আমি ১৯৭১ সালে একই রেজিমেন্টের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম বিধায় সৈনিকদের কাছে পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য ছিলাম।

৭ নভেম্বর বিপ্লবী সৈনিকরা এবং অফিসার হত্যাকারী সৈনিকরা পরবর্তী সময়ে বিচারের সম্মুখীন হন এবং বহু সৈনিকের সাজা হয়। পুরো বিপ্লবের প্রধান অধিনায়ক কর্নেল তাহেরও বিচারের সম্মুখীন হন। বিচার প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ ছিল না বলেই বিশদভাবে বিশ্বাস করা হয় এবং আজ অবধি এ বিচারটি বিতর্কিত বলে আখ্যায়িত হচ্ছে। স্বাধীনচেতা স্পষ্টভাষী মেধাবী অফিসার ও বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহের মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি যা বিশ্বাস করতেন, সেই বিশ্বাস থেকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও তিনি একচুল সরে আসেননি। বিপ্লবী হিসেবে ইতিহাসে তার নাম অমোচনীয়। বিপ্লব ব্যর্থ হলেও ৭ নভেম্বর দিবসটি সেনাবাহিনীর কিছু উপকারও করে। অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যকার সম্পর্ক নতুন প্রেক্ষাপটে সংজ্ঞায়িত হয়। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের কিছু কিছু অভ্যাস বা রেওয়াজ তাৎক্ষণিক ঝেড়ে ফেলা হয়। '৭২ থেকে '৭৫ সময়কালে গোয়েন্দা বাহিনীসমূহের ব্যর্থতা স্পষ্ট করে তোলে। ৭ নভেম্বরের পর দেশ ও সেনাবাহিনী পরিচালনায় বড় রকমের পরিবর্তন আসে। কিছুদিনের মধ্যেই জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশ পরিচালনায় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ১৯৭৬ সাল থেকে সাংগঠনিক সম্প্রসারণ শুরু হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে



www.nagorikpathagar.org

দেশের রাজনীতিতে বহুদলীয় গণতন্ত্রের বীজ বপন করা হয়। এসব কিছুর কৃতিত্ব ৭ নভেম্বরের এবং এ দিবসের প্রধান নায়কদের, যথা সেনাবাহিনীর সৈনিকরা, ঢাকা মহানগরীর দেশপ্রেমিক জনগণ এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান।

এতক্ষণ অতি সংক্ষেপে ৭ নভেম্বর প্রসঙ্গে আলোচনা করলাম। এই দিনের অন্যতম করণীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরোত্তমের দেশ ও জাতি গঠনের দর্শন পর্যালোচনা করা, যাতে করে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায়। দুটি ভিন্ন শতাব্দীর ক্রান্তিকাল অতিক্রম করেছে বাংলাদেশ ও পৃথিবী। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ও আঙ্গিকে বাংলাদেশী সমাজ আজ বহুধাবিভক্ত এবং বিবিধ সংঘাতে লিপ্ত। গত তিন-চার বছর যাবৎ বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে আসছেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। অপ্রিয় হলেও আমাদের মতে সত্য যে, রাজনৈতিক ঐকমত্য বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে অসম্ভব। অতএব, ঐকমত্য সৃষ্টির চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না বলেই ধরে নেওয়া যায়। তবে ১ অক্টোবরের নির্বাচনী ফলাফল জাতীয় ঐক্যের ইঙ্গিত বহন করে। যেসব কারণে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বিভক্ত সে কারণগুলো বিভক্তি রেখার উভয় পাশে রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে আপসের অযোগ্য। তাই ইস্যুভিত্তিক ঐকমত্যই কাম্য হতে পারে। যে বিষয়টিতে ঐকমত্যের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে আমরা দেশ, জাতি ও শক্তি হিসেবে কোন দিকে যাচ্ছি সেটা নিরূপণ করা বা সংজ্ঞায়িত করা। আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নে আমরা অবনতির দিকে যাচ্ছি, বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছি। '৭১ থেকে ২০০০ এই ৩০ বছরের বেশির ভাগ সময় হেলায় নষ্ট করেছি। আগামী ৩০ বছর নষ্ট না করার জন্য ঐকমত্য প্রয়োজন। এই ঐকমত্য আসতে হবে জনগণের মধ্য থেকে। জনগণের চাপে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ যেন সঠিক কর্মপন্থা নেন, সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। জনগণ ওইরূপই রায় দিয়েছে গত ১ অক্টোবর। তাই এখন ওই নির্বাচনের পর যদি সঠিক রাজনৈতিক পরিবেশ এবং আইন-শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে আগামীতে আরো দুঃসংবাদ আসবে জাতির জন্য।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম যে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করার জন্য সেটা এখনো হয়নি। একতাবদ্ধ জাতি সংগঠনের পক্ষে আমি, কিন্তু যুগপৎ মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানও যেন অধিষ্ঠিত থাকে সেটাও আমার লক্ষ্য। অতীতে বিভিন্ন অজুহাতে মুক্তিযোদ্ধারা দলীয় কাজে ব্যবহৃত এবং নিগৃহীত হয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, নতুন পরিস্থিতিতে, ৭ নভেম্বরের চেতনার প্রেক্ষাপটে মুক্তিযোদ্ধারা দলীয়করণ হবেন না বা নিগৃহীত হবেন না।

দৈনিক প্রথম আলো ০৭/১১/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

# জিয়া থেকে খালেদা ৭ নভেম্বরের উত্তরণ

এবারে ভিন্ন মাত্রায় এবং আঙ্গিকে সংহতি দিবস পালিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রথমে '৭৫-এর আগস্ট থেকে নিয়ে ৭ নভেম্বরের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সময়ের প্রেক্ষাপটের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। অতঃপর ৭ নভেম্বরের তাৎপর্য সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ পর্যায়ে একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে বেগম খালেদা জিয়ার কাছে দেশবাসীর পক্ষ থেকে কিছু নিবেদন থাকবে।

বাংলাদেশের বিগত ৩০ বছরের ইতিহাস ঘটনাবহুল এবং এর মধ্যে কিছু ঘটনা অপ্রীতিকর। ১৫ আগস্ট '৭৫-এ বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়া এবং ৩০ মে ৮১ তে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার ঘটনা দুটি হচ্ছে সবচেয়ে অপ্রীতিকর ও দুঃখজনক ঘটনার উদাহরণ। গভীর অনুভূতির বা মিশ্র মূল্যায়নের ঘটনা আছে দুটি, যথা ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর তারিখের বা একই সালের ৭ নভেম্বর তারিখের। বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে এবং বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীসমূহের ইতিহাসে এই দুটি দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৩ ও ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলী থেকে যদি দেশ ও জাতির জন্য কোন মঙ্গলজনক উপসংহার টানতে হয়, তাহলে শুধু ঐ দিন দুটির ঘটনা নয়, বরং তার প্রেক্ষাপটের ওপরও মনোযোগ দিতে হবে।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারিতে বাকশাল সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র নিহত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টকে স্থিতি তারিখ ধরলে তখন আমার সরেজমিন চাকরির বয়স পাঁচ বছর থেকে ২১ দিন কম। জীবনের বয়স এবং চাকরির বয়সে নবীন ও তরুণ ছিলাম। কিন্তু দায়িত্বভার পালন ও গ্রহণে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী নবীন সেনাবাহিনীকে গড়ে তোলার কাজে প্রথম দুই বছর সার্বিকভাবে নবীন ও তরুণরাই অবদান রেখেছিল। যত কিছুই বলি, মানসিক ও বিবেকের পরিপক্বতা তারুণ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল বেশি। এই প্রেক্ষাপটেই '৭৫-এর ঘটনার ওপর মন্তব্য করতে হবে। এ কলাম লিখতে গিয়ে এখন যা বলছি, এতে অনিবার্যভাবে বিগত ২৬ বছরের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিফলন আছে।

'৭৫-এর আগস্টের ঘটনার পর দেশের প্রশাসন যেমন দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় ছিল, অনুরূপ সেনাবাহিনীর প্রশাসনও দ্বিখণ্ডিত ছিল। ১৫ আগস্ট থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত সময়টি যুগপৎ ব্যস্ত ও উদ্বেগসঙ্কুল ছিল। ২৪/২৫ আগস্ট তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ বীরউত্তমকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হয়।



www.nagorikpathagar.org

বস্তুত জেনারেল জিয়াউর রহমান চাকরি জীবনে জেনারেল সফিউল্লাহর ব্যাচমেট (সেনাবাহিনীর ভাষায় কোর্সমেট) হলেও জ্যেষ্ঠতার তালিকায় জিয়াউর রহমান ওপরে ছিলেন। যে পদটা ১৯৭২-এর এপ্রিলেই পাওয়ার আশা ছিল, সেটা সাড়ে তিন বছর পরে তিনি পেলেন। এতে তিনি যেমন সন্তুষ্ট হলেন, যারা তাঁকে শ্রদ্ধা করতো তারাও সন্তুষ্ট হলেন। মুক্তিযুদ্ধের ৩০ বছর পর এর মূল্যায়ন করতে গিয়ে মনে হচ্ছে ১৯৭২-এর এপ্রিলে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করতে গিয়ে সরকার কর্তৃক যে অবাঞ্ছিত অস্বস্তির সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেটা '৭৫-এর আগস্টের ২৫ তারিখে দূর হল।

জেনারেল জিয়ার নামের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে 'ক্যারিশমা' বা আবেগপূর্ণ জনপ্রিয়তা জড়িত ছিল। 'আমি জিয়া বলছি' ১৯৭১সালের মার্চের এই ঐতিহাসিক বাক্যের মতো আরেকটি বাক্য ৭ নভেম্বরের সকালে একই কণ্ঠে পুনরায় শোনামাত্র, সেনাবাহিনী বিদ্যুৎচমকের মতো প্রভাবিত হল। বাংলাদেশ যদিও যুদ্ধরত ছিল না, তথাপি জিয়াউর রহমান যে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিলেন, সেটা অস্বস্তি,অশান্তিতে বৈশিষ্ট্যময় ছিল। সেনাবাহিনী সাধারণত পরিচালিত হতো সেনানিবাসের অভ্যন্তরে অবস্থিত সেনাসদর কর্তৃক। সিদ্ধান্ত যদিও কর্তাব্যক্তিরাই নিতেন, তথাপি সিদ্ধান্তসমূহ হতো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, সেনাসদরে। ১৫ আগস্টের পরে আমরা কনিষ্ঠরা দেখলাম, বঙ্গভবন থেকেও কিছু কিছু সিদ্ধান্ত আসছে এবং বঙ্গভবন মানে হল ১৫ আগস্টের বঙ্গবন্ধু হত্যার ঘটনা এবং বিদ্রোহে নেতৃত্বদানকারী মেজর পদবির অফিসারবৃন্দ। এটা অনেকের কাছে খুবই দৃষ্টিকটু ঠেকত এবং সেনারাহিনীর জ্যেষ্ঠ অফিসারদের কাছে এটা যে অগ্রহণযোগ্য বন্দোবস্ত ছিল সেটা বলাই বাহুল্য। এটা আসলেই ছিল একটা বিদঘুটে পরিস্থিতি। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫-এর ঘটনাবলী ঘটতোই। এটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। প্রশ্ন ছিল কবে? ৩ নভেম্বর ৭৫-এর ঘটনা ৭ নভেম্বরকে ত্বরান্বিত করে। ৩ নভেম্বরের ঘটনা না ঘটলে, হয়তো ৭ নভেম্বরের ঘটনা আরও বিলম্বিত হতো। সে জন্য ৩ নভেম্বরের ঘটনার অতি সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী মানসিকভাবে পাকিস্তান ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর আদলে তথা '৪৭ পূর্ব ব্রিটিশ ভারতীয় আদলে বিকশিত হচ্ছিল। র‍্যাংকের নাম, পদের নাম, সংস্থার নাম, প্রশিক্ষণের নিয়ম,প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাদি সবকিছুই প্রায় এক ছিল। এরকমই একটি প্রথা ছিল ব্যাটম্যান প্রথা। ব্যাটম্যানকে ব্যক্তিগত সাহায্যকারী বলা যায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালেও ব্যাটম্যান প্রথা ছিল। যেসব বাঙালি অফিসার পাকিস্তানে বন্দি ছিলেন, তাদের বন্দিকালে ব্যাটম্যান প্রথা ছিল না। বাংলাদেশে আসার পর তারা পুনরায় ব্যাটম্যান পাওয়া শুরু করল। ব্যাটম্যানের প্রধান কাজ হল সাহায্য করা। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই ব্যাটম্যানদের অসৈনিকসুলভ কাজে নিয়োজিত করা হতো, বিশেষত বিবাহিত অফিসার বা জেসিওগণের ব্যাটম্যানগণের ক্ষেত্রে এরূপ অনিয়ম ঘটতো। পাকিস্তান আমলে সৎ ও সাদাসিধা মার্কা সৈনিকগণকেই ব্যাটম্যান হিসাবে নিয়োজিত করা হতো। বাংলাদেশ আমলে পাঠান বা বালুচ সিপাইদের মতো সাদাসিধা লোক



www.nagorikpathagar.org

পাওয়া মুশকিল হয়ে গেলেও বাঙালি সিপাহিদের মধ্যেও কিছু কম লেখাপড়া-জানা সাদাসিধা সৈনিক ছিল যাদেরকে অফিসাররা ব্যাটম্যান হিসাবে নিত। কিন্তু মুক্তিযু পরবর্তী সেনাবাহিনীতে কম লেখাপড়া জানা সৈনিকের অভাব পরিলক্ষিত হ সমালোচনাপ্রবণ বাঙালি সেনা সদস্যরা বিরাজমান এই সামাজিক অভ্যাস কোনম এড়াতে পারলেন না। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা বাঙালি সৈনিকদের মনকে তর্তা স্পর্শ করেছে। সৈনিককে বোঝানো হল, কেন তুমি অফিসারের জন্য খাটবে। সৈ এটাই বুঝলো এবং ক্ষিপ্ত হল। তবে এখানে অবশ্যই বলে রাখতে হবে, স সেনাবাহিনীকে গড়পড়তা একই মানদণ্ডে বিচার করা চলবে না। পদাতিক বাহিনী বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং অন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে পজিটিভভাবেই ভিন্ন ছিল। এর কা আছে। বেঙ্গল রেজিমেন্টে অফিসার ও সৈনিকদের সম্পর্ক এমন নিবিড় ও স্বতঃ হতো যে, সেখানে তৃতীয় পক্ষের কানপড়া কাজে লাগতো না।

রাজপথে বিপর্যস্ত ও পর্যুদস্ত হয়ে, আমার মূল্যায়নে, তৎকালীন জাসদ বিকল্প অনুসন্ধান করল। সমাজতান্ত্রিক রাজনীতিতে সৈনিকও রাজনীতির অংশ। জ সিদ্ধান্ত নিল বুর্জুয়া আদলের অফিসার বাহিনী বাদ দিয়ে সৈনিকদের সংগঠিত ব বিদ্রোহ তথা বিপ্লব ঘটিয়ে দেশ শাসনের ক্ষমতা অধিগ্রহণ করবে। দেশে বিদ্য তৎকালীন আইনে এবং এখনকার আইনেও এটা মারাত্মক রকমের অপরাধ ছি আইন না বদলিয়ে বা 'অন্তর্ঘাত' বা 'নাশকতা' শব্দগুলোর মানে না বদলিয়ে, জাস ওই আমলের ওই কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করা কঠিন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত নিয়ে যা বলাবলি বা লেখালেখি হয়েছে, সেটা বেশি খোলামেলা নয়। কিন্তু ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত অনেক খোলামেলা কথা পত্র-পত্রিকায় এসেছে। এমনকি আমলের জাসদ সমর্থিত গোপন সৈনিক সংস্থার নেতৃবৃন্দের মুখ থেকেও সরাসরি ব এসেছে। সমসাময়িক ইতিহাস লেখকগণের জন্য কাজটি সহজ হয়ে আসছে। স ব্যক্ত করেছেন যে, কিছু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য জাসদের সুনির্দিষ্ট রাজনৈ গোপন নেতৃত্বে সেনানিবাসসমূহের অভ্যন্তরে সৈনিকগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলকে সংগ করা হচ্ছিল। তাদের প্রস্তুতি অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারত না। ঘটনার ২০ বছর পর যখন চিন্তা করি যে, ওই আমলে সেনাবাহিনীর আত্মরক্ষামূলক গো কর্মকাণ্ড কত দুর্বল ছিল, তখনই নিজের মনে নিজে শিউরে উঠি(যদি বলি যে,আজ সেনাবাহিনীকে এসব কথা খেয়াল রেখেই নিজেদের আত্মরক্ষা করতে হবে,তা বোধ করি বাহুল্য হবে না)। গোপন সৈনিক সংস্থাসমূহ এক বিপ্লব সাধন করার মোটামুটি প্রস্তুতই হচ্ছিল। শুধু তারিখটি ঠিক করাই বাকি ছিল। আমার সাম অভিজ্ঞতা বলছে যে, ওই বিপ্লব রক্তপাত ছাড়া সংঘটন প্রায় অসম্ভব ছিল। তবে কথাও সত্যি যে, তৎকালীন জাসদের চিন্তাভাবনায় দেশের জন্য যেরূপ গণবা সদৃশ সেনাবাহিনী কল্পিত ছিল সেটা বাস্তবায়ন করতে গেলে বিপ্লব ব্যতীত অন্য প্রথা অকল্পনীয়। তবে পুরনো কথাটাই মনে আসে। সব ভাল যার শেষ ভাল।



www.nagorikpathagar.org

এর নভেম্বরে গোপন সৈনিক সংস্থার জন্য শেষটি ভাল হয়নি। সেনা অভ্যন্তরের জাসদ সমর্থিত ও পরিকল্পিত গোপন সংগঠনটির মূল লক্ষ্য ছিল দেশে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। আর সশস্ত্র ঘটনা বা রক্তপাত ছাড়া তাদের লক্ষ্য অর্জন কোনমতেই সম্ভব ছিল না। রাজপথের আন্দোলনের চরম বিপর্যয়ের ঘটনা তাদের সামনে ওই একমাত্র পথটিকেই আরও অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন তথা ক্ষমতারোহণের মাধ্যম হিসাবে তৎকালীন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দিকে নজর দেয় এবং এ ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্যবস্তু ছিল সেনাবাহিনীর ননকমিশন্ড সৈনিকবৃন্দ। গোপন তৎপরতার মাধ্যমেই সৈনিকদের জাসদ তত্ত্বে দীক্ষা দেয়া হতে থাকে এবং সোজা বাংলায় যাকে বলে মগজ ধোলাই হতে থাকে লোকঃচক্ষু তথা সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থার নজরের আড়ালে। আর এ ক্ষেত্রে তারা যে গোপনীয়তা রক্ষায় সফল হয়েছিলেন, সেটা পরবর্তী ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়।

সুধী পাঠক যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন তাহলে অনুভব করবেন যে, বিবিধ উপাত্তের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে গোপন দলাদলি ও ষড়যন্ত্রসমূহ পরিপক্ব হচ্ছিল। একদল অফিসার (কিছু জ্যেষ্ঠ আওয়ামী রাজনীতিবিদের সহায়তায়) পরিকল্পনা করছিলেন বঙ্গবন্ধুর সরকারকে তথা একদলীয় বাকশাল সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার। অপরদিকে জাসদের প্ররোচনায় চলছিল অন্য এক ষড়যন্ত্র। উভয় ষড়যন্ত্রকারী গ্রুপের মধ্যে কোন সমন্বয় থাকার প্রশ্নই ওঠে না, যেহেতু উভয়ের সংগঠন এবং লক্ষ্য ভিন্ন ও বিপরীতধর্মী ছিল। যেকোন নিয়মেই হোক বা যে কোন প্রেক্ষাপট ও বন্দোবস্তেই হোক ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়ে যায়। এই বিদ্রোহের ফলে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হন, মূল আওয়ামী লীগের কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদ কর্তৃক রাজনৈতিক সরকার গঠন করা হয় এবং বিদ্রোহ সংঘটনকারী অফিসারগণ মূল সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে (বঙ্গভবনে অবস্থান গ্রহণ করত) দেশ ও সেনাবাহিনী পরিচালনায় অংশীদার হয়ে পড়ে। দেশ পরিচালনায় বিদ্রোহীদের নবগঠিত খোন্দকার মোশতাক সরকার কি কি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন (বা নেননি) সেটার বিস্তারিত আলোচনায় আমি যাচ্ছি না। কিন্তু সেনাবাহিনী পরিচালনায় বিদ্রোহীদের হস্তক্ষেপ এবং অংশীদারিত্বের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর কিছুসংখ্যক জ্যেষ্ঠ অফিসারের মনে প্রবলভাবে এবং মাঝারি পর্যায়ের অফিসারদের মনে মৃদুভাবে অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছিল। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার উন্নত কোন বিকল্প না পাওয়ায় কয়েকজন জ্যেষ্ঠ অফিসারের নেতৃত্বে ৩ নভেম্বর '৭৫-এর সকালবেলা একটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন সেনাবাহিনীর তৎকালীন সিজিএস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বীরউত্তম এবং তার প্রধান সহায়তাকারী ছিলেন তৎকালীন ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল বীর বিক্রম। এই অভ্যুত্থানকারীরা একটি সাংঘাতিক বিতর্কিত বা বিপজ্জনক পদক্ষেপ


www.nagorikpathagar.org

নেয়, সেটি হল ৩ নভেম্বর ভোর ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান বীরউত্তমকে গৃহবন্দি করা ও দায়িত্বচ্যুত করা। আরও একটা ঘটনা এই অভ্যুত্থানকারীদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। ৫ নভেম্বর সকাল বেলা ঢাকা মহানগরীতে একটি মাঝারি আকারের মিছিল বের হয় যার নেতৃত্বে ছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফের আপন ভাই (কিছু দিন আগেকার ভূমি প্রতিমন্ত্রী) রাশেদ মোশাররফ এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের মা। মিছিলটি আওয়ামী পন্থী ও ভারতঘেষা স্লোগান দেয়। এতে করে, দেশবাসী ও সাধারণ সৈনিকগণ তাৎক্ষণিকভাবে উপসংহার টানে যে, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বাধীন অভ্যুত্থানটি ভারত ও আওয়ামী লীগ পন্থী। এতে দেশবাসী ও সৈনিকগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জাসদ এবং তাদের প্ররোচনাপ্রাপ্ত বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা প্রথমত ১৫ আগস্টের ঘটনায় হতচকিত হয়ে যায়। তারা পদ্ধতিগতভাবে যখন এই পরিস্থিতির মূল্যায়ন করছিল তখনই ৩ নভেম্বরের ঘটনা ঘটে যায়। এতে তারা নিজেদের বিপ্লবের কর্মপন্থা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত এবং অস্থির হয়ে পড়ে। এরূপ পরিস্থিতিতেই তারা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয় ৭ নভেম্বরের বিপ্লব ঘটানোর। জাসদের প্ররোচনায় সংঘটিত ৭ নভেম্বরের প্রাথমিক ঘটনাগুলোতে নেতৃত্ব দেয় বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার সদস্যগণ; কিন্তু সৈনিক সংস্থার লুক্কায়িত বা গোপন উদ্দেশ্য ঢাকা সেনানিবাসের সাধারণ সৈনিকেরা জানত না। তাই ৭ নভেম্বর বিপ্লব শুরু হওয়ার দুই ঘণ্টার মাথাতেই সৈনিকগণ সেনা প্রধান জিয়াউর রহমানের বাসায় গিয়ে তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে ফেলে এবং পুনরায় সেনাপ্রধানের দায়িত্বে আসীন করে। ওই চার-পাঁচ দিনের ঘটনার আরেকটু বিবরণ দিচ্ছি। ৩ নভেম্বরের ঘটনায় প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট পুরোপুরি জড়িত ছিল। ৩ নভেম্বরের ঘটনাটি আনুষ্ঠানিকভাবে সংজ্ঞায়িত করলে দাঁড়ায়, একজন সেনা অফিসারের নেতৃত্বে একটি সেনা অভ্যুত্থান। দিনের অতি প্রত্যুষে সুপরিকল্পিতভাবে তারা বঙ্গভবন,রেডিও এবং টিভি স্টেশন, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিমানবন্দর ইত্যাদি কবজা করে। বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একদল অফিসার ফাইটার বিমান নিয়ে এ বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ সমর্থন জোগায়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধায় পুনরুল্লেখ করছি যে, ৩ নভেম্বরের সামরিক বিদ্রোহের অন্যতম আনুষঙ্গিক ঘটনা ছিল তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রথমে গৃহবন্দি করা, দ্বিতীয়ত পদচ্যুত করা। জেনারেল জিয়াউর রহমানকে অপদস্ত করার ঘটনাতেই কিন্তু সেনাবাহিনীর একটি অংশ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের বিপক্ষে মানসিক অবস্থান নিয়ে নেয়। ৩ নভেম্বর ঘটনার পর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ মেজর জেনারেল র‍্যাংক প্রমোশন গ্রহণ করেন এবং সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন। ৩,৪,৫,ও ৬ নভেম্বর দেশে কোন প্রকার সরকারের উপস্থিতি জনগণ অনুভব করতে পারেনি। সামরিক বাহিনীসমূহের অভ্যন্তরে এক প্রকার অস্বস্তি ও আশঙ্কা প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করে। এই সুযোগে গোপন সৈনিক সংস্থা বা সংস্থাসমূহে অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে। ৭ নভেম্বরের ঘটনা হচ্ছে সৈনিক সংস্থার নেতৃত্বে শুরু করা এক সেনা বিপ্লব, যা


www.nagorikpathagar.org

চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকেনি। বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে, নিয়ন্ত্রণে থাকেনি। যদি থাকত তাহলে সেনাবাহিনী ও দেশের কি হতো সেটা বলা সহজ হলেও বাস্তবে হতো খুবই কঠিন। ৫ ও ৬ নভেম্বর দু'দিন ও মধ্যবর্তী এক রাত আমি ঢাকা থেকে দূরে ছিলাম বিধায় ওই মহাগুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দিন দু'টির চাক্ষুষ সাক্ষী হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছি। ৬ তারিখ দিনের বেলা ঢাকা সেনানিবাসে যত্রতত্র লিফলেট বিতরণ হয়। মুখে মুখেও একই সংবাদ প্রচার লাভ করে। হ্যান্ডবিল ও মৌখিক সংবাদটির সারমর্ম ছিল যে, ৬ নভেম্বর দিবাগত মধ্যরাত্রি থেকে সৈনিকগণের পক্ষ থেকে বিপ্লব সাধিত হবে, অফিসারগণকে খতম করা হবে। কর্নেল তাহের ও জেনারেল জিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক তথা ভাবের আদান প্রদান বা কর্মপন্থা নিয়ে মতবিনিময় সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করছি না। তবে ৬ নভেম্বর দিবাগত মধ্যরাত্রিতে সৈনিক বিপ্লব শুরুর পরপরই, আমি যাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম সেই দ্বিতীয় বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে হাজির হই। তারপর থেকে পুরো রাত্রি এবং পরের দিনের আংশিক ঘটনাবলীর সাক্ষী। আমার মতো এমন সাক্ষী শত শত ছিল। সৈনিক বিপ্লব শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই সৈনিক বিপ্লব বিরোধী জিয়াভক্ত সৈনিকদের চেষ্টায়, জেনারেল জিয়াউর রহমান বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে যান। কিন্তু সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ অংশই এটা রাতের বেলা জানতে পারেনি। ৭ নভেম্বরের ঘটনাবলীর হুবহু বর্ণনা কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে দেয়া প্রায় অসম্ভব। অনেক অফিসার সাহস করে নিজেদের পরিচিত সৈনিকদের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়েছেন এবং অনুরক্ত সৈনিক ও অফিসারদের সম্মিলিত বুদ্ধিতে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে। অনেক অফিসার সেনানিবাস ছেড়ে গ্রামে বা জনপদে পালিয়ে গেছে। সৈনিকগণও কিছু কিছু ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সীমা লঙ্ঘন করেনি। তবে ৭ নভেম্বর সকাল-বেলার দৃশ্যপট ছিল অনেকটা '৭১ সালের ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বরের মতো। হাজার হাজার সৈনিক জনতার সঙ্গে মিলিত হয়ে ঢাকা শহরের রাজপথে গাড়িতে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য দৃশ্যমান ছিল না। চেইন অফ কমান্ডের উচ্চস্তরে তখন ভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে।

সৈনিক সংস্থার সদস্য সংখ্যা ছিল সীমিত। বিপ্লবকে তারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়। জেনারেল জিয়ার ব্যক্তিগত পরিচিতি ও আবেদনের সামনে সৈনিক সংস্থার ধ্বংসাত্মক আবেদন উড়ে যায়। তাই সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ও বিচক্ষণতায় ৭ তারিখ দিবাগত সন্ধ্যা থেকেই অতি ধীরে ধীরে সেনানিবাসের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা ফিরে আসতে শুরু করে। সৈনিক এবং জনতা একত্র হয়েছিলেন বলেই ওই দিনের ঘটনার নাম বিপ্লব ও সংহতি দিবস। ওই দিনের বিপ্লবী সৈনিকদের হাতে (তাদের জানায় হোক বা অজানায় হোক) বহু অফিসার ও তাদের পরিবার নিহত হয়। ওই দিনের কারণে পরবর্তী সময়ে বহু অফিসারও সৈনিকের বিচার হয়। বিচারে অনেকের মৃত্যুদণ্ড হয়। যাই হোক, সর্বোপরি কথা হল, সেনাবাহিনী টিকে থাকে। দেশ



www.nagorikpathagar.org

ও জাতি রক্ষা পায়। ৭ নভেম্বর হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য দ্বিতীয় বিজয় দিবস। বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, ফ্যাসিবাদ, পরমুখাপেক্ষিতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নাম ৭ নভেম্বর। এই সংগ্রামের নায়ক সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক সৈনিক এবং বাংলার লক্ষ-কোটি জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রপ্রেমিক জনতা। এর মহানায়ক ছিলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, বীরউত্তম।

যথার্থভাবেই বিজয় দিবসের মতো করেই উৎসবমুখর ও তাৎপর্যমণ্ডিত পরিবেশে এই দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়ে দেশের নতুন সরকার ঐতিহাসিক কাজ করেছে। যেকোন কারণে, যেকোন আকাঙ্ক্ষায়, যে কোন কিছুর প্রতিবাদে দেশের জনগণ বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বের প্রতি বিশাল আস্থা প্রকাশ করেছে। ১৯৯১থেকে ১৯৯৬ সাল প্রথম দফা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন রাজনীতিবিদ। কাজ করতে করতে রাষ্ট্র পরিচালনা শিখেছেন। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত জনতার কাতারে থেকে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, '৯১ থেকে ৯৬ সরকার পরিচালনা করেছেন, '৯৬ থেকে ২০০১ সাংবিধানিক পদমর্যাদা নিয়ে সাংবিধানিকভাবে জনগণের রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলনে নেতৃত্বে দিয়েছেন। এখন রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার সময়।

এই দিনের অন্যতম করণীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা ও স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম-এর দেশ ও জাতি গঠনের দর্শন পর্যালোচনা করা, যাতে করে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়া যায়। দু'টি ভিন্ন শতাব্দীর মধ্যবর্তী ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে বাংলাদেশ ও পৃথিবী। রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ও আঙ্গিকে বাংলাদেশী সমাজ আজ বহুধাবিভক্ত এবং বিবিধ সংঘাতে লিপ্ত। গত তিন-চার বছর ধরে বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি জাতীয় ঐক্যের ডাক দিয়ে আসছেন, কিন্তু কোন ফল হয়নি। অপ্রিয় হলেও আমার মতে সত্য যে, রাজনৈতিক ঐকমত্য বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে অসম্ভব। অতএব, ঐকমত্য সৃষ্টির চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না বলেই ধরে নেয়া যায়। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সৈনিক-জনতার ঐক্যের মাধ্যমে দেশ বিশৃঙ্খলা,পরনির্ভর শাসন ও ফ্যাসিবাদী গণতান্ত্রিক শাসনের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিল। ওই রকমই একটি ইঙ্গিত বহন করে ১ অক্টোবরের জনতার রায়। বিগত ১ অক্টোবরের নির্বাচনী ফলাফল কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে জাতীয় ঐক্যের ইঙ্গিত বহন করে। যে সব কারণে রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বিভক্ত, সে কারণগুলো বিভক্তি রেখার উভয় পাশের রাজনৈতিক দলসমূহের কাছে আপসের অযোগ্য। তাই ইস্যুভিত্তিক ঐকমত্যই কাম্য হতে পারে। যে বিষয়টিতে ঐকমত্যের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, সেটি হচ্ছে আমরা দেশ, জাতি ও শক্তি হিসাবে কোন দিকে যাচ্ছি সেটা নিরূপণ করা বা সংজ্ঞায়িত করা। আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নে আমরা অবনতির দিকে যাচ্ছি, বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছি। '৭১ থেকে ২০০০ এই ৩০ বছরের বেশির ভাগ সময় হেলায় নষ্ট করেছি। আগামী ৩০ বছর নষ্ট না করার জন্য ঐকমত্য প্রয়োজন। এই ঐকমত্য আসতে হবে জনগণের মধ্য থেকে।



www.nagorikpathagar.org

জনগণের চাপে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ যেন সঠিক কর্মপন্থা নেন, সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। জনগণ ওইরূপই রায় দিয়েছে গত ১ অক্টোবর। তাই এখন ওই নির্বাচনের পরে যদি সঠিক রাজনৈতিক পরিবেশ এবং আইন-শৃঙ্খলার পরিবেশ ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে আগামীতে আরও দুঃসংবাদ আসবে জাতির জন্য।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম যে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন করার জন্য সেটা এখনও হয়নি। একতাবদ্ধ জাতি গঠনের পক্ষে আমি, কিন্তু যুগপৎ মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য ও আদর্শ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানও যেন অধিষ্ঠিত থাকে সেটাও আমার লক্ষ্য। অতীতে বিভিন্ন অজুহাতে মুক্তিযোদ্ধারা সাংঘাতিকভাবে দলীয় কাজে ব্যবহৃত এবং নিগৃহীত হয়েছেন। আশা করা যাচ্ছে যে নতুন পরিস্থিতিতে ৭ নভেম্বরের চেতনার প্রেক্ষাপটে মুক্তিযোদ্ধারা দলীয়করণ হবেন না বা নিগৃহীত হবেন না। দুটি ক্ষুদ্র উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। একজন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর শমসের মুবিন চৌধুরী (বীর বিক্রম) এখন সরকারের পররাষ্ট্র সচিব। ১৯৯৬ সালের মার্চ মাসে শীর্ষ আমলাদের বিদ্রোহী গ্রুপ যারা জনতার মঞ্চ স্থাপন করেছিলেন তাদের সঙ্গে যোগ না দেয়ায় নিগৃহীত হয়েছেন অনুরূপ যুদ্ধাহত একজন মুক্তিযোদ্ধা, বর্তমানে শ্রীলংকায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আশরাফউদদৌলা। ২০০০ সালের জুন মাসে এবং২০০১ সালের সেপ্টেম্বর বহির্দেশীয় দাওয়াতে শ্রীলংকা গিয়ে শ্রীলংকার গণ্যমান্য নাগরিকদের মুখ থেকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, আমাদের দেশ এবং আমাদের রাষ্ট্রদূতের আন্তরিক প্রশংসা শুনেছি। বাংলাদেশ এবং শ্রীলংকার মধ্যে ১৯৯৭-এ যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও পরিমাণ বিদ্যমান ছিল তার থেকে ওইটি বর্তমানে তিনগুণ বেশি উন্নত ও অধিক। সবই সম্ভব হয়েছে রাষ্ট্রদূতের বাণিজ্যিক কূটনীতির জন্য। জাতি গঠনে মুক্তিযোদ্ধা ও সৈনিকরা যে এখনও উজ্জ্বল ভূমিকা রাখতে পারবেন তার উদাহরণ টানতে গিয়ে এ কথাগুলো বললাম। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের দেশ এগিয়ে যাক এটাই হোক আজকের কামনা।

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী, আপনি যদি চেষ্টা করেন, আপনি যদি সতর্ক হন, তাহলে আপনি শহীদ জিয়া কর্তৃক ছেড়ে যাওয়া(শুধু সরকারপ্রধান নয়, দলীয়প্রধান নয়, রাজনীতিবিদ নয়), রাষ্ট্রনায়ক ও স্টেটসম্যানের শূন্যস্থানটি পূরণ করতে পারবেন। যদি মনে রাখেন যে, আপনার থেকে আপনার পরিবার বড়, আপনার দল থেকে আপনার জাতি ও দেশ বড় তাহলেই মাত্র আপনি সেই উন্নত সোপানে উঠতে পারবেন। আপনার আন্তরিকতা ও চেষ্টার ওপর নির্ভর করবে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আপনার অনুকূলে মানুষের প্রার্থনা, সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আপনার অনুকূলে দয়া। প্রথম ১৫ দিনের এলোমেলো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছাড়া, এখন পর্যন্ত লক্ষণ ভাল। আমরা উৎসাহিত, আমরা আশাবাদী। বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে একটি সম্মানজনক রাষ্ট্র হিসাবে বেঁচে থাকুক।

দৈনিক যুগান্তর ০৭/১১/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

# ৪. নির্বাচনী নিরাপত্তা

## সংসদ নির্বাচন ২০০১ : নিরাপত্তা সম্পর্কিত কিছু ভাবনা

৪ নভেম্বর ২০০০ তারিখে প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যায় যে কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তি লিখেছেন তার মধ্যে অন্যতম মুহাম্মদ ইউনূস। পত্রিকায় ছবি দেখে বোদ্ধা পাঠকের বুঝতে কোনোক্রমেই কষ্ট হয় না যে, ইনি গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনূস। ড. ইউনূসের রচনাটি চিন্তার উদ্রেককারী। আমি ড. ইউনূসের রচনা থেকে দুটি ক্ষুদ্র স্তবক এখানে উদ্ধৃত করছি। 'সামনে আসছে নির্বাচন। এটাই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ—পছন্দ মতো একটা রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার, সামনে এগুনোর জন্য সহায়ক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার। এটা একবাক্যে সবাই মেনে নেবেন যে, নির্বাচন আমাদের সব সমস্যার সমাধান দেবে না। কিন্তু যদি নির্বাচন ঠিকভাবে না হয় তাহলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে। অন্তত এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য আমাদের একটা সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে। জাতির সামনে আগামী কয়েক মাসের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো একটি উৎসবমুখর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করা। এজন্য পুরো জাতিকে একটা মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। এখন থেকে বাস্তব সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ নিতে হবে। নির্বাচন বিষয়ক কোনো প্রস্তুতির ব্যাপারে কোথাও যেন আমাদের গাফিলতি না থাকে এর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত "সন্ত্রাস দমন। উৎসবমুখর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সন্ত্রাসীদের সম্পূর্ণরূপে কাবু করতে হবে। সন্ত্রাসীরাও থাকবে আর নির্বাচনও করবো—এটা কখনই হতে পারে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তাদের শাসনকালের প্রথমার্ধেই সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে সাফল্য দেখাতে হবে। এর জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করার অনেক আগে থেকেই 'যুদ্ধপ্রস্তুতি' নিতে হবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিতে হবে।" ড. ইউনূসের রচনাই আমাকে তাৎক্ষণিক এই প্রবন্ধ লিখতে অনুপ্রাণিত করেছে। সকলে আশা করছে যে, বিরোধী দলের দাবি অনুযায়ী সময়ের আগে না হলেও অন্ততপক্ষে সময় মোতাবেক আগামী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী সংসদ নির্বাচনের জন্য গ্রহণযোগ্য নিরাপত্তা-পরিবেশ সৃষ্টি সম্বন্ধেই এই নিবন্ধ।

নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন সংস্কারের কথা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আলোচনা গত কয়েক মাস যাবৎ বিভিন্ন সংস্থা করে আসছে। তাদের মধ্যে একটি অতি পরিচিত সংস্থার নাম ফেমা (ফেয়ার ইলেকশন মনিটরিং অ্যালায়েন্স)। ফেমার নেতৃত্বে আরো কয়েকটি সংস্থাসহ 'গভারনেন্স কোয়ালিশন' গড়ে উঠেছে। 'সেন্টার ফর স্ট্যাটেজিক অ্যান্ড পিস স্ট্যাডিজ (সিএসপিএস) নামক প্রতিষ্ঠানও এ বিষয়ে আলোচনা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গত কারণেই সিএসপিএস নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা বা নিরাপত্তা



www.nagorikpathagar.org

পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়েছে। ড. ইউনূসের রচনা থেকে উদ্ধৃত দ্বিতীয় অংশটির প্রতি (সন্ত্রাস দমন সম্পর্কে) পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সন্ত্রাস এখন সমাজে এমনভাবে ছড়িয়েছে যে, সেটি ভাষায় বর্ণনা করাও কষ্টকর। এই প্রেক্ষাপটে একটি প্রশ্ন এই যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে যে অল্প সময় পাবেন, সেই অল্প সময়ের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির জন্য কী করতে পারবে। কথাটাকে অন্যভাবেও বলা যায়, যেমন—তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজকে সহজতর করার জন্য আমরা কোনো প্রস্তাব পেশ করতে পারি কিনা। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে খরচ হয়, তার সিংহভাগই ব্যয় হয় নিরাপত্তা প্রদানের খাতে। এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, '৯১ সালের সর্বমোট খরচের ৭০.৫ শতাংশ খরচ ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা খাতে। '৯৬-এর ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে সর্বমোট খরচের ৭৯.০ শতাংশ খরচ ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা খাতে। '৯৬-এর জুনের নির্বাচনে সর্বমোট খরচের ৬২.০ শতাংশ খরচ ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষা খাতে। অতএব নিরাপত্তা প্রদান সম্পর্কিত আলোচনা অতি জরুরি।

নির্বাচনের দিন বা তার পূর্বে যে যে বিষয়ে বা আঙ্গিকে নিরাপত্তা প্রয়োজন হয় সেগুলো অনেকটা এরকম—প্রচারাভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা প্রদান, গ্রামবাসী নিজেদের মধ্যে মতিবিনিময়ের সময় নিরাপত্তা প্রদান, প্রার্থীদের জনসভাতে নিরাপত্তা প্রদান, গ্রামবাসী তথা ভোটারগণ কর্তৃক নিজ নিজ বাড়ি থেকে ভোট কেন্দ্র পর্যন্ত আসা ও ফেরত যাওয়ার সময় নিরাপত্তা প্রদান, ভোট কেন্দ্রে ভোটের বাক্সের নিরাপত্তা ও ব্যালট পেপারসমূহের নিরাপত্তা প্রদান ইত্যাদি। বিশেষত নির্বাচনের দিন নিরাপত্তা কিসে কিসে প্রয়োজন সেটা প্রণিধানযোগ্য। নির্বাচনের দিন নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য দিন থেকে ভিন্নতর। কেননা, ভোট প্রদান ও ভোট গ্রহণ নিশ্চিত করতে গেলে নির্বাচনের দিনই অধিকতর নিরাপত্তা প্রয়োজন। প্রয়োজনের একটি ক্ষেত্র হলো, ভোটারগণ যেন নিজ বাড়ি থেকে বের হয়ে নিরাপদে ভোট কেন্দ্র পর্যন্ত আসতে পারে, পথে যেন কোনো তাৎক্ষণিক বাধা না পায় বা ভবিষ্যতের জন্য হুমকি না পায়। ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় কেউ যেন ভোটারগণকে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রার্থীর অনুকূলে ভোট আদায়ের লক্ষ্যে ভয় দেখাতে না পারে। আরেকটি ক্ষেত্র হলো, নির্বাচন কেন্দ্রের ভেতরে, যেখানে পোলিং এজেন্টরা বসেন এবং যেখানে ব্যালট পেপার হাতে দেওয়া হয় সেখানে যেন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় যে, ভোটারগণ কোনো কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য হয়। অথবা এমন পরিস্থিতির যেন সৃষ্টি না হয় যে, ভোটারগণ ভোট দিতে এলেন কিন্তু নিজের ভোট নিজে দিতে পারলেন না, অন্যরা তার ভোট দিয়ে দিল এবং ভোটার কারো কাছে নালিশও করতে পারবে না। বিগত নির্বাচনগুলোর ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নিরাপত্তার অভাবজনিত সমস্যার জন্যই অনেক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এছাড়া সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ ও প্রদান সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এখন আমি বাংলাদেশে প্রচলিত নিরাপত্তা প্রদানের রেওয়াজ সম্পর্কে আলোচনা করছি।



www.nagorikpathagar.org

নির্বাচনের দিন কাছে এলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র জারি করেন। সেখানে বলা থাকে নির্বাচনের দিন নিরাপত্তা কী হবে। সেখানে আরো বলা থাকে যে, সামরিক বাহিনীসমূহ থেকে কী সাহায্য কী নিয়মে বা কী পরিস্থিতিতে পাওয়া যেতে পারে। নির্বাচনে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য অস্ত্রধারী আনসার ও বিনা অস্ত্রধারী আনসার মোতায়েন করা হয়। বহু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাইফেলসের সদস্যগণকেও মোতায়েন করা হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশে পার্লামেন্টারী নির্বাচন একদিনে অনুষ্ঠিত হয়। '৯১-এর নির্বাচনে পোলিং স্টেশন ছিল ২৪ হাজার ১৪৬টি এবং '৯৬-এর নির্বাচনে ২৫ হাজার ৯৫৭টি পোলিং স্টেশন ছিল। প্রত্যেক নির্বাচনী কেন্দ্রে একজন অস্ত্রধারী পুলিশ, একজন অস্ত্রধারী আনসার এবং অনধিক ১০ জন বিনা অস্ত্রধারী আনসার থাকে। আনসাররা আসে নির্বাচনের দুদিন আগে। তাদের এমবডিমেন্ট করা হয় এবং নির্বাচনের একদিন পরে তাদের ডিসএমবডিমেন্ট করা হয়। সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় সাত থেকে নয় দিনের জন্য। এই ছবিটি দেশের শতকরা ৯০ ভাগ নির্বাচনী কেন্দ্রের জন্য প্রযোজ্য। বাকি আনুমানিক ১০ ভাগ নির্বাচনী কেন্দ্রকে আমরা বলতে পারি ঝুঁকিপূর্ণ। সেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি মূল্যায়নপূর্বক কয়েকজন বেশি পুলিশ বা আনসার মোতায়েন করে। নির্বাচনী কেন্দ্রে সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষ ডিউটি করেন না। মহানগরীগুলোতে বিডিআর নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ ডিউটি করলেও অন্যত্র প্রত্যক্ষ ডিউটি করে না। দেশের প্রতিটি থানায় আলাদাভাবে সেনাবাহিনী বা বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

গত ৪০ থেকে ৫০ বছর যাবৎ যে থিওরি বা তত্ত্বের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী নির্বাচনকালে দায়িত্ব পালন করে আসছে সেটা হলো, 'বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় কর্তব্য পালন' তথা ডিউটিজ ইন এইড অফ সিভিল পাওয়ার। মূল লক্ষ্য হচ্ছে, 'শো অফ ফোর্সরা শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা জনগণের মনে বিশেষত সন্ত্রাসীগণের মনে 'ডিটারেন্স' বা গণ্ডগোল না করার মানসিকতা সৃষ্টি করা। সেনাদল কোনো থানা বা উপজেলায় মোতায়েন হওয়ার পর বেশিরভাগ সময় যানবাহনে করে এবং কম সময়ে পায়ে হেঁটে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে বা টহল দিয়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয়। এটাই তাদের মুখ্য কাজ। যদি নির্বাচনের আগে বা নির্বাচনের দিন কোনো ম্যাজিস্ট্রেট আনুষ্ঠানিকভাবে বলে যে, কোনো এক জায়গায় গণ্ডগোল হচ্ছে যেটা দমন করার জন্য সেনাবাহিনী ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাহলেই মাত্র ওই সেনাদল কাজে লাগে, তা না হলে ওই 'শো অফ ফোর্সেই' তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে।

ওপরে বর্ণিত 'শো অফ ফোর্স' বা ডিটারেন্স তত্ত্বটি কতটা বাস্তবসম্মত সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ। আমার মূল্যায়নে সেনাবাহিনীকে শুধু দেখেই ভয় পাওয়ার দিন চলে গেছে। কোনো উপজেলা বা থানায় সেনাদল সশরীরে কোন জায়গায় অবস্থান করছে, ওই সেনাদলের কাছে কী যানবাহন আছে, থানা বা উপজেলার অভ্যন্তরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে ওই সৈন্যদলের বা তাদের একটি অংশের কত সময় লাগবে



www.nagorikpathagar.org

ইত্যাদি কোনো গোপন জিনিস নয়। এ সকল তথ্য বা মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে, একটি সেনাদল কোনো একটি থানায় মোতায়েনরত অবস্থায় কী কী কাজ করতে পারবে বা কী কী করতে পারবে না সেটা বুদ্ধিমান জনগণ বিশেষত রাজনৈতিক সন্ত্রাসীরা অতি সহজেই হিসাব-নিকাশ করে ফেলতে পারে। এ জন্যই 'শো অফ ফোর্স' তত্ত্বের কার্যকারিতা এখন শেষ। এখন যেকোনো সোনাদলকে বাস্তবে করে দেখাতে হয় বা হবে যে, তারা সন্ত্রাস দমনে বা বিশৃঙ্খলা দমনে কী করবে। সে জন্য বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় সেনা মোতায়েনের বিধি তথা 'টার্মস অফ রেফারেন্স' আংশিকভাবে বদল করার সময় এসেছে। বিশেষত আগামী নির্বাচনের পূর্বে জরুরি ভিত্তিতে এবং গভীর মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আলোচনার এ স্থলে আমরা দু'একটি প্রস্তাব দিতে চাই।

সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দিলেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, দেশের ভেতরে মজুদ সেনাবাহিনী, বিডিআর পুলিশ ও আনসার এদের দিয়েই আমাদের নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে জনগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পাওয়ার পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। এই পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনে টেলিভিশন, রেডিও ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে মোটিভেশনাল বা প্রেষণামূলক প্রচারণা চালাতে হবে। মজুদ সেনা, বিডিআর, পুলিশ ও আনসারকে হঠাৎ করে শুধু নির্বাচনের জন্য সংখ্যায় বৃদ্ধি করা যাবে না। কারণ প্রশিক্ষণ ও ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত। তবে কৃত্রিমভাবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।

মনে করুন, ২০০১ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে কোনো একটি নির্দিষ্ট তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই তারিখের পাঁচ থেকে ছয় সপ্তাহ পূর্বে দেশব্যাপী সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করার জন্য প্রস্তাব করছে। তাদের কাজ হবে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার করা এবং সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করা। একটি সম্মত নীতিমালার আওতায় নির্বাচনের দিন পর্যন্ত প্রত্যেকটি থানায় সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পুলিশের থাকলেও প্রধান সহায়তাকারী হবে সেনাবাহিনী। আরো একটি কথা, সমগ্র দেশে একদিনে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করে যদি তার বদলে তিনটা ভিন্ন তারিখে করা হয় তাহলে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য তিনগুণ বেশি সেনা, বিডিআর পুলিশ ও আনসার পাওয়া যায়। অনেকে বলতে পারেন যে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী তথা সন্ত্রাসীগণও এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কেন্দ্রীভূত বা কনসেনট্রেট হয়ে তাদের শক্তিও তিনগুণ বৃদ্ধি করতে পারে। কথাটি সত্য। তবে নিরাপত্তা বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করতে পারলে সন্ত্রাসীদের বিপক্ষে তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের সকল নির্বাচনী এলাকাসমূহকে তিন বা চার ভাগে বিভক্ত করতে হবে। একটা নিয়ম হচ্ছে প্রশাসনিক বিভাগওয়ারি। যথা, যেকোন একটা তারিখে সিলেট বিভাগ পুরা, বরিশাল বিভাগ পুরা এবং রাজশাহী বিভাগের উত্তর অর্ধেক এই তিনটি ভৌগোলিক এলাকায় যতগুলো নির্বাচনী আসন আছে সেগুলোতে নির্বাচন করা। সমগ্র বাংলাদেশ থেকে যথাসম্ভব অতিরিক্ত সংখ্যক সেনা বিডিআর, পুলিশ ও আনসার সদস্যকে



www.nagorikpathagar.org

সশরীরে ওই ভৌগোলিক এলাকাসমূহে নিতে হবে। এবং ওখানকার স্থায়ী সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ওখানকার কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে ডিউটি করতে হবে। আরেকটি সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে, প্রত্যেকটা প্রশাসনিক বিভাগের অভ্যন্তরেই আসনসমূহকে ভৌগোলিকভাবে তিনটা বা চারটা ভাগে বিভক্ত করা, যাতে করে ওই বিভাগের ভেতরে মোতায়েন করা সেনা, বিডিআর, পুলিশ ও আনসার সদস্যরাই ঘুরে ঘুরে ওখানে ডিউটি করতে পারে। আমি যদিও দুটি প্রস্তাব সামনে রেখেছি, তথাপি আমার নিজের ব্যক্তিগত মতে, দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অধিকতর বাস্তবসম্মত। এ ব্যাপারে আর বিস্তারিত না বললেও চলে। কারণ নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হলে কর্তৃপক্ষই উৎকৃষ্ট পন্থা বা উপায় বের করতে পারবেন। এ রকম সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তার সঙ্গে অনেক খুঁটিনাটি সিদ্ধান্ত জড়িত থাকবে, যার উত্তর এই নিবন্ধে নেই। এই নিবন্ধের কামনাই হচ্ছে আলোচনার প্রেক্ষাপট তৈরি করা এবং নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা।

এখন সেনাবাহিনীর ব্যাপক ও নিবিড় মোতায়েন নিয়ে কয়েকটি কথা। যদি দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পর্যায়ে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্বে আসীন হওয়া মাত্রই সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ ও আনসার কর্তৃপক্ষকে নিয়ে আলোচনা করে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা উদ্ভাবন করে কাজে লেগে যেতে হবে। আমার মতে, পাঁচ বছর পরপর অনুষ্ঠিত বা অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন এমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা ঘটনা যে, জাতীয় প্রয়োজনে সেনাবাহিনী, বিডিআর, পুলিশ বা আনসারকে একনাগাড়ে দেড় থেকে দুই মাস সরেজমিনে ডিউটিরত রাখা অতি ক্ষুদ্র একটি ত্যাগ। যথেষ্ট সময় নিয়ে নিরাপত্তা বাহিনীকে মোতায়েন না করলে তাদের পক্ষে পরিস্থিতির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা সম্ভব নয়। অন্য দিকে পরিস্থিতির ওপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে হলে ভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দায়িত্বপূর্ণ এলাকা নিবিড়ভাবে চিনতে হবে, স্থানীয় জনগণের মনমানসিকতাকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতে হবে এবং জনগণের সহায়তা নিয়েই অস্থায়ীভাবে গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে খবরাখবর পাওয়া যায়। এই তিনটা কাজ করতে পারলেই মাত্র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার জন্য মোতায়েন সেনা দল একটি কার্যকর অপারেশনাল প্লান বানাতে পারবে। সেনাবাহিনী মোতায়েন সম্পর্কিত প্রস্তাবটি বা প্রস্তাবগুলো গতানুগতিকতার বিপরীতে অবস্থিত।

আমাদের দেশে নির্বাচনকালীন যে নিরাপত্তা ব্যবস্থার রীতি, তা খুবই গতানুগতিক। গত ৩০ বছরেও এই ব্যবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। বহু বিষয়ে পরিবর্তন সূচিত হলেও নির্বাচনকালীন নিরাপত্তার শৈথিল্য রীতিমতো আশ্চর্যের বিষয়। সুতরাং এই গতানুগতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পরিবর্তন অপরিহার্য। গুটিকতক সৈন্যবাহিনী দিয়ে একটি থানার সামগ্রিক নিরাপত্তা নিশ্চিত একটা কষ্টকর ব্যাপার। এটা আমরা চোখে দেখেও এ ব্যাপারে আমাদের কারোর বিশেষ কোনো মাথাব্যথা নেই, যা অপ্রিয় হলেও সত্য। সেজন্যই সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্তে ওপরের কথাগুলো বিনীতভাবে উপস্থাপন করলাম।

দৈনিক প্রথম আলো ১৮/১১/২০০০ইং



www.nagorikpathagar.org

# নির্বাচনকালে নিরাপত্তা-পরিবেশ ও সেনাবাহিনীর ভূমিকা

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত হবে কি না সেটা নিয়ে বিভিন্ন রকমের গুঞ্জন বাজারে আছে। বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর বিভিন্ন বক্তব্যকে সংশ্লিষ্ট প্রতিপক্ষ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করে পারস্পরিক দোষারোপ করছে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্পর্কে পারস্পরিক আন্তরিকতা চ্যালেঞ্জ করছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, যে কোন ত্যাগ স্বীকার করেই হোক আগামী জাতীয় নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্যভাবে অনুষ্ঠিত করা প্রয়োজন। আমি মনে করি আগামী জাতীয় নির্বাচন বাংলাদেশে গত ৩০ বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হবে। নির্বাচন কি হবে কি হবে না এই দুইটি সম্ভাবনার মধ্যে আমি প্রথম সম্ভাবনা অর্থাৎ নির্বাচন হবে মনে করেই এ কলাম লিখছি। নির্বাচন না হলে কি করা যাবে বা পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে সে বিষয়ে পরবর্তী সময়ে ১৩ জুলাইয়ের পর বলাই অধিকতর সঙ্গত হবে। পত্রিকার কলামের ক্ষুদ্র পরিসরে সব বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেয়া অসুবিধাজনক। তাই কিছু কথা ইঙ্গিতে বলে মূল বক্তব্যের ভাবসম্প্রসারণ করব। আগামী নির্বাচনে বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সেটা শুধু নির্বাচনী ইশতেহার (ইলেকশন মেনিফেস্টো) ভিত্তিক নয়। ইংরেজিতে একটা পুরনো কথা আছে 'দেয়ার আর মোর নিউজ দ্যান আর রিপোর্টেড ইন দি নিউজ পেপার' অর্থাৎ খবরের কাগজে যত খবর ছাপা হয় তার থেকে বেশি খবর অপ্রকাশিত থাকে। অন্ততপক্ষে খবরের পেছনের খবরটা বেশিরভাগ পত্রিকাতেই আসে না। বাংলাদেশে বিদ্যমান বড় রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত। হয়তো তত্ত্বাবধায়ক সরকার আসার পরপরই সবার ইশতেহার পাওয়া যাবে। তবে ইশতেহারের বাইরেও যে সব ইস্যু বিষয় ভোটারদের মনে প্রভাব ফেলবে সেগুলোর মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে : এক, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক, দুই, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক, তিন, যুদ্ধাপরাধীদের প্রসঙ্গ, চার, এনজিওদের ভূমিকা, পাঁচ, বাঙালি বনাম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রচার ও প্রসার, ছয়, ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা, সাত, জননিরাপত্তা আইনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যবহার, আট, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত শান্তি চুক্তি, নয়, ভারতের সাংঘাতিক রকমের অসম ও বাংলাদেশের জন্য প্রতিকূল বাণিজ্য এবং দশ, সংসদে মহিলাদের সদস্য সংখ্যা। যে ইস্যুটি হয়তো বা নির্বাচনী ইশতেহারে আসবে কিন্তু যথেষ্ট ব্যাখ্যা সহকারে নয় সেটি হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক নির্বাচনের আগে জনগণকে দেয়া ওয়াদাগুলো পূরণ করা সম্পর্কে এবং পূর্ববর্তী সরকারগুলোকে দোষারোপ করা সম্পর্কে। আমি কোন মতেই শুধু বর্তমানের আওয়ামী লীগ সরকার সম্পর্কে বলছি না। আমি বিগত ২১ বছরের সব সরকার সম্বন্ধে



www.nagorikpathagar.org

বলছি। তবে অপরিহার্যভাবে বর্তমান ও নিকট-অতীতে স্মৃতিতে এবং অনুভূতিতে প্রাধান্য পায়।

বর্তমান সরকারের অন্যতম সাফল্য কৃষিখাতে। আরেকটি সাফল্য পার্লামেন্টে সংসদীয় কমিটিগুলোকে শক্তিশালীকরণ। তৃতীয় সাফল্য হল বিগত বছরগুলোতে একাধিক দুর্যোগ সম্মানের সঙ্গে মোকাবেলা। চতুর্থ সাফল্য ইউনিয়ন পর্যায়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নারীর ক্ষমতায়ন শুরু। এই সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি, দেশে নাগরিকগণের জানমালের চরম নিরাপত্তাহীনতা এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে অপারগতা। দেশবাসীর জন্য সুখবর হল ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত একটি সরকার পাঁচ বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছে এবং দেশবাসীর মনের আকাঙ্ক্ষা পরবর্তী সরকারও যেন ভোটের মাধ্যমেই ক্ষমতায় আসে। উপরে বর্ণিত প্রেক্ষাপটেই আমার মন্তব্য গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে বাংলাদেশকে বেঁচে থাকতে হলে, জনগণের বিশ্বাস, অনুভূতি ও সংস্কৃতি সমুন্নত রাখতে হলে, জনগণের নির্ভেজাল মতামতের ওপর ভিত্তি করেই কেবল আগামী সরকার নির্বাচিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি।

আগামী নির্বাচনের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান বা নাগরিক সংগঠন বিগত ১/২ বছর বা দীর্ঘ সময় নিয়ে কাজ করছেন। গত ২৬ জুন দৈনিক যুগান্তরের চতুর্থ পৃষ্ঠায় মিজানুর রহমান খান লিখিত নিবন্ধটিতেও এরকম কিছু ইঙ্গিত আছে। নির্বাচনের অনেকগুলো আঙ্গিকের মধ্যে একটি আঙ্গিক হচ্ছে 'নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা' ও 'নিরাপত্তা পরিবেশ'। দুই জোড়া শব্দযুগল এখানে উল্লেখযোগ্য যথা-'নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা' ও 'নিরাপত্তা পরিবেশ'। এ সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে কেয়ারটেকার সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার দিন থেকে জাতীয় সংসদের সব আসনে নির্বাচন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত সময়টিকে নির্বাচনকাল মনে করতে পারি। কেয়ারটেকার সরকার আসতে এখনও দুই সপ্তাহের মতো থাকলেও নির্বাচনী প্রচারণা নিঃসন্দেহে শুরু হয়ে গেছে। 'নিরাপত্তা পরিবেশ' নামক শব্দযুগল কিছুসংখ্যক সম্মানিত পাঠকের কাছে অপরিচিত ঠেকার সম্ভাবনা প্রচুর। এর ব্যাখ্যা একটু পরেই উপস্থাপন করছি।

তার আগে পুরনো পত্রিকা ঘেঁটে আগেকার কয়েকটি নির্বাচন সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য তুলে ধরছি। ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে সদ্য সমাপ্ত সংসদ নির্বাচন সম্বন্ধে মন্তব্য 'এই নির্বাচন কেবল সরকারদলীয় প্রার্থীদের জন্যই অবাধ ছিল এবং কোন অর্থেই ইহা নিরপেক্ষ হয় নাই। (ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী)' ৪ মে ১৯৮৬ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে ৭ মে ৮৬ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন সম্বন্ধে শেখ হাসিনা দেশবাসীর প্রতি বলেছিলেন 'কারচুপি প্রতিরোধে প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে কমিটি গঠন করুন।' ৭ মে, ১৯৮৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচন সম্বন্ধে ৮ মে '৮৬-তে ইত্তেফাকে প্রকাশিত শেখ হাসিনার মন্তব্য ছিল 'শুধু কারচুপি নয়, এবার ভোটের ডাকাতি হইয়াছে।' ওই নির্বাচনে অভিযুক্ত অনিয়মের প্রতিবাদে ১৪ মে, ১৯৮৬ তারিখে



www.nagorikpathagar.org

আওয়ামী লীগ হরতাল ডেকেছিল। ওই হরতাল প্রসঙ্গে একজন রিকশাচালকের মন্তব্য ছিল,.....'তাহারা নির্বাচনও করিবেন আবার হরতালও ডাকিবেন, আমরা যাবো কোথায়।' ১৯৮৬ সালে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আগত দু'জন ব্রিটিশ সংসদ সদস্য লর্ড এনালস এবং মার্টিন ব্রান্ডন ব্রাবোতো নির্বাচনের পর ওই নির্বাচনকে 'গণতন্ত্রের ট্র্যাজেডি' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। ওই সময় ১৮ মে, '৮৬ তারিখে দৈনিক ইত্তফাকে মইনুল হোসেন লিখিত নিবন্ধে লিখেছিলেন "বিভিন্ন স্থানে বলাবলি চলিতেছে যে, আওয়ামী লীগ বাহিরে গরম বক্তৃতা-বিবৃতি দিলেও হরতাল ডাকিলেও ভিতরে ভিতরে চলিতেছে জাতীয় পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের পাঁয়তারা।

.....যাহারা দেশের মঙ্গল চিন্তা করেন, যাহারা এখনও ব্যবসায়িক স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা রাজনীতিকে কলুষিত করার কথা ভাবেন না, দেশের স্বার্থকে যাহারা ব্যক্তির স্বার্থের চাইতে বড় করিয়া দেখেন তাহাদেরই আজ চিন্তা ভাবনা করিয়া দেখিতে হইবে...। এই নির্বাচনকে টিকাইয়া রাখা হইলে উহা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য কি দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে...এ কথা শুধু বর্তমান সামরিক সরকারের উদ্দেশ্যে বলিতেছি না, রাজনৈতিক সরকারের আমলেও নিরপেক্ষ নির্বাচন করিতে হইলে উহা নির্দলীয় অস্থায়ী সরকারের অধীনে করিবার শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখার সময় আসিয়াছে। নির্বাচনে জনমতের প্রতিফলন পড়িবে না, নির্বাচনও চুরি-ডাকাতির বিষয় হইবে ইহা মানিয়া নেওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় শক্তি দলনিরপেক্ষভাবে প্রয়োগ করা হইলে ব্যক্তিবিশেষের সশস্ত্র বাহিনীকে নিরস্ত্র করা মোটেই কঠিন নহে।" কয়েক বছর পর দৈনিক সংবাদে '৯৪ সালের ১০ জুলাই সৈয়দ বদরুদ্দীন হোসেন এক প্রবন্ধে লিখেছেন "আসলে একটা পরিচ্ছন্ন নির্বাচন অনেকাংশে নির্ভর করে আমলাতন্ত্র বা প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের উপর। তাদের এই নিরপেক্ষতা ও দায়িত্ববোধ আমরা দেখেছি '৫৪, '৭০ এবং ৯১-এর নির্বাচনে। স্বাধীনতার পরপরই এমন একটা প্রক্রিয়া এ দেশের শাসনে শুরু হয়েছিল, যার ফলে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মনোবল আজ সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। এই প্রক্রিয়ায় রয়েছে হঠাৎ বদলি, নির্ধারিত সময়ের আগে অবসর প্রদান, পাপ্য পদোন্নতি না দেয়া, বিনা কারণে পদাবনতি, কিংবা কোন কর্মকর্তাকে ওএসডি করে দেয়া। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের শাস্তি দেয়া হয় সরকারি দলের স্বার্থে কাজ না করার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই একজন সরকারি চাকরিজীবী এই 'রাজরোষের' ভয়ে ভীত থাকেন এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা দুর্বল হয়ে আসে, মনোবল ভেঙে যায়। আমলাতন্ত্রকে সাধারণভাবে গণতন্ত্রের বিরোধী বলা হয়। এর পেছনে কারণ রয়েছে, ঝুঁকি রয়েছে-একথা স্বীকার করে নিয়েও বলতে হয় গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলার ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের সহযোগিতার প্রয়োজনও কম নয় যদি এই আমলাতন্ত্র হয় ন্যায়পরায়ণ, নিরপেক্ষ, দৃঢ় মনোবল, দায়িত্ববোধ এবং দেশ ও দেশের মানুষকে ক্ষুদ্র স্বার্থ, লোভ-লালসার উর্ধ্বে রাখার মানসিকতার অধিকারী। এই দৃঢ় মনোবল ও



www.nagorikpathagar.org

মানসিকতা গড়ে তোলার আন্দোলন প্রশাসনের ভেতর থেকেই সূচিত হবে। দেশের মানুষ অবশ্যই প্রশাসনকে অভিনন্দন জানাবে, সমর্থনে এগিয়ে আসবে।" ৬ জানুয়ারি ১৯৯৫ দৈনিক সংবাদে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নিউজ উইকের সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনের শিরোনাম ছিল 'বর্তমান সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়।' প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই শেখ হাসিনা বলেছিলেন, "অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, ভোটারদের নিরাপত্তা বিধান ও জনগণের ভোটদানের অধিকার নিশ্চিত করাই আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য।"

বর্তমান সরকারের সমর্থক বলে পরিচিত দৈনিক জনকণ্ঠে ২২ নভেম্বর, ১৯৯৯ তারিখে একটি কলামের শিরোনাম ছিল, 'টাঙ্গাইল স্টাইলের নির্বাচন আর কত কাল?' ১৬ জুলাই ২০০০ তারিখে এককালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবু হেনা প্রথম আলো'কে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে বলেন, 'বর্তমান নির্বাচন আইনে শতভাগ সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়।' ১৭ জুলাই, ২০০০ তারিখে ফেমার সঙ্গে আলোচনার সময় সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির তৎকালীন সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, "অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে যে আগামী নির্বাচনে পরিকল্পিত সহিংসতার ভয়াবহ খেলা হইবে। দায়িত্বহীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব, অস্ত্রের অবাধ চলাচল ও সীমাহীন দুর্নীতির কারণে নির্বাচন পর্যন্ত ব্যাপক সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ডের আশঙ্কা উচ্চকিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় অপরাধ দমনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সেনাবাহিনী মোতায়েন কার্যকর প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করিতে পারে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পূর্ব দায়িত্ব হিসাবে নির্বাচনকালে সেনাবাহিনী মোতায়েন করিতে হইবে" (ইত্তেফাক ১৮ জুলাই ২০০)

এইরূপ আলোচনার ধারাবাহিকতায় নির্বাচনকালে মোতায়েন সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেয়া সম্ভব কিনা বা উচিত কিনা এ নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনা শুরু হয়। ১৩ আগস্ট ২০০০ তারিখে দৈনিক মানবজমিন এই বিষয়ে দুই পাতাব্যাপী এক বিতর্কের আয়োজন করে। উপরে যতগুলো উদ্ধৃতি দিলাম এগুলোর সারমর্ম বা নির্যাস হচ্ছে, নির্বাচনকালে সন্ত্রাস ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগামী নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে নিরাপত্তা-পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন, তার জন্য দীর্ঘমেয়াদে সেনাবাহিনী মোতায়েন বিবেচনা করতে হবে।

৪ নভেম্বর, ২০০০ তারিখে একটি বড় দৈনিকের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যায় যে কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তি লিখেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. ইউনূস। তাঁর রচনাটি চিন্তার খোরাক যোগায়। আমি ড. ইউনূসের রচনা থেকে দুটি ক্ষুদ্র স্তবক এখানে উদ্ধৃতি করছি। "সামনে আসছে নির্বাচন এটাই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ – পছন্দমতো একটা রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করার, সামনে এগুনোর জন্য সহায়ক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার। এটা একবাক্যে সবাই মেনে নেবেন যে, নির্বাচন আমাদের সব সমস্যার সমাধান দেবে না। কিন্তু নির্বাচন যদি সঠিকভাবে না হয় তাহলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে। অন্তত এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে জাতিকে বাঁচানোর জন্য



www.nagorikpathagar.org

আমাদের একটা সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে। জাতির সামনে আগামী কয়েক মাসের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর একটি হচ্ছে উৎসবমুখর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করা। এ জন্য পুরো জাতিকে একটা মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। এখন থেকে বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ নিতে হবে। নির্বাচনবিষয়ক কোন প্রস্তুতির ব্যাপারে কোথাও যেন আমাদের গাফিলতি না থাকে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।" দ্বিতীয়ত, "সন্ত্রাস দমন। উৎসবমুখর শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সন্ত্রাসীদের সম্পূর্ণরূপে কাবু করতে হবে। সন্ত্রাসীরাও থাকবে আর নির্বাচনও করব– এটা কখনই হতে পারে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে তাদের শাসনকালের প্রথমার্ধেই সন্ত্রাসীদের দমনে সাফল্য দেখাতে হবে। এর জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করার অনেক আগে থেকেই 'যুদ্ধপ্রস্তুতি' নিতে হবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিতে হবে।" যে সব কারণে বা যেই দেশপ্রেম-সিক্ত প্রেরণায় ড. ইউনূস উপরের কথাগুলো বলেছেন ঠিক ওই কারণেই আমি ও আমার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুরো ২০০০ সাল কাজ করেছি। 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজ' (সিএসপিএস) নামক বেসরকারি উদ্যোগাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা 'থিংক ট্যাংক' পুরো ২০০০ সালে এ বিষয়ে বিবিধ কাজ করে। তারা তিনটি ভিন্ন তারিখে ভিন্ন সেমিনার বা আলোচনার আয়োজন করে। বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ :

এক, 'নির্বাচনকালে জনগণের নিরাপত্তা বিধান করা বা নিরাপত্তা পরিবেশ সৃষ্টি', দুই, 'নির্বাচনকে বিশ্বাসযোগ্য করা' এবং তিন, 'নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব নিরপেক্ষভাবে পালন করা' (১২ মার্চ ২০০০, ১০ আগস্ট ২০০০ এবং ২০ নভেম্বর, ২০০০ তারিখের ১০/১২টি প্রধান সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ দ্রষ্টব্য)। এছাড়াও ৯ মে. ২০০০ তারিখের দৈনিক প্রথম আলো, ১০ মে, ২০০০ তারিখের দৈনিক সংগ্রাম, ১১ মে, ২০০০ তারিখের দৈনিক অর্থনীতি, ১৪ মে, ২০০০ তারিখের দৈনিক যুগান্তর এবং ১৬ মে, ২০০০তারিখের দৈনিক মানবজমিন সিএসপিএস-এর পক্ষ থেকে কনসোলিডেটেড বা সুসংহত আকারে উপস্থাপিত সব সুপারিশ বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করে। আলোচ্য সেমিনার বা আলোচনা সভাগুলোয় ফেমাসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো, একাধিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্যবৃন্দ, অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা, প্রবীণ সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ঢাকার বাইরে দূরের জেলা থেকে আসা স্কুল শিক্ষক ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছিলেন। যদিও তিনটি সেমিনারেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন তবু আলোচনা শেষে সুপারিশগুলো প্রায় অভিন্ন হয়। অনেকগুলো আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আমি শুধু দুইটি আলোচনা করব।

এক. নির্বাচনের কতদিন আগে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা উচিত? মোতায়েন সেনাবাহিনীর কাজ কি হবে? মোতায়েন সেনাবাহিনীর ক্ষমতা কি হবে?



www.nagorikpathagar.org

দুই. অতীতে সব সময় বাংলাদেশে এক দিনেই নির্বাচন হয়েছে: পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে একাধিক দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যায় কিনা এবং করলে কিভাবে করা যায়?

একটু আগে ড. ইউনূসের রচনা থেকে উদ্ধৃত দ্বিতীয় অংশটির প্রতি (সন্ত্রাস দমন সম্পর্কে) পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সন্ত্রাস এখন সমাজে এমনভাবে ছড়িয়েছে যে তা ভাষায় বর্ণনা করাও কষ্টকর। গত ২৪ জুন, দৈনিক যুগান্তরের ৩য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত বামধারার প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের বক্তব্য উদ্ধৃত করছি : 'শেখ হাসিনার পাঁচ বছরের শাসন ছিল দুর্নীতিবাজ আর সন্ত্রাসীদের স্বর্ণযুগ। কৃষকরা পরিশ্রম করে ঘাম ঝরিয়ে বাম্পার ফসল ফলিয়ে জাতীয় উৎপাদনের সূচক বৃদ্ধি করলেও এই দুর্নীতিবাজরা ওই প্রবৃদ্ধি অর্জনের সবটাই খেয়ে ফেলেছে। আওয়ামী লীগকে আরেকবার ক্ষমতায় বসালে এরপর মাঠটুকু থাকবে কিনা সন্দেহ। বড় দলগুলো নির্বাচনকে কালো টাকা, সন্ত্রাস-সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে পরিণত করেছে।" এই প্রেক্ষাপটে একটি প্রশ্ন এই যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে যে অল্প সময় পাবেন, সেই সময়ের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির জন্য কী করতে পারবে। কথাটাকে অন্যভাবেও বলা যায়, যেমন-তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাজকে সহজ করার জন্য আমরা কোন প্রস্তাব পেশ করতে পারি কিনা। নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যে খরচ হয়, তার সিংহভাগই ব্যয় হয় নিরাপত্তা প্রদানের খাতে। এক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, '৯১ সালের সর্বমোট খরচের ৭০.৫ শতাংশ খরচ ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা খাতে। '৯৬-এর ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে সর্বমোট খরচের ৭৯.০ শতাংশ খরচ ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা খাতে। '৯৬-এর জুনের নির্বাচনে সর্বমোট খরচের ৬২.০ শতাংশ খরচ ছিল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা খাতে। এত খরচ এবং আয়োজনের পরেও নিরাপত্তা কতটুকু দেয়া সম্ভব হয়েছে বা হবে সেই সম্পর্কিত আলোচনা অতি জরুরি।

নির্বাচনের দিন বা তার আগে যে সব বিষয়ে বা আঙ্গিকে নিরাপত্তা প্রয়োজন হয় সেগুলো অনেকটা এরকম- প্রচারাভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা প্রদান, গ্রামবাসীদের নিজেদের মধ্যে মতবিনিময়ের সময় নিরাপত্তা প্রদান, গ্রামবাসী তথা ভোটারগণ কর্তৃক নিজ নিজ বাড়ি থেকে ভোটকেন্দ্র পর্যন্ত আসা ও ফেরত যাওয়ার সময় নিরাপত্তা প্রদান, ভোটকেন্দ্রে ভোটের বাক্সের নিরাপত্তা ও ব্যালট পেপারগুলোর নিরাপত্তা প্রদান ইত্যাদি। বিশেষত নির্বাচনের দিন নিরাপত্তা কিসে কিসে প্রয়োজন সেটা প্রণিধানযোগ্য। নির্বাচনের দিন নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা অন্যান্য দিন থেকে ভিন্নতর। কেননা ভোট প্রদান ও ভোট গ্রহণ নিশ্চিত করতে গেলে নির্বাচনের দিনই অধিক নিরাপত্তা প্রয়োজন। প্রয়োজনের একটি ক্ষেত্র হল, ভোটারগণ যেন বাড়ি থেকে বের হয়ে নিরাপদে ভোটকেন্দ্র পর্যন্ত আসতে পারে পথে যেন তাদের কোন তাৎক্ষণিক বাধা বা ভবিষ্যতের জন্য হুমকির মোকাবেলা করতে না হয়।



www.nagorikpathagar.org

ভোট দেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায় কেউ যেন ভোটারগণকে কোন সুনির্দিষ্ট প্রার্থীর অনুকূলে ভোট আদায়ের লক্ষ্যে ভয় দেখাতে না পারে। আরেকটি ক্ষেত্র হল, নির্বাচন কেন্দ্রের ভেতরে, যেখানে পোলিং এজেন্টরা বসেন এবং যেখানে ব্যালট পেপার হাতে দেয়া হয় সেখানে যেন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় যে, ভোটারগণ কোন নির্দিষ্ট প্রার্থীকে ভোট দিতে বাধ্য হয়। অথবা এমন পরিস্থিতির যেন সৃষ্টি না হয় যে, ভোটারগণ ভোট দিতে এলেন কিন্তু নিজের ভোট নিজে দিতে পারলেন না, অন্যরা তার ভোট দিয়ে দিল। অথচ ভোটার কারও কাছে নালিশও করতে পারল না। বিগত নির্বাচনগুলোর ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নিরাপত্তার অভাবজনিত সমস্যার জন্যই অনেক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এছাড়া সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ ও প্রদান সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এখন আমি বাংলাদেশে প্রচলিত নিরাপত্তা প্রদানের রেওয়াজ সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। নির্বাচনের তারিখ এগিয়ে এলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি পরিপত্র জারি করে। তাতে বলা থাকে নির্বাচনের দিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা কী হবে। তাতে আরও বলা থাকে যে, সামরিক বাহিনীগুলো থেকে কী সাহায্য কী নিয়মে বা কী পরিস্থিতিতে পাওয়া যেতে পারে। নির্বাচনে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য অস্ত্রধারী আনসার ও বিনা অস্ত্রধারী আনসার মোতায়েন করা হয়। বহু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রাইফেলসের সদস্যগণকেও মোতায়েন করা হয় কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সেনাবাহিনীকে মোতায়েন করা হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশে পার্লামেন্টারি নির্বাচন একদিনে অনুষ্ঠিত হয়। '৯১-এর নির্বাচনে পোলিং স্টেশন ছিল ২৪ হাজার ১৪৬টি এবং '৯৬-এর নির্বাচনে ২৫ হাজার ৯৫৭টি। প্রত্যেক নির্বাচনী কেন্দ্রে একজন অস্ত্রধারী পুলিশ, একজন অস্ত্রধারী আনসার এবং অনধিক ১০ জন বিনা অস্ত্রধারী আনসার থাকে। আনসাররা আসে নির্বাচনের দুদিন আগে। তাদের এমবডিমেন্ট করা হয় এবং নির্বাচনের একদিন পরে তাদের ডিসএমবডিমেন্ট করা হয়। সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় সাত থেকে নয় দিনের জন্য। এই ছবিটি দেশের শতকরা ৯০ ভাগ নির্বাচনী কেন্দ্রের জন্য প্রযোজ্য। বাকি আনুমানিক ১০ ভাগ নির্বাচনী কেন্দ্রেকে আমরা বলতে পারি ঝুঁকিপূর্ণ। সেখানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি মূল্যায়নপূর্বক কয়েকজন দেশি পুলিশ বা আনসার মোতায়েন করে। নির্বাচনী কেন্দ্রে সেনাবাহিনী প্রত্যক্ষ ডিউটি করে না। মহানগরীগুলোতে বিডিআর নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রত্যক্ষ ডিউটি করলেও অন্যত্র প্রত্যক্ষ ডিউটি করে না। দেশের প্রতিটি থানায় আলাদাভাবে সেনাবাহিনী বা বিডিআর মোতায়েন করা হয়।

গত ৪০ থেকে ৫০ বছর যাবৎ এই থিওরি বা তত্ত্বের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী নির্বাচনকালে দায়িত্ব পালন করে আসছে সেটা হল, 'বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় কর্তব্য পালন তথা ডিউটিজ ইন এইড অব সিভিল পাওয়ার। মূল লক্ষ্য হচ্ছে, 'শো অব ফোর্স' বা শক্তি প্রদর্শনের দ্বারা জনগণের মনে বিশেষত সন্ত্রাসীদের মনে 'ডিটারেন্স' বা গণ্ডগোল না করার মানসিকতা সৃষ্টি করা। সেনাদল কোন থানা বা উপজেলায় মোতায়েন হওয়ার



www.nagorikpathagar.org

পর বেশির ভাগ সময় যানবাহনে করে এবং কম সময়ে পায়ে হেঁটে বিভিন্ন এলাকার গিয়ে বা টহল দিয়ে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয়। এটাই তাদের মুখ্য কাজ। যদি নির্বাচনের আগে বা নির্বাচনের দিন কোন ম্যাজিস্ট্রেট আনুষ্ঠানিকভাবে বলেন যে, কোন এক জায়গায় গণ্ডগোল হচ্ছে যেটা দমন করার জন্য সেনাবাহিনীর প্রয়োজন। তাহলেই মাত্র ওই সেনাদল কাজে লাগে, তা না হলে ওই 'শো অব ফোর্সেই' তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে। জনাব মেনন থেকে শোনা একটি অতি ক্ষুদ্র উদারহণ দিচ্ছি। ১৯৯৬ সালে নির্বাচনের সময় ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন তার নির্বাচনী এলাকা উজিরপুর উপজেলার একটি কেন্দ্রে প্রতিপক্ষ কর্তৃক কেন্দ্র দখল ও ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। সংবাদ দেয়ার আড়াই ঘণ্টা পর একটি সেনাদল এসে ম্যাজিস্ট্রেটের অভাবে অন্য কিছু করতে না পেরে শুধু মেনন সাহেবকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে যায়। কেন্দ্র দখল রোধ করা যায়নি এবং সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় আনাও সম্ভাব হয়নি। উপরে বর্ণিত 'শো অব ফোর্স' বা ডিটারেন্স তত্ত্বটি এই পরিস্থিতিতে কতটা বাস্তবসম্মত সেটা প্রশ্নসাপেক্ষ। আমার মূল্যায়নে সেনাবাহিনীকে শুধু দেখেই ভয় পাওয়ার দিন চলে গেছে। কোন উপজেলা বা থানায় সেনাদল সশরীরে কোন জায়গায় অবস্থান করছে, ওই সেনাদলের কাছে কী যানবাহন আছে, থানা বা উপজেলার অভ্যন্তরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে ওই সেনাদলের বা তাদের একটি অংশের কত সময় লাগবে ইত্যাদি কোন গোপন ব্যাপার নয়। এ সব তথ্য বা মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে, একটি সেনাদল কোন একটি থানায় মোতায়েনরত অবস্থায় কী কী কাজ করতে পারবে বা কী কী করতে পারবে না সেটা বুদ্ধিমান জনগণ বিশেষত রাজনৈতিক সন্ত্রাসীরা অতি সহজেই হিসাব-নিকাশ করে ফেলতে পারে। রাজনৈতিক সন্ত্রাসীরা মোবাইল ফোন, ওয়াকিটকি সেট ও হোন্ডা মোটরসাইকেল সমৃদ্ধ ও বহু প্রকারের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। এজন্যই 'শো অব ফোর্স' তত্ত্বের কার্যকারিতা এখন শেষ। এখন যে কোন সেনাদলকে বাস্তব করে দেখাতে হয় বা হবে যে, তারা সন্ত্রাস দমনে বা বিশৃঙ্খলা দমনে কী করবে। সেজন্য বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় সেনা মোতায়েনের বিধি তথা 'টার্মস অব রেফারেন্স' আংশিকভাবে বদল করার সময় এসেছে। বিশেষত আগামী নির্বাচনের আগে জরুরি ভিত্তিতে এবং গভীর মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

সেনাবাহিনীতে ৫ বছরের অধিক চাকরি হয়েছে কিন্তু কোন প্রকারের নির্বাচনী ডিউটিতে কর্তব্যে যায়নি এমন জনবল শতকরা চল্লিশের উপরে হবে না বলে মনে করি। এগার বছরের উপরে চাকরি হয়েছে কিন্তু কোন প্রকারের নির্বাচনী ডিউটি করেনি এরকম জনবল শতকরা ২০ ভাগের বেশি হবে না মনে করি। নির্বাচনের প্রাক্কালে সেনাবাহিনীকে কি আদেশ দেয়া হয় বা হয় না ইত্যাদি বিষয় কস্মিনকালে প্রকাশ্যে আলোচিত হয়েছে। ১৯৯৬ সালের জুন মাসের পরে চার-পাঁচজন সম্মানিত সাংবাদিক



www.nagorikpathagar.org

এবং চার-পাঁচজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তার পরিশ্রমের বদৌলতে প্রতিরক্ষা বা সামরিক বাহিনী সম্পর্কিত বিষয়ে লেখালেখি সহজ স্বচ্ছ হয়ে আসছে। তাই নির্বাচনকালীন দায়িত্ব সম্পর্কেও খোলামেলা আলোচনা করা যাচ্ছে। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি (সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ইবরাহিম) বর্তমান শেরপুর জেলার পুরো এলাকায় নিয়োজিত হয়েছিলাম বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তার জন্য মাত্র ৩০ জন সৈনিক নিয়ে। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে সংসদীয় নির্বাচনে একশ' সৈনিক নিয়ে মোতায়েন হয়েছিলাম বর্তমানের মানিকগঞ্জ জেলার জন্য। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের 'হ্যা-না' ভোটের সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে মোতায়েন ছিলাম। ১৯৮৮ সালের সংসদীয় নির্বাচনকালে খাগড়াছড়িতে 'আধা শান্তি আধা যুদ্ধ' পরিস্থিতিতে পুরো জেলায় সহায়তা প্রদানের জন্য আদিষ্ট ছিলাম। ১৯৯১-এর ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের আগে নতুন পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন পরিপত্র রচনা করা এবং তৎকালীন সেনা নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচন সংক্রান্ত সব কাজের জন্য সেনাসদরের 'ডিএমও' হিসাবে প্রধান স্টাফ অফিসারের দায়িত্ব পালন করি। যশোরের জিওসি থাকা অবস্থায় ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি ও জুনের নির্বাচনের সময় পুরো খুলনা ও বরিশাল বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের বৃহত্তর ফরিদপুরের মধ্যে বিস্তৃত ১২৭টি থানার বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলাম এবং ১২ জুন '৯৬ নির্বাচনের নয় দিন আগে আমি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেও রেখে আসা পরিকল্পনা থেকে অব্যাহতি পাইনি। এই ফিরিস্তি দেয়ার উদ্দেশ্য হল ধারণা দেয়া যে, গত ৩০ বছরে শত শত সেনা কর্মকর্তা নির্বাচনী ডিউটি করেছে এবং সময় ও সুযোগের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পেরেছে বা পারবে। আমি নিজে কোন সময় আদেশ নিয়েছি, কোন সময় আদেশ নির্ধারণ করেছি। কিন্তু সব সময়েই সর্বপ্রকার সন্দেহ ও বিতর্কের উর্ধ্বে নীতিমালা ছিল সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করার দায়িত্ব বেসামরিক প্রশাসনের তথা নির্বাচন কমিশনের। নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব হচ্ছে সররকারের তথা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিডিআর, পুলিশ ও আনসার ইত্যাদির মাধ্যমে। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব ছিল কেউ চাইলে সম্ভব হলে সাহায্য করা এবং 'এখানেই ফ্যাকড়া'।

নির্বাচনকালে সেনাবাহিনী মোতায়েন নিয়ে দেশের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো দুইভাগে বিভক্ত। বৃহত্তম ভাগ তথা বিএনপি, জামায়াত ইত্যাদি নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রস্তাব করেছে নির্বাচনে নিবিড়িভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েনের জন্য অপরপক্ষে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বলেছে, আগে যেমনভাবে সেনাবাহিনী মোতায়েন হতো ঠিক তেমনিভাবে হবে, এর বেশি কিছু নয়। অবশ্য আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনীর নিবিড় মোতায়েন যেমন চায় না তেমনি দেশীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের মোতায়েনও চায় না বলে পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। ২০০০ সালে মার্চ মাসে যখন নির্বাচন ও সেনাবাহিনী নিয়ে প্রথম বলাবলি শুরু করি তখন সেনাপ্রধান ছিলেন বর্তমান প্রধামন্ত্রীর ফুপা



www.nagorikpathagar.org

এলপিআর থেকে ডেকে এনে অনেকটা চুক্তিভিত্তিক মেয়াদে বিতর্কিত উদ্দেশ্যে নিয়োগপ্রাপ্ত তৎকালীন লেঃ জেঃ মুস্তাফিজুর রহমান বীরবিক্রম। গত মার্চ, আগস্ট এবং নভেম্বরে সেমিনারগুলো শেষ হওয়ার পর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে সেনাপ্রধান হয়েছে লেঃ জেঃ হারুন-অর-রশীদ বীরপ্রতীক। আমি এবং জেনারেল হারুন যেহেতু সেনাবাহিনীতে একই ব্যাচের এবং বন্ধুভাবাপন্ন বলে পরিচিত ছিলাম সেহেতু সেনাবাহিনী নিয়ে কিছু বলতে গেলে সম্ভাবনা থেকে যায় আমি কারও স্বার্থের পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলছি কি না? দীর্ঘাঙ্গী দেশীয় সুপারি গাছ বা বিদেশী ইউক্যালিপটাস গাছ বলতে পারে না যে ফাল্গুনের বসন্তের বাতাসই শুধু গায়ে লাগুক, প্রাকৃতিক নিয়মেই বৈশাখের ঝড়হাওয়াও তাকে দোলায়িত করবে। অতএব পক্ষে-বিপক্ষে নয় দেশের জনগণের স্বার্থে যা বলা ভাল মনে করি তা বলতে চাই। ব্যক্তি বড় নয়, পরিস্থিতি ও নীতি বড়। আগামী নির্বাচনে অস্ত্রধারী রাজনৈতিক সন্ত্রাসীরা যেন কোন জনগোষ্ঠীকে ভয় না দেখায় অথবা সুনির্দিষ্ট কোন পক্ষকে ভোট দিতে বা না দিতে ভয় না দেখায় এর বন্দোবস্ত করা দরকার। ভোটাররা যেন ভোটকেন্দ্রে এসে ভোট দিতে পারে এবং যে প্রার্থীকে পছন্দ সেই প্রার্থীকেই যেন ভোট দিতে পারে এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কোন দুষ্কর্ম ঘটার আগে পরিকল্পনার পর্যায়ে বা বাস্তবায়নের আগে তা ধ্বংস করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনগুলো মিটানোর জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে কি কি শক্তি বা মাধ্যম মওজুদ থাকবে এটিই হচ্ছে মোক্ষম প্রশ্ন। সরকারের আমলাতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপরে বসবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। সূঁচ থেকে নিয়ে হাতি পর্যন্ত তাবৎ সরকারি আদেশ জারি হতে থাকবে রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে। বাস্তবায়ন করা হবে আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে। সব সরকারি কর্মকর্তা কি একশ'ভাগ নিরপেক্ষ? যেসব সরকারি কর্মকর্তাকে বিশেষত ১৩ এপ্রিল, ২০০১-এর পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় বদলি করা হচ্ছে এর মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে বলে আকারে-ইঙ্গিতে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে। অতএব যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর আগামী নির্বাচনের সফলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নির্ভর করছে, সেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিদ্যমান বর্ণনাতীত আশঙ্কাজনক মান থেকে গ্রহণযোগ্য ভদ্রমানে আনার জন্য বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক কাঠামো কি যথেষ্ট? প্রশ্নটি খুবই জটিল এবং বিকল্প তিনটি উত্তরের প্রত্যেকটিই রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ। অপরপক্ষে পাকিস্তানে যেহেতু সামরিক শাসন চলছে, বাংলাদেশে যেহেতু সামরিক শাসনের ইতিহাস আছে তাই অনেকেই সন্দেহ করতে পারেন যে, নির্বাচনকালে বেসামরিক প্রশাসনে সহায়তা করার উসিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কি প্রশাসনের ভাগিদার হয়ে যাবে? বা ক্ষমতার অংশীদার হওয়ার পথ পরিষ্কার হবে না তো? উত্তরগুলো জটিল। মোদ্দাকথা হল মধ্যরাতে সামরিক ক্যু করে পরিকল্পিতভাবে দেশের ক্ষমতা গ্রহণের পরিবেশ একেবারে নেই বললে চলে। অতএব সেনাবাহিনীর



www.nagorikpathagar.org

মতো একটি বৃহৎ সু-সংগঠিত, সু-শৃঙ্খল কর্মী বাহিনীর সেবা অতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মুহূর্তে দেশবাসী নেবেন কি নেবেন না এটি হচ্ছে প্রশ্ন। বিয়েশাদি বা কুলখানি ইত্যাদিতে চাকরিরত অফিসারদের সঙ্গে দেখা হয়। হাবভাব যা তা দেখে মেনে হয় নির্বাচনকালে অতিরিক্ত কোন ডিউটি করার জন্য বা অতিরিক্ত ঝামেলা নিজেদের কাঁধে নেয়ার জন্য সেনা কর্মকর্তাগণ মোটেই আগ্রহী নন। অতএব অনেকটা এই রকম দাঁড়াবে যে, দেশবাসীর পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীকে আবেদন জানাতে হবে যেন তারা অতিরিক্ত কষ্ট করেও ঝুঁকি নেয়।

নীতিগতভাবে যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, সেনাবাহিনী নিবিড়ভাবে মোতায়েন করা হবে এবং তাদেরকে আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব দেয়া হবে তাহলে, খুঁটিনাটি ঠিক করা কোন বড় ঝামেলা নয়। আর যদি নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হয় যে, সেনাবাহিনীকে নিবিড়ভাবে মোতায়েন করা হবে না এবং আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব দেয়া হবে না তাহলে সিদ্ধান্ত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করতে হবে যে, তারা নির্বাচনকালে দেশের নিরাপত্তা পরিবেশ কিভাবে উন্নত করতে চায়? যদি বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কেয়ারটেকার সরকারের আমলে ম্যাজিকের মতো পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারে তাহলে তারা সাধুবাদ পাবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে যে তারা ভাল ও দক্ষ শুধু রাজনৈতিক অপপৃষ্ঠপোষকতার কারণে তারা। ('৯৬-২০০১) এই পাঁচ বছর কিছু করতে পারেনি। আসলে কোন নিরেট 'একবাক্যের সত্য' সেই। বহুবিধ কারণেই পরিস্থিতি এখন খারাপ। তার মধ্যে একটি বড় কারণ হচ্ছে পুলিশের একটি অংশের সন্ত্রাসীদের সঙ্গে কথিত ঘনিষ্ঠতা, পুলিশের অপর অংশের রাজনৈতিক স্বার্থসংশ্লিষ্টতা এবং পুলিশের অবশিষ্টাংশের আন্তরিক নীরবতা ও নৈরাশ্য। গোপনীয়তা রক্ষা করে পুলিশ এখন আর কোন অপারেশন করতে পারে বলে কেউ বিশ্বাস করে না। সেনাবাহিনী আসলেও এই অসুবিধাটি কিভাবে উতরাবে সেটা বলা মুশকিল। যা হোক, আমাদের সুপারিশ হচ্ছে সম্পূর্ণ সেনাবহিনীকে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে মোতায়েন করা হোক এবং প্রধান সমন্বয়কারী নিযুক্ত করা হোক, নির্বাচনের ছয় থেকে আট সপ্তাহ আগ থেকেই। নির্বাচনের সাত দিন আগে থেকে নির্বাচন শেষ হওয়ার তিন দিন পর পর্যন্ত মেয়াদের জন্য সেনাবাহিনীর কমিশনড অফিসারগণকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সীমিতভাবে দেয়া হোক। ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেয়া হলে ম্যাজিস্ট্রেটের অনুপস্থিতিতেও সেনা অফিসারগণ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন। থানায় বা উপজেলাগুলোতে ম্যাজিস্ট্রেটের দারুণ অপ্রতুলতা। সেনাবাহিনী-পুলিশ বাহিনী ইত্যাদি সীমিত সংখ্যাকে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের সীমিত সংখ্যাকে কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধির জন্য একাধিক দিনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হোক। যা বললাম সবই রেডিক্যাল বা বিদ্যমান ধারা ও অভ্যাসের ঘোরতর ব্যতিক্রম। তাই বিবেচনার্থে উপস্থাপন করলাম।

দৈনিক যুগান্তর ০৩/০৭/২০০১ইং, ০৪/০৭/২০০১ইং এবং ০৫/০৭/২০০১ইং.



www.nagorikpathagar.org

# সেনা কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসির ক্ষমতা না দিলে জাতিকে মূল্য দিতে হতে পারে

মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম বীরপ্রতীক বলেছেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সেনা কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসির ক্ষমতা দেয়া না হলে সমগ্র জাতিকে এজন্য মূল দিতে হতে পারে। কারণ, প্রচলিত, প্রশাসনিক কাঠামোয় নির্বাচন হলে এ নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা ও সুষ্ঠুতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং এর পরিণতিতে দেশে নৈরাজ্য দেখা দেয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আগামী নির্বাচনে সেনা কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসির ক্ষমতা দেয়া হবে কিনা এ নিয়ে দেশে বিতর্ক বেশ জমে উঠেছে। এ বিতর্কের সূত্রপাত করেন বেসরকারী থিংক ট্যাংক সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম। বেশ আগে থেকেই এ বিষয়ে তিনি পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করছেন।

তার বক্তব্যের পক্ষে-বিপক্ষের মতামতও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার ইনকিলাবের এ প্রতিনিধির সাথে এক সাক্ষাৎকারে জনাব ইব্রাহিম নির্বাচনে সেনা কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসির ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাবে যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশের উদ্ধৃতি−

প্রশ্ন : জনাব ইব্রাহিম, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে আপনি সেনা কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব কেন করেছেন?

উত্তর : আমি এটা এ জন্য চাচ্ছি যে, বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনে বলা আছে স্থানীয়ভাবে উদ্ভূত আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে একজন ম্যাজিস্ট্রেটই কেবল পরিস্থিতির চূড়ান্ত মূল্যায়নকারী। তিনি যদি মনে করেন যে, কোন এক জায়গায় গণ্ডগোল হচ্ছে, সেখানে ফোর্স ব্যবহার করা উচিত, তাহলে সে ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটই কেবল উত্তরটা দিতে পারেন। এটা শুধু আর্মি নিয়ে নয়, এটা পুলিশ বিডিআর কিংবা আনসার সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আইন-শৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে কোন পরিস্থিতিতে গোলাগুলি ছোঁড়া যাবে, কোন পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষামূলক হলেও অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে সে বিষয়ে চূড়ান্ত বিশ্লেষণকারী, মূল্যায়নকারী বা মতামত প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হচ্ছেন ম্যাজিস্ট্রেট। এখন আপনি ভাবুন যে বাংলাদেশে কতজন ম্যাজিস্ট্রেট আছেন। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে তারা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। আপনি যেকোন একটা উপজেলার কথা কল্পনা করুন। চট্টগ্রামের বাঁশখালি উপজেলার কথা ধরা যাক। সেখানে কজন ম্যাজিস্ট্রেট আছেন? উপজেলা নির্বাহী অফিসার একজন ম্যাজিস্ট্রেট। তার অধীনে আরো চার/কি পাঁচজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকতে পারে। প্রচলিত নিয়মে সেখানে অস্থায়ী



www.nagorikpathagar.org

ভিত্তিতে আরো দু'চারজন কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেয়া হয়। এই হচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট। এখন সারা উপজেলায় কোথায় কোথায় গণ্ডগোল হচ্ছে সেটার জন্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে তো ম্যাজিস্ট্রেট যেতে পারে না। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি সামাল দেবে কে? একটা উপজেলায় যদি একসঙ্গে ২০টা কেন্দ্রে গণ্ডগোল হয় তখন ৪/৫ কি ৭ জন ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে ঘটনাস্থলে হাজির হওয়া সম্ভব নয়। প্রচলিত ব্যবস্থায় আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী আইনগত ঝামেলা হওয়ার ভয়ে অনেক ক্ষেত্রে সন্ত্রাস-সহিংসতা দমনে প্রয়োজনীয় সাহসী পদক্ষেপ নেয় না। কেন নেয় না? কারণ একটাই ম্যাজিস্ট্রেট নেই। এখন নির্বাচনে সব কেন্দ্রে যাওয়ার মতো ম্যাজিস্ট্রেট যেহেতু নেই এজন্য আমি বলেছি সেনাবাহিনীর কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সীমিতভাবে দেয়ার জন্য। সীমিতভাবে বলতে শুধু নির্ধারিত তারিখ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রের জন্য কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার দেয়ার প্রস্তাব করেছে। সে ক্ষমতার বলে একজন অফিসার কোন সন্ত্রাসীকে গ্রেফতারের প্রয়োজন হলে গ্রেফতার করবেন। সন্ত্রাসীদের কোন আক্রমণাত্মক মনোভাব দেখলে তা প্রতিরোধ করবেন, প্রয়োজনে সন্ত্রাসীকে সশস্ত্রভাবে মোকাবিলা করবেন, কোন বেআইনী সমাবেশ হলে তা ছত্রভঙ্গ করবেন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একজন ম্যাজিস্ট্রেট যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন সেই ক্ষমতা সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা নিজ বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে প্রয়োগ করবেন।

প্রশ্ন : এ ক্ষমতা ঠিক কখন থেকে দেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করছেন?

উত্তর : আমার ব্যক্তিগত মতে, নির্বাচনের নির্ধারিত তারিখের অন্তত ৭ দিন আগে থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তিন দিন পর পর্যন্ত এ ক্ষমতা থাকা দরকার।

প্রশ্ন : এ ব্যবস্থা কি একেবারে নতুন কিছু?

উত্তর : এটা নতুন নয়। ১৯৭২, ৭৩, ৭৪ সালে রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের এরকম সীমিত ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। এছাড়া ঢাকা, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের অফিসারদের একটা সুনির্দিষ্ট লেভেল পর্যন্ত এই ক্ষমতা অটোমেটিক দেওয়া আছে ওই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী।

প্রশ্ন : সেনা কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেয়ার যে ব্যবস্থার প্রস্তাব আপনি করেছেন সেরকম ব্যবস্থার অধীনে কোন নির্বাচন কি এদেশে অতীতে আর কখনও হয়েছে?

উত্তর : না, তা কখনও হয়নি।

প্রশ্ন : পৃথিবীর আর কোন দেশে?

উত্তর : পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশে তো আমাদের দেশের মতো ব্রিটিশ আইন ফলো করা হয় না। সবাই তো ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য হা করে বসে থাকে না। বাংলাদেশে ওরকম আর হয়নি।



www.nagorikpathagar.org

প্রশ্ন : তাহলে ব্যাপারটাকে অভিনব বলা যায়।

উত্তর : বাংলাদেশটাই তো অভিনব। বাংলাদেশ নামে কোন দেশ তো তিরিশ বছর আগে ছিল না। পরে বাংলাদেশ হয়েছে। পৃথিবীতে কোথাও বাকশাল ছিল না, এখানে হয়েছে। পৃথিবীতে কোথাও কেয়ারটেকার সরকার হয়নি এখানে প্রয়োজনের তাগিদে হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে পরিস্থিতি ডিকটেট করেছে বলে এখানে এসব করতে হয়েছে।

প্রশ্ন : কিন্তু সেনা কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেয়ার ব্যাপারে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করছেন। যেমন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন, ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা তো এক কাপ চা নয় যে, চাইলেই দিয়ে দিতে হবে। কেউ কেউ এমনও বলছেন যে, এতে দেশ নাকি আর্মি শাসনাধীনে চলে যায়। এ সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?

উত্তর : এটা কেউ ব্যক্তিগতভাবে মনে করলেই তো হবে না। আমি এ নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা অন্য কারোর সঙ্গে বিতর্কে যেতে মোটেও প্রস্তুত নই। আমাদের সামনে একটা সমস্যা আছে। সেটি হচ্ছে দেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে এবং পুলিশ বাহিনীর দক্ষতা ও দায়িত্ব পালনে আন্তরিকতাও ভীষণ রকমে প্রশ্নের সম্মুখীন। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এই আঙ্গিকগুলোকে সামনে নিয়ে সমস্যার একটি সমাধান নির্দেশ করতে হবে।

প্রশ্ন : প্রধান নির্বাচন কমিশনার তো আপনার মূল প্রস্তাবটাকেই কটাক্ষ করেছেন।

উত্তর : উনার কটাক্ষ করার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। তিনি যা বলেছেন সেটা উনার নিজস্ব মতামত। আমার মতামতই যে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে তাও তো নয়। আমি মনে করি রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মিলিত উদ্যোগের ওপর নির্ভর করবে তারা কিভাবে এটা করতে চান।

প্রশ্ন : বিদ্যমান বাস্তবতায় আপনি কি আশা করতে পারেন যে আপনার প্রস্তাব গৃহীত হবে?

উত্তর : জানি না। এটা নিয়ে আমি মনে করি আরও আলোচনা হবে। এটা আমাদের জাতীয় সমস্যা। নির্বাচন করাটা প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাহেবের একার সমস্যা নয়। আমাদের সবাইকে মিলে উনাকে সহযোগিতা করতে হবে এবং উনাকেও আমাদের সহযোগিতা নিতে হবে।

প্রশ্ন : আসন্ন সাধারণ নির্বাচনকে আপনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন?

উত্তর : খুবই গুরুত্বপূর্ণ, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় গণতন্ত্রকে যদি দেশে স্থায়ী করতে হয় তাহলে এ নির্বাচনটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে এবং এ নির্বাচনের সুষ্ঠুতার ওপর আমাদের দেশের উন্নতি, অগ্রগতি সবকিছু নির্ভর করছে।

প্রশ্ন : যদি এই নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হয়?



www.nagorikpathagar.org

উত্তর : এ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হলে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি হবে, সর্বক্ষেত্রে নৈরাজ্য দেখা দেবে। এই নৈরাজ্যের আশংকা থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্য আমাদের সব সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করেন এই নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রেসিডেন্ট জাতীয় পর্যায়ে কোন গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করতে পারেন?

উত্তর : অবশ্যই পারেন। তিনি এটা আলাদাভাবে করতে পারেন কিংবা প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসহ সুশীল সমাজের অপরাপর সদস্যদের নিয়ে একসঙ্গেও করতে পারেন। নির্বাচন কমিশনও এটা করতে পারে।

প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে যে ম্যাজিস্ট্রেসি ব্যবস্থা আছে তার সীমাবদ্ধতাকে আপনি কিভাবে দেখছেন।

উত্তর : এই সমস্যা এক, তারা সংখ্যায় কম। দুই. তাদের মধ্যেও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে বলে সন্দেহ রয়েছে।

প্রশ্ন : আপনি কি মনে করছেন যে, পুরো বেসামরিক প্রশাসনই কলুষিত হয়ে পড়েছে?

উত্তর : আমি কলুষিত শব্দটা বলব না। আমি বলব বেসামরিক প্রশাসনের সদস্যবর্গের বেশ কিছুসংখ্যকের মধ্যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষতার ওপরে প্রাধান্য পাচ্ছে।

প্রশ্ন : এটা কি নিয়োগ, পদোন্নতি, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে বলে?

উত্তর : এটা হয়েছে অনেক কিছু মিলিয়ে। নিয়োগ, পদোন্নতির মতো সুবিধার বিষয়গুলো হচ্ছে একটা দিক। আরেকটা দিক হচ্ছে প্রয়োজনীয় কর্মকর্তার অপ্রতুলতা যেটি আমি আগেই বলেছি। দেশের ম্যাজিস্ট্রেট এখন যারা আছেন তাদের নিরপেক্ষ বলে যদি আমরা ধরেও নেই তবু তারা সব জায়গায় সবসময় যেতে পারছেন না। তাই তাদের পরিপূরক হিসেবে সেনা কর্মকর্তাদের সাময়িকভাবে ম্যাজিস্ট্রেসির ক্ষমতা দিয়ে তাদের ব্যবহার করা যায় বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন : কোনপর্যায়ের কর্মকর্তাদের এই ক্ষমতা দেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করছেন?

উত্তর : কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট, লেফটেন্যান্ট, ক্যাপ্টেন, মেজর। এদেরই লাগবে। এর উপরে যাওয়া দরকার হবে না। আমার আরেকটা সাজেশন হচ্ছে আমরা কিভাবে আমাদের সম্পদকে বহুগুণে বাড়িয়ে নিতে পারি। সেজন্য যদি দেশের সব মহল একমত হন, তাহলে নির্বাচনটা একাধিক দিনে করার প্রস্তাব আমি রাখতে চাই। তাহলে এই ম্যাজিস্ট্রেট, এই স্কুল শিক্ষক, এই সেনা কর্মকর্তা, এই পুলিশই দু'বার, তিনবার, চারবার ব্যবহার করা যায়। আসলে আমি যা বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে গত ৩০ বছরে যে রকম হয়েছে, পরিস্থিতি বাংলাদেশে ধীরে ধীরে অবনতির দিকে গেছে সেটাকে এখন আর স্বাভাবিক নিয়মে শুশ্রূষা করে ভাল করার কায়দা আমি দেখছি না।



www.nagorikpathagar.org

প্রশ্ন : সেনা কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা দেয়ার কোন নেতিবাচক দিক কি আপনি দেখতে পান না?

উত্তর : নেতিবাচক একটা কথাই কেউ কেউ বলেন যে, আর্মির কাছে নাকি ক্ষমতা চলে যাবে। উনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কোন ক্ষমতা চলে যাবে? নির্বাচন বহির্ভূত কোন ক্ষমতা তো তাদের দেয়া হচ্ছে না। সেরকম কোন প্রশ্নই তো এক্ষেত্রে উঠছে না। আর্মিও তো এটা চাচ্ছে না। তারা তো বলছে না যে আমাদের এই ক্ষমতা দিতেই হবে।

প্রশ্ন : আপনি কার পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব করছেন?

উত্তর : আমি কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের পক্ষ থেকে নয়, জনগণের পক্ষ থেকে, দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করে এই প্রস্তাব করছি। আমি আমার অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখেছি প্রচলিত ব্যবস্থায় নির্বাচনে আর্মি যে দায়িত্ব পালন করে সেটা 'খায়া পিয়া কুছ নেই গ্লাস ভাংগা আট আনা'র মত। আর্মি যায় পোজপাজ বা শোঁ-শোঁ করে ঘুরে বেড়ায়। এতে কাজের কাজ কিছু হয় না।

It dose not deliver anything, এত সম্ভাব্য গোলযোগকারীদের ওপর সাইকোলজিক্যাল একটা অ্যাফেক্ট হয়তো পড়ে। এটা অতীতে যদি সামান্য কার্যকর হয়েও থাকে এখন আর এর দ্বারা কোন কাজ হওয়ার মতো অবস্থা আমি দেখছি না।

প্রশ্ন : আপনি আপনার লেখালেখিতে এদেশে অতীতের সব নির্বাচনের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন সামনের নির্বাচন সুষ্ঠু করার একমাত্র উপায় হচ্ছে সেনাবাহিনীকে সর্বোত্তমরূপে ব্যবহার করা। আর এই সর্বোত্তম ব্যবহার বলতে আপনি সেনা কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসির ক্ষমতা দেয়ার প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়েছেন।

উত্তর : ঠিক তাই। যদি আরো বিকল্প কোন সমাধান বের করা যায় তাহলে ফাইন, ওয়েলকাম।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন বেসামরিক প্রশাসনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের সম্মুখীন, কিন্তু আর্মির নিরপেক্ষতা নিয়ে কি প্রশ্ন উঠতে পারে না?

উত্তর : সে প্রশ্ন কারও কারও মনে থাকতে পারে। তবে আমি যা দেখি তা হচ্ছে সাধারণভাবে আমাদের দেশের জনগণ সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষতার বিষয়ে আস্থাশীল।

প্রশ্ন : সেনা প্রধানের নিরপেক্ষতার বিষয়ে কেউ কেউ ইতোমধ্যে লিখিতভাবেও প্রশ্ন তুলেছেন। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর : সেনাপ্রধানের দু'একটা কথা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলে আমি বলব না যে, সেনাপ্রধান সামগ্রিকভাবে বিতর্কিত। এটা আমি বলব না। দ্বিতীয়ত, সেনা প্রধান হচ্ছেন সেনাবাহিনীর প্রধান, তিনিই সেনাবাহিনী নন এবং তিনি ৪৬৪টি উপজেলায় যাবেন না। আমাদেরই ছোটভাই, তরুণ অফিসার-এরা ডিউটি করবে। এই তরুণ অফিসারদের দেশপ্রেম, কর্তব্যনিষ্ঠা,নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন কেউ তুলেন না। এরা প্রশাসনের রাজনীতিকীকরণের সঙ্গে কোনভাবেই যুক্ত নন। এদের সম্পর্কে দেশের সর্বস্তরের মানুষ অত্যন্ত ভাল ধারণা পোষণ করেন।



www.nagorikpathagar.org

প্রশ্ন : তারপরও যদি নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সেনা কর্মকর্তাদের ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা না দেয়া হয় তাহলে কি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : তা হলে In the long run. আমার মনে হয়, এজন্য সমগ্র জাতিকে মূল্য দিতে হতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি কেন এমনটি মনে করছেন?

উত্তর : আমি এটা মনে করছি এজন্য যে, প্রচলিত প্রশাসনিক অবকাঠামোর নিরপেক্ষতার বিষয়ে জনমনে সংশয় রয়েছে। এই প্রশাসনিক অবস্থার জন্য নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে জনগণের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। তখন স্বাভাবিকভাবেই এ নির্বাচনের ইস্যুকে ঘিরে দেশে নৈরাজ্য দেখা দেয়ার আশংকা রয়েছে।

প্রশ্ন : আমাদের দেশের গত দুটি সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে যে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং বিশেষ করে আইন-শৃংখলার যে অবস্থা ছিল তার চেয়ে গত পাঁচ বছরে সার্বিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর : আইন-শৃংখলার মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমি আমার অফিসে অনেকগুলো দৈনিক পত্রিকা রাখি, অন্য পত্রপত্রিকাও স্ক্যান করি, টিভি দেখি, একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি বিভিন্ন স্তরের লোকদের সঙ্গে কথা বলি। এভাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে মনে হয় দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি এখন এক কথায় ভয়াবহ। দেশে এখন অপরাধের হার অতীতের চেয়ে অনেক বেড়ে গেছে। হত্যা রেট বেড়ে গেছে। পুলিশের অপরাধ এবং পুলিশের ওপর আক্রমণের ঘটনা দুটোই বেড়েছে। বেআইনী অস্ত্রের সংখ্যা দেশে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল নিয়মিতভাবে পরস্পরকে হুমকি দিচ্ছে। সশস্ত্র ক্যাডার সংখ্যা বেড়ে গেছে। দুর্নীতি নিয়ে দেশের দুর্নাম তো আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ছড়িয়েছে। এ সবকিছু মিলিয়ে গত দুটি সাধারণ নির্বাচনের চেয়ে এবারের নির্বাচনে কারচুপি, সহিংসতা এবং হানাহানির আশংকা এখন অনেক বেশী। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি নির্বাচন সুষ্ঠু করার জন্য আমাদের সামনে একটা পথই আছে, আর সেটি হচ্ছে সেনাবাহিনীর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা।

প্রশ্ন : প্রশাসনে ব্যাপক দলীয়করণের যে অভিযোগ করা হয় সে বিষয়ে আপনার কাছে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য আছে কি?

উত্তর : সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে এই দলীয়করণকে চিহ্নিত করা এ মুহূর্তে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে পত্রপত্রিকার মূল্যায়নে যেটা দেখা যায় সে অনুযায়ী বলাা যায় প্রশাসনে এই দলীয়করণ ব্যাপকভাবে হয়েছে। যেমন আজকের (১২ জুলাই) পত্রিকাতেও আছে যে জনতা ব্যাংকের কিছু কর্মচারী বিএনপির মিটিংয়ে গিয়েছিল বলে তাদের বদলি করে দেয়া হয়েছে। এখন জনতা ব্যাংকের সাধারণ কর্মচারীরা একটা রাজনৈতিক দলের মিটিংয়ে গেছে তার জন্য তাদেরকে বদলি করা আমার মতে প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার। এই কর্মচারীরা তাদের কাজের স্থল থেকে অনুপস্থিত থাকলে হয় একটা কথা ছিল। তার



www.nagorikpathagar.org

জন্যও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে।১২ ঘন্টার নোটিশ দিয়ে তাদের বলা যায় না যে, তোমাদের বদলী করা হল। অথচ পাঁচ বছর আগে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যখন রাজনৈতিক কর্মসূচীর অংশ হিসেবে জনতার মঞ্চ করেছিল তখন তো তাদের বদলি করা হয়নি। উল্টো তাদের ডিফেন্ড করা হয়েছে। জাতির মধ্যে এভাবে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড করাটা খুবই লক্ষণীয় বিষয়। জনতা ব্যাংকের কথাটা আমি দৃষ্টান্ত হিসেবে বললাম। এর বাইরে পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে বলা হচ্ছে যে, ডিসি,এসপি থেকে শুরু করে প্রশাসনের সর্বস্তরে দলীয়করণ হয়েছে। আমার ভাষায় আমি বলব যে, নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রশাসনের সর্বস্তরে যে নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলির ঘটনা ঘটেছে তাতে, এরকম সন্দেহের অবকাশ থেকে গেছে।

প্রশ্ন : সম্প্রতি পাস হওয়া বিশেষ নিরাপত্তা আইন এবং শেখ হাসিনার গণভবন দখল সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

উত্তর : এতে ভোটারদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব অবশ্যই পড়বে। এই ব্যবস্থার জন্য ভোটারদের একটা বড় অংশ মনে করবে যে, শেখ হাসিনা এখনও ক্ষমতায় রয়ে গেছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এর প্রমাণ পেয়েছি। পাঁচ বছর আগেও আমি যখন সেনাবাহিনীর চাকরিতে ছিলাম প্রত্যন্ত এলাকার লোকজনকে বলতে শুনেছি 'দেশের রাজা এরশাদ'। অথচ তার পাঁচ বছর আগেই এরশাদ গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। এতেই বোঝা যায়, শেখ হাসিনার গণভবনে থাকা এবং এসএসএফ নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সাধারণ ভোটারদের কিভাবে প্রভাবিত করবে।

প্রশ্ন : আগামী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার পথে বাধা হতে পারে এমন তিনটি প্রধান বিষয়ের কথা কি আপনি উল্লেখ করবেন?

উত্তর : এক. বেআইনী অস্ত্রের ব্যবহার। দুই. কোন না কোন পক্ষকে ভোট দেয়ার জন্য সামাজিক চাপ। তিন. প্রশাসনের সম্ভাব্য দলীয়পক্ষপাত।

প্রশ্ন : এর বাইরে আর কিছু?

উত্তর : এর বাইরে বিশেষ নিরাপত্তা আইনটির কথা বলা যায় যা আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

প্রশ্ন : দেশের রাজনৈতিক মেরুকরণ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উত্তর : দেশের পুরো সমাজ এখন মেরুকরণকৃত। এ প্রসঙ্গে প্রায়ই বলা হয় যে, এক রাষ্ট্রে দুই জাতি। এই দুই জাতির একটা হচ্ছে আওয়ামী লীগপন্থী। এরা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী।

আরেকটি হচ্ছে বিএনপি জোটপন্থী। এরা ইসলাম ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।

দৈনিক ইনকিলাব ২২/০৭/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

# তিন প্রধান সমীপে : নির্বাচনের নিরাপত্তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন

১২ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ঢাকা মহানগরীতে 'বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ' (বিআইআইএসএস)-এর মিলনায়তনে ক্ষুদ্রাস্ত্র সম্পর্কিত একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সেমিনারের আলোচনার সূত্র ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ এবং সংবাদ ভাষ্য মোতাবেক : 'দেশে ৮০টি সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট রয়েছে, যার মধ্যে ঢাকা শহরের আছে ২৮টি। প্রতিটি সিন্ডিকেটের কাছে রয়েছে ৭০ থেকে ৮০টি করে অস্ত্র। সারা দেশে অবৈধ অস্ত্রের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ, শুধু ঢাকা শহরেই ৫০ হাজার। প্রতিদিন দেশে নয়জন নিহত হয়, তার মধ্যে চারজন অবৈধ অস্ত্রের শিকার। আসন্ন নির্বাচনে অবৈধ অস্ত্র নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। এরপরেও অন্যান্য পত্রপত্রিকায় অবৈধ অস্ত্র এবং সন্ত্রাস সংক্রান্ত সংবাদের কোনো কমতি হয়নি। দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় ২১ মার্চ ২০০১ জনাব সুনীল ব্যানার্জী লিখিত একটি সংবাদ শিরোনাম ছিল 'রাজধানীতে ৫০ হাজার, সারা দেশে প্রায় ২ লাখ অবৈধ অস্ত্র : সামনের দিনগুলোতে বড় ধরনের সহিংসতার আশঙ্কা'। কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করেছি। ২৩ মার্চ ২০০১ মানবজমিন পত্রিকায় শেষ পৃষ্ঠায় একটি শিরোনাম ছিল 'অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে ব্যর্থ হচ্ছে পুলিশ'। মানবজমিন পত্রিকায় ২৮ মার্চ ২০০১ শেষ পৃষ্ঠার অন্যতম শিরোনাম ছিল '৭০ হাজার অস্ত্র নিয়ে তৈরি হচ্ছে ক্যাডার, সন্ত্রাসীরা'। প্রথম আলো পত্রিকায় ৩০ জুন ২০০০ প্রথম পৃষ্ঠায় একটি শিরোনাম ছিল 'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, আমি সন্তুষ্ট : আইজিপি'।

চার মাস আগের তথ্যসমূহ এবং দুই মাস আগের আইজিপি সাহেবের বক্তব্য এখন হুবহু প্রযোজ্য হবে কিনা সেটা বলা মুশকিল। যা হোক, উপরের অনুচ্ছেদে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত প্রেক্ষাপটে বিগত চার-পাঁচ মাস যাবৎ অবৈধ অস্ত্র এবং সন্ত্রাস আগামী সংসদীয় নির্বাচনের ওপর কী রকম প্রভাব ফেলতে পারে সে বিষয়ে লেখালেখি কম হচ্ছে না। সুধী কলামিস্টগণ কর্তৃক লিখিত কলামেরও শেষ নেই। সবারই একই আকুতি, একই মিনতি। সেটা কী? সেটা হচ্ছে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করুন, সন্ত্রাস কমিয়ে আনুন যাতে করে মোটামুটি সুস্থ ও ভীতিহীন পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা যায়।

এই নিবন্ধের শুরুতেই ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০১ এর আলোচনা সভার উল্লেখ করেছি। তারও প্রায় এক বছর আগে ১১ মার্চ ২০০০ ঢাকা মহানগরীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত আইডিবি ভবনে 'নির্বাচনে নিরাপত্তা, নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা উন্নয়ন' শীর্ষক একটি আলোচনা সভায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নির্বাচনের ওপর অস্ত্রের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব কীভাবে রোধ করা যায় সে ব্যাপারে বিশদ আলোচনা হয়। পরের দিন ১৩ মার্চ ২০০০ প্রধান দৈনিকগুলোতে এ বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট হয়। আলোচনার আয়োজন



www.nagorikpathagar.org

করেছিল, 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড পিস স্টাডিজ' (সিএসপিএস)। এই সংস্থা ২০০০ সালের আগস্টে এবং ২০০০ সালের নভেম্বরে আরো দুটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। মূল প্রতিপাদ্য ছিল নির্বাচনে সহিংসতা কমানোর লক্ষ্যে সম্ভাব্য পদক্ষেপসমূহ, যাতে করে নির্বাচন নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য হয় এবং তার ফলাফল গ্রহণযোগ্য হয়। সব আলোচনাতেই নির্বাচনের আগে সেনাবাহিনী মোতায়েনের প্রশ্ন বড়ভাবে আসে। ধীরে ধীরে নাগরিক সমাজের বৃহৎ অংশ নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের সময়ে সেনাবাহিনী মোতায়েনের দাবিতে সোচ্চার হয়। কিন্তু নাগরিক সমাজের অন্য একটি অংশ সেনাবাহিনী মোতায়েন প্রসঙ্গে সন্দিহান ও সংশয় আপ্লুত থাকে। উদাহরণস্বরূপ ২২ আগস্ট ২০০১ বধুবার রাত ১১টায় সংবাদের পর একুশে টিভিতে নির্বাচনী সংলাপে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও সাবেক সাংসদ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ একটি প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, সেনাবাহিনী মোতায়েন করলে সন্ত্রাসীরা ভীত হয়ে সন্ত্রাস পরিহার করার সম্ভাবনা আছে। উপস্থাপকের পাল্টা প্রশ্ন ছিল সেনাবাহিনীর উপস্থিতির কারণে যদি ভোটাররা ভীত হয়ে ভোট দিতে না আসে, তাহলে কী হবে? কিছুদিন যাবৎ কয়েকটি পত্রিকায় কিছুসংখ্যক কলামিস্টও এরকম একটি ধারণা উপস্থাপনা করছিলেন যেন 'সেনাবাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি একেবারেই নতুন, অশ্রুতপূর্ব ও নজিরবিহীন। অতএব সেনাবাহিনীকে দেখে আসলেই সাধারণ ভোটাররা ভীত হয়ে যাবে, সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্টতায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সেটা স্বাধীন হবে না!!'

সুধী পাঠক, অতি স্পষ্টভাবেই এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৭০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কোনো সংসদীয় নির্বাচন এ দেশে অনুষ্ঠিত হয়নি সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্টতা ছাড়া। প্রশ্ন হচ্ছে সেই সংশ্লিষ্টতা কী ছিল? উত্তর হচ্ছে : বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে। আমি আমার এই সাধারণ বক্তব্যের (জেনারেলাইজড স্টেইটমেন্ট) মধ্যে ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের নির্বাচনকে শামিল করছি না। কেন করছি না তার কারণটি ব্যাখ্যা করছি। '৮৬ সালের নির্বাচনে সরকারি দল ছিল জাতীয় পার্টি। ওই সময়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে সমঝোতা ছিল নির্বাচন বর্জনের, যাতে করে সামরিক সরকার সহজেই বৈধতা না পায়। তবে সমঝোতা ভঙ্গ করে সন্দেহযুক্ত কারণে একটি বৃহৎ বিরোধী রাজনৈতিক দল ওই নির্বাচনে যায়। '৮৮ সালের নির্বাচনে অবশ্য বড় কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল জড়িত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন সাংবাদিক মহলে বিদ্যমান একটি অভিযোগ হচ্ছে যে, '৮৬ এবং '৮৮ সালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনীর অতি জ্যেষ্ঠ অফিসার ও অতি জ্যেষ্ঠ অধিনায়কগণের মাধ্যমে অর্থের ব্যবহার করে বা অর্থের ব্যবহার না করেও নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করেছিলেন। বা জ্যেষ্ঠ অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে সৈনিকগণকেও এই কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। অর্থাৎ বিভিন্ন নির্বাচনকালে যুগ যুগ ধরে বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় যে কাঠামোতে সেনাবাহিনী কর্তব্য পালন করত বা করছে, '৮৬ এবং '৮৮ সালে সেটার অনাকাঙ্খিত ব্যর্তয় ঘটেছিল।



www.nagorikpathagar.org

আমি যদিও ১৯৭০ সালের ঘটনা থেকে আলোচনা করেছি, আসলে কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই একই আইন বা বিধির আওতায় নির্বাচনসহ বিবিধ কাজে বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় সেনাবাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আগামী সংসদীয় নির্বাচন আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা যে, সেটা উপযুক্ত ভাষার অভাবে প্রকাশ করতে পারছি না বা সাহসের অভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছি না। আমি নিশ্চিত যে, আরো শত-সহস্র নাগরিক এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তাই দুই মাস আগেও স্বতঃসিদ্ধের মতোই বলা যাচ্ছিল যে, ২০০১ সালের সংসদীয় নির্বাচনেও বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় সশস্ত্রবাহিনী মোতায়েন হবে। এটা নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ ছিল না। কারণ, এটা অতি নৈমিত্তিক একটি ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদশে জাতীয় জীবনের যেকোনো দুর্যোগে বা এলাকাভিত্তিক কোনো দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী বা সশস্ত্রবাহিনীকে বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় বারবার মোতায়েন করা হয়েছে। এমনকি ঢাকা শহরের ট্রাফিক জ্যাম নিরসনের নিমিত্তেও ট্রাফিক পুলিশকে সহায়তা করার জন্য সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যগণকে মোতায়েন করা হয়েছে। ট্রাফিক ডিউটিতে মোতায়েনের ঘটনায় দেশের বহু বিজ্ঞজন নাখোশ হয়েছেন। তবে আশ্চর্যজনক ও অবিশ্বাস্য কথা হচ্ছে যারা আকারে-ইঙ্গিতে বা প্রকাশ্যে ট্রাফিক ডিউটিতে সেনা মোতায়েনের পক্ষে ছিলেন, তারা নির্বাচনকালে সেনা মোতায়েনের বিপক্ষে মতামত দিয়েছিলে।

সেনা মোতায়েন করা হবে কী হবে না সেনা বা সেনা মোতায়েন হলে তারা কী করবে বা করবে না—এ আলোচনা সরাসরি সম্পৃক্ত আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে। অতএব ওই কথায় আসি। আমার আলোচনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, আসলে আমরা কী চাচ্ছি এবং সেটা অর্জন করার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিচ্ছি কী নিচ্ছি না ওই বিষয়ে আলোচনা করা। আমরা চাচ্ছি এমন একটি সংসদীয় নির্বাচন যেটি মোটামুটি নিরপেক্ষ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হবে, যে নির্বাচনে জনগণ মোটামুটি নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে, যে নির্বাচনে কোনো গোষ্ঠী বা পক্ষ বা মতাবলম্বী জনগণের মনের ওপরে জোর করে কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবে না এবং যে নির্বাচনে অবৈধ অস্ত্রের ব্যবহার দ্বারা ভোটারদের আসা-যাওয়া নেতিবাচকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে না বা ভোট কেন্দ্রসমূহ দখণ করা হবে না বা প্রার্থী অথবা প্রার্থীর সমর্থকগণকে হতাহত করা হবে না বা ভোট বাক্সসমূহ দখল করা হবে না। এই বৈশিষ্ট্যের নির্বাচনই যদি আমাদের কাম্য হয় তাহলে সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য বহুমাত্রিক অবদান প্রয়োজন। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে, অবৈধ অস্ত্র ও তার ব্যবহার তথা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ। এই কাজটি শুধু মনের শুভ ইচ্ছা বা মুখের মিষ্টি কথায় সম্ভব না। এই কাজটির জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী কর্তৃক সফলভাবে সন্ত্রাসীদের আটক করা প্রয়োজন। যদি একান্তই অবৈধ অস্ত্রসমূহ উদ্ধার করা সম্ভব না হয় বা সন্ত্রাসীদের আটক করা সম্ভব না হয়, তাহলে এমন পরিবেশ



www.nagorikpathagar.org

সফলভাবে সৃষ্টি করা প্রয়োজন যাতে সন্ত্রানীরা সন্ত্রাস করতে না পারে, যেন সন্ত্রাসীরাই সন্ত্রস্ত হয়ে এলাকা ছেড়ে চলে যায় বা নিষ্ক্রিয় থাকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী বলতে কী বুঝায়? সচরাচর পুলিশ বাহিনীকেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী বলা হয়। বস্তুত দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পুলিশ বাহিনীর ওপরই ন্যস্ত। পুলিশ বাহিনী যখন পেরে ওঠে না তখনই মাত্র এই বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) অথবা পরিস্থিতি আরো গুরুতর বা শোচনীয় হলে সশস্ত্র বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়। পুলিশ এবং বিডিআর এই উভয় বাহিনী সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে। অপর পক্ষে সশস্ত্র বাহিনীসমূহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের আলাদা আলাদা (কিন্তু পারস্পরিক পরিপূরক) নিয়ন্ত্রণে কাজ করে। তাহলে কথা এই দাঁড়ায় যে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দায়ী এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সশস্ত্রবাহিনীসমূহ এই দায়িত্বে সহায়তা করে। এই সহায়তা করার কাজটি সশস্ত্রবাহিনীর আবেদনে বা আগ্রহে হয় না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা তার অধীনস্থ সরকারি বিভাগ বা সরকারি কর্মকর্তা যদি সশস্ত্রবাহিনীর সহায়তা চান তাহলেই সশস্ত্রবাহিনী সেই সহায়তা দেবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই সহায়তা চাওয়ার পর সহায়তা না দেওয়ার কোনো অবকাশ সশস্ত্রবাহিনীর হাতে থাকে না। এরকমই আইনগত কাঠামোর প্রেক্ষাপটে নির্বাচনের কিছু দিন আগে থেকে নিয়ে নির্বাচনের দিনসহ দু-একদিন পর পর্যন্ত সশস্ত্রবাহিনীকে মোতায়েন করার রেওয়াজ অন্তত পক্ষে বিগত ৩১ বছর যাবৎ চলছে। আমরা কি ২০০১ সালের সংসদীয় নির্বাচনে এই রেওয়াজের ব্যতিক্রম চাই? চাইলে কোন দিকে? হ্রাসকৃত ভূমিকা নাকি দীর্ঘায়িত নিবিড়তর ভূমিকা? হ্রাসকৃত ভূমিকার অবকাশ আর নেই বলে মনে হয়। ১৯৯১ সালে তৎকালীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান তথা ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীনের নির্দেশে নির্বাচনের আটদিন আগে সশস্ত্রবাহিনী মোতায়েন হয়েছিল এবং প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত আহ্বানে স্বশস্ত্রবাহিনীর সদস্যগণ নিজেদের নিরপেক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মকাণ্ডের দ্বারা সরকারসহ দেশে-বিদেশের সবার সন্তুষ্টি অর্জন করেছিল।

বর্তমানে ২০০১ সালের সংসদীয় নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন হবে কিনা, যদি হয় তাহলে কেন এবং কতদিনের জন্য—এসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তথা সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত জড়িত ছিলেন এবং আছেন। যথা—রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমান এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ। সুধী পাঠক, আমরা এখন থেকে পাঁচ-ছয় বা দশ সপ্তাহ পেছনে যাই। আপনারা নিজেদের মনে স্মরণ করুন, কী ধরনের সংবাদ শিরোনাম পত্রিকায় দেখতেন বা রাষ্ট্রপতি ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়গণ কী বলেছেন, সেটা খেয়াল করুন। যেকোনো কৌশলের জন্য বা কারণে তারা সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্ত জানাননি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রধান উপদেষ্টা



www.nagorikpathagar.org

ওই দলে অন্তর্ভুক্ত হলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বয়স তিন সপ্তাহ পার হওয়ার আগেই সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার বাংলাদেশে আসেন এবং তিনি আসার দু-একদিন আগে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন সেনাবাহিনী মোতায়েনের বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। কার্টার চলে যাওয়ার তিনদিন পর ওই একই রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন ঢাকা সেনানিবাসের সেনাকুঞ্জে সশস্ত্রবাহিনীর অফিসারদের সমাবেশ ডাকলেন, নির্বাচনে মোতায়েন হতে হবে এ ঘোষণা দিলেন এবং মনোবল উজ্জীবনকারী বক্তব্য রাখলেন। প্রশ্ন আসতে পারে, কার্টারের সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? জানি না, তবে অনুমান করতে পারি ৩ আগস্ট ২০০১ শুক্রবার সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে সোনারগাঁও হোটেলে নাগরিক সমাজের থেকে বেছে নেওয়া কিছুসংখ্যক 'সুধী ব্যক্তিত্বের সঙ্গে প্রাতঃরাশ-আলোচনায় নির্বাচনী আইন সংস্কার এবং নির্বাচনকালীন নিরাপত্তার-পরিবেশের প্রসঙ্গটি আলোচিত হয়েছিল। ওই একই দিন শুক্রবার ৩ আগস্ট সারাদিন বড় বড় রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গেও ওইসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। সেনাকুঞ্জে প্রেসিডেন্টের ভাষণের কয়েকদিন পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার আনুষ্ঠানিকভাবে বললেন যে, নির্বাচনে সশস্ত্রবাহিনী মোতায়েন করা হবে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে। ১৯৯৬ সালের ৪ জুন থেকে ১৩ জুন পর্যন্ত সশস্ত্রবাহিনী নির্বাচনী ডিউটিতে মোতায়েন ছিল। তাহলে এই ২০০১ সালে পরিবর্তন কী হয়েছে? কর্তব্যের মেয়াদ যদি দেখি তাহলে এবারও নির্বাচনের ৮ দিন আগে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর থেকে সশস্ত্রবাহিনী মোতায়েন হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১ অক্টোবর নির্বাচন হয়ে গেলে দু-একদিন পরই তারা পুনরায় ব্যারাকে ফিরে আসবে। ১৯৯১, ১৯৯৬ এবং ২০০১-এর মধ্যে এ নিয়ে কোনো পার্থক্য নেই। তবে ২০০১ সালে দুটি সংযোজন আছে। প্রথম সংযোজন হচ্ছে, ইদানীংকালে সংশোধিত আইন দ্বারা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে বা সংশ্লেষে সশস্ত্রবাহিনীকেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীকে নির্বাচনের দিন জনস্বার্থে বিনা ওয়ারেন্টে কোনো দোষী ব্যক্তিকে আটক করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় সংযোজন হচ্ছে, প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে নির্বাচন নিরাপত্তা পরিষদ গঠন। এই পরিষদের বিভিন্ন বাহিনীর প্রধানগণ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্বরাষ্ট্র সচিব হচ্ছেন সদস্য। এই যে দুটি সংযোজন করা হলো, এর দ্বারা ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের সঙ্গে তুলনা করলে কি অধিক সুবিধা কামনা করা হচ্ছে? যা কামনা করা হচ্ছে সেগুলো কি পূরণ হবে?

গত চার বছর যাবৎ দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমশ নিচের দিকে যাচ্ছিল। ভীষণ বড় বড় নেতাদের অতি ঘনিষ্ঠজনগণ ভীষণ বড় বড় ন্যক্কারজনক কেলেঙ্কারিতে ও সন্ত্রাসে জড়িত হয়ে পড়ছিলেন। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে '৯৮-৯৯ সালে উল্লেখযোগ্য সফলতার সঙ্গে চরমপন্থী-সন্ত্রাস দমন হলেও দেশের অন্যত্র এটা কোনো মতেই সম্ভব হয়নি। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে বৃহত্তর নোয়াখালী বেআইনি কার্যকলাপ ও বিশৃঙ্খল পরিস্তিতির জন্য বিখ্যাত হয়েছিল। যেমনটি এখনো আছে। বিগত



www.nagorikpathagar.org

সংসদের অনেক সদস্যের নামে অনেকরকম অভিযোগ থাকলেও সন্ত্রাস জগতের মুকুটহীন সম্রাট হিসেবে বৃহত্তর নোয়াখালীর একজন সংসদ সদস্য নিজের নাম ইতিহাসে লিখে গিয়েছেন। ওই বৃহত্তর নোয়াখালীতে কত অবৈধ অস্ত্র এবং ক্যাডার আছে সেটা কারো পক্ষে বলা সম্ভব না। অনুরূপ, দেশে এই মুহূর্তে হুবহু কতসংখ্যক অবৈধ অস্ত্র আছে বা হুবহু কতসংখ্যক সশস্ত্র সন্ত্রাসী আছে সেটা আমাদের মতো সাধারণ নাগরিকগণ কখনোই বলতে পারবেন না। যদি কেউ হুবহু না হলেও আংশিকভাবে বলতে পারে সেটা হচ্ছে গোয়েন্দা বাহিনীসমূহ। গোয়েন্দা বাহিনীসমূহ অক্টোবরের নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত। অনেক লোকের কাছ থেকে শোনা বক্তব্যের ওপর নির্ভর করে, একটি হালকা আঙ্গিকের কথা উল্লেখ করছি, ১৩ জুলাই ক্ষমতা ছাড়ার কিছুদিন আগে তৎকালীন সরকারের অতি উচ্চস্তরের নির্দেশে দেশের বিভিন্ন থানায় থানায় গোয়েন্দা টিম পাঠানো হয়েছিল। কোনো টিমে দুজন, কোনো টিমে তিনজন, কোনো টিমে চারজন সদস্য ছিল। এসব ব্যক্তি ছিলেন দেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা বাহিনীর সদস্য। এদের ওপর দেওয়া দায়িত্ব ছিল সরেজমিনে মূল্যায়ন করা যে, সরকারি দলের জন্য কোন ধরনের বা কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিলে ভালো? নিশ্চয়ই আনুষঙ্গিক আরো বিষয় ছিল মূল্যায়ন করার জন্য। ছাত্রলীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দিয়ে অনুরূপ একটি মূল্যায়ন জরিপ করানো হয়েছিল বলেও জেনেছিলাম। অতএব, আমি অনুমানকারী, গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ নিশ্চয়ই অবৈধ অস্ত্র ও সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে মূল্যায়ন বা জরিপ করেছেন, করলে দায়িত্ব পালন করেছেন, না করলে দায়িত্ব পালনে গুরুতর অবহেলা করেছেন।

এখন আমরা তিন প্রধান অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান তথা মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের কাছে সবিনয়ে প্রশ্ন করছি, আপনারা কি অবৈধ অস্ত্রের সংখ্যা এবং অবৈধ অস্ত্রধারী ব্যক্তিদের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি মোটামুটি পেয়েছেন? পেয়ে থাকলে কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন? না পেয়ে থাকলে কী করবেন? নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপকারার্থে আমরা কী করতে পারি এটা জানা দরকার। ৪ নভেম্বর ২০০০ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যায় প্রফেসর ইউনূস লিখেছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের পূর্ব থেকেই সরকারের করণীয় কাজ নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। ১৮ নভেম্বর ২০০০ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় আমি নিজেও এ প্রসঙ্গে লিখেছি। এখন দেখা যাচ্ছে, পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করলেও বিপদ, না করলেও বিপদ।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী (সশস্ত্রবাহিনীসহ) প্রধানদের মধ্যে আলোচনার সংবাদ টিভি ও প্রত্রিকায় ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। সশস্ত্রবাহিনীকে বা বিডিআরকে কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বা হবে সেটা হুবহু জনগণকে জানানো সম্ভব না, কিন্তু স্বচ্ছতার খাতিরে জনগণের মনোবল উজ্জীবিত রাখার প্রয়োজন এবং ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর নিমিত্তে ওই কর্তব্যসমূহের একটি ধারণা জনগণকে দিয়ে



www.nagorikpathagar.org

রাখা প্রয়োজন। নির্বাচনের আগে সাতদিনের জন্য মোতায়েন হয়ে সশস্ত্রবাহিনী কী করতে পারবে সেটা অতি সহজেই অনুমেয়। আমার মনে দৃঢ়বিশ্বাস তিনজন প্রধান এখনো আঁচ করতে পারেননি, কী ধরনের সহিংসতা ও সন্ত্রাস নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচনকালে পরিস্থিতিকে কলুষিত করবে।

নির্বাচন নিরাপত্তা পরিষদ বা ইলেকশন সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। এর হুবহু কাজ কী হবে বলা মুশকিল। মুখে মুখে কেউ বলছেন, এই পরিষদ ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার সার্বিক দায়িত্ব যৌথভাবে (কালেকটিভলি) গ্রহণ করবেন। এটা একটি সঠিক উদ্যোগ কিন্তু আইনি মারপ্যাঁচে যেন ফেঁসে না যায় ওইদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সুতরাং এ প্রসঙ্গে ও অবস্থান সম্পূর্ণ স্বচ্ছ করে প্রকাশ করা প্রয়োজন। পত্রিকান্তরে পাঁচদিন আগে জাতীয় পর্যায়ে নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের সংবাদ পড়েছি। এ বিষয়টি সম্বন্ধেও স্বচ্ছতার প্রয়োজন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এবং মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এদিকে দয়া করে মনোযোগ দেবেন বলে আমার বিশ্বাস। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে, ১৯৯৬ সালে নির্বাচনের সূত্র ধরে। ওই নির্বাচনের ২০-২৫ দিন আগে দেশে সেনাবাহিনী ও শৃঙ্খলা সম্পৃক্ত একটি বিপর্যয়কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। আমার বিনীত আবেদন, এবারও এখন থেকে নিয়ে নির্বাচন পর্যন্ত এবং নির্বাচনের পর নতুন সরকার গঠন না হওয়া পর্যন্ত দেশের, জাতির এবং সরকারের সব সচেতন মহল ও ব্যক্তি এ প্রসঙ্গে সজাগ থাকবেন।

সুধী পাঠকের কাছে আমার আবেদন, আপনারা দৈনিক পত্রিকাগুলো অনুসরণ করুন এবং নিজে নিজেই মূল্যায়ন করুন যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কোন দিকে যাচ্ছে। অতঃপর নিজের মনে নিজে মতামত গঠন করুন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে কিনা। একজন সাবেক সেনা সদস্য হিসেবে সশস্ত্রবাহিনীর সুনাম রক্ষা করার জন্যও নিজের মনের ভেতর তাগিদ অনুভব করি। এমন কী হবে যে, সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন হলো 'ঢাল নাই তালোয়ার নাই নিধিরাম সরদার'-এর মতো? সাংঘাতিক অরাজক পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে কি বলির পাঁঠা করা হবে? সশস্ত্র বাহিনীও নিজেরাই কি চলমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত আছেন? সুযোগ প্রাপ্তিসাপেক্ষে আরো আলোচনা হবে।

দৈনিক প্রথম আলো ০৪/০৯/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

# প্রসঙ্গ : ১ অক্টোবরের নির্বাচন ও জবাবদিহিতা

১ অক্টোবর ২০০১ ইং তারিখ রোজ সোমবার বাংলাদেশের গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় একটি মাইলফলক। গণতন্ত্র মানে অনেক কিছুই, কিন্তু সংক্ষিপ্ততম ভাষায় হচ্ছে : জনগণের রায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সরকার। ২০০১ সালের সংসদীয় নির্বাচন নিয়ে অন্ততপক্ষে গত ১৯ মাস যাবৎ চিন্তা-ভাবনা ও লেখালেখি করছি। সেই নির্বাচন শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল একাধিক মহলের নিকট অপ্রত্যাশিত। এই প্রেক্ষাপটেই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ।

১ অক্টোবর ২০০১ ইং তারিখ দিনের বেলা শহরের কয়েকটি ভোট কেন্দ্রে ভোট কেমন হচ্ছে তথা জনগণের আগ্রহ ও উপস্থিতি দেখতে বের হয়েছিলাম। নিজের চোখে যা দেখেছি এবং নির্বাচনের দিনসহ গত তিন দিনে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে আমার মনে কোন ধরনের সন্দেহ নেই যে; জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে। ঘোষিত ফলাফলে বিগত সরকারের ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ অসন্তুষ্ট এবং ক্ষুব্ধ হয়েছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন, সামরিক বাহিনীসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সবাইকে দায়ী করেছেন তাদের বিপর্যয়ের জন্য। ২ তারিখ সকাল থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় মন্তব্য, প্রতিবেদন বা সংবাদ ভাষ্য ইত্যাদি ছাপানো শুরু হয়েছে, যেগুলোর প্রধান লক্ষ্য আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বিপর্যয়ের কারণসমূহ উপস্থাপন করা। আমি আশা করি আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ এগুলো পড়েছেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বলেছেন যে, এবারের নির্বাচনে স্থূল কারচুপি হয়েছে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার মতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টাগণ, নির্বাচন কমিশনের সব সদস্য ও কর্মকর্তা, সামরিক বাহিনীর সব সদস্য, পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ, বিভিন্ন জেলায় ও উপজেলায় কর্মরত নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে হারিয়ে দিয়েছে। যদিও এরা সবাই এবং বড় বড় পত্রিকার সম্পাদকগণ, সব বিদেশী পর্যবেক্ষক ও দেশী পর্যবেক্ষকগণ বলেছেন যে, নির্বাচন মোটামুটি নিরাপদ পরিবেশে হয়েছে। মোটামুটি অবাধ হয়েছে, মোটামুটি নিরপেক্ষ হয়েছে ও মোটামুটি সুষ্ঠু হয়েছে। তথাপি আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর মতে এই নির্বাচন গ্রহণযোগ্য নয়। আওয়ামী লীগের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না। শুধুমাত্র আলোচনার খাতিরে যদি আওয়ামী লীগের অভিযোগটিকে গ্রহণ করা হয় তাহলে যে অপরিহার্য প্রশ্নটি আসে সেটি হল যে, সবাই আওয়ামী লীগের ওপর বিক্ষুব্ধ কেন ? আমি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী তথা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে উচ্চারিত অনিরপেক্ষতার অভিযোগ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।



www.nagorikpathagar.org

১৯৯৬ সালের মে মাসের ২০ তারিখ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতিকে জড়িয়ে এক সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস তখনকার সেনাবাহিনীর জনৈক মেজর জেনারেল হেলাল মোর্শেদ ও অন্য একজন ব্রিগেডিয়ারকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করেছিলেন ১৮ মে ১৯৯৬ তারিখে। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও সরকারের মতে, এই দুইজন অফিসার একটি রাজনৈতিক দলের যোগসাজশে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। গোয়েন্দা রিপোর্টের মাধ্যমে সন্তুষ্ট হয়ে ভদ্রজনোচিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে সরকার ওই দুইজন অফিসারকে অবসরে যাওয়ার আদেশ দেয়। এই ষড়যন্ত্রটি কিন্তু ১৮ মে ১৯৯৬-এর দুই-একদিন পূর্বে হয়নি। গত পাঁচ বছরে জানতে পেরেছি এবং অনুভব করেছি আসলেই কয়েকজন মাঝারি পর্যায়ের রাজনীতিবিদ জড়িত ছিলেন এবং ষড়যন্ত্রটি ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ফল দেয়ার কথা ছিল। রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত দু'জনের অবসর আদেশ তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মান্য করেননি। এই অমান্যতা বা অবাধ্যতার কারণে তৎকালীন সেনা প্রধানের নেতৃত্বে বিদ্রোহমূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধানের অত্যন্ত অবিবেচনাসুলভ ও অদূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ঘটনাক্রমে জড়িয়ে পড়া অন্য ১২ জন জ্যেষ্ঠ ও ২ জন মাঝারি পর্যায়ের অফিসারসহ সেনাবাহিনী প্রধান নিজে অবমাননাকর পরিবেশে চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন। এই বিষয়টি নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। উভয় পক্ষ পারস্পরিক অভিযোগ এনেছে। ঘটনা-উত্তর কোর্ট অব ইনকোয়ারি নিজেই গুরুতর অনিয়মে দুষ্ট হলেও এটা সত্য যে, সেনাপ্রধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ বহুলাংশে যথার্থ ছিল। এটাও সত্য ছিল যে তৎকালীন সেনাপ্রধান ছিলেন একজন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং সমগ্র চাকরি জীবনে যেকোন প্রকারের আর্থিক বা নারীঘটিত বা অসদাচরণজনিত দুর্নাম বা কেলেঙ্কারি থেকে মুক্ত।

একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সেনাপ্রধানকে যখন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বন্দী করেছিলেন তখন সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মনে মুক্তিযোদ্ধার প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল। জনগণের মধ্যেও এ প্রসঙ্গে কমবেশি সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল। বহু জায়গায় নির্বাচনী প্রচারকালে এবং পত্রপত্রিকায় একথা বলা হয়েছিল যে, 'মুক্তিযোদ্ধা নাসিমের' প্রাণ বাঁচাতে হলে নৌকায় ভোট দিন'। শুধু এই স্লোগান বা আবেদনের জন্যই ১২ জুন ১৯৯৬ নির্বাচনে নৌকা জয়ী হয়নি; কিন্তু এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তারকারী ফলপ্রসূ স্লোগান বা আবেদন ছিল। তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা সেনাপ্রধানকে একটা বড় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশের অভিযোগে অপ্রকাশ্যে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ওই দলের নাম এখনও নেব না। তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা সেনাপ্রধানের চাকরি ও সম্মানের বিনিময়ে বহু রাজনীতিবিদ লাভবান হয়েছিলেন। কথিত মূল ষড়যন্ত্রকারী জ্যেষ্ঠ সামরিক অফিসার বিবিধ নিয়মে লাভবান হয়েছেন বলে অসমর্থিত সূত্রে প্রকাশ হলেও তৎকালীন মুক্তিযোদ্ধা সেনাবাহিনী প্রধান ও তার সঙ্গে চাকরিচ্যুত



www.nagorikpathagar.org

বেশিরভাগ মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা অফিসারই বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য কোন সহায়তা পাননি। এই ঘটনা এখানে উল্লেখ করার একমাত্র কারণ হল যে, এই বার (২০০১ সাল) সেনাবাহিনীকে জড়িয়ে কোন প্রকারের অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেনি যার জন্যে সমগ্র দেশবাসীর মনে, সমগ্র রাজনৈতিক অঙ্গনে এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মনে নির্ভেজাল স্বস্তি ছিল। বিগত পাঁচ বছর আওয়ামী লীগ সরকার সামরিক বাহিনীকে কতটুকু রাজনীতিকরণ করেছেন বা করেননি আমি সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করছি না। শুধু সেনাবাহিনী নয়, বরং সমগ্র সশস্ত্র বাহিনীর জন্য যে সাংগঠনিক সম্প্রসারণ করা হয়েছে বা যেসব ভীষণ বড় খরচের সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে সেগুলো কতটুকু যথার্থ প্রয়োজনীয় বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল কিংবা না, আমি সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করছি না। তবে একটা মন্তব্য করতেই হবে।

সেনাবাহিনীকে নির্বাচন পূর্বকালে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির জন্য বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় মোতায়েনের জন্য দেশের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল ও জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দাবি উঠলেও, আওয়ামী লীগপন্থীগণ তার বিরোধিতা করেছিলেন। ওই বিরোধিতার মানে ছিল সেনাবাহিনীর দক্ষতা ও আন্তরিকতার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ। আমি শতকরা একশতভাগ নিশ্চিত নই, কিন্তু এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করাটা জাতীয় সামরিক বাহিনীর প্রতি অবমাননাকর ছিল বলে ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আমার মতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তথা সশস্ত্র বাহিনী বিগত নির্বাচনকালে এক ঐতিহাসিক গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছে। বিগত পাঁচ বছরের ক্রমাবনতিশীল সাংঘাতিক মানের সংঘাতপূর্ণ আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতিতে জনগণের মনে নিরাপত্তার পরশ দেয়াই ছিল একটি বড় সাফল্য। সড়কপথে, নৌপথে, পদব্রজে এবং সব পন্থায় সেনাবাহিনী ও সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে নিয়ে পরবর্তী দিনগুলোতে দারুণ পরিশ্রম করেছেন। আমি নাগরিক সমাজের একজন হয়ে তাদেরকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আশির দশকে তৎকালীন সামরিক শাসক বা সামরিক থেকে রূপান্তরিত রাজনৈতিক সরকারকে বৈধতা দেয়ার জন্য যারা নির্বাচনে গিয়েছিলেন, ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের সংসদীয় নির্বাচনকালে যারা সেনাবাহিনীর ভূমিকায় সন্তুষ্ট ছিলেন, সামরিক শাসক থেকে রূপান্তরিত বিতর্কিত রাজনীতিবিদের সঙ্গে যারা ১৯৯৬ সালে তথাকথিত ঐকমত্যের সরকার গড়েছিলেন তারা এবারের নির্বাচনে কেন সামরিক বাহিনীকে সমালোচনা করছেন এবং সেনা সদস্যদের দোষারোপ করছেন এটা আমার পুরোপুরি বোধগম্য নয়। যেটুকু অংশ বোধগম্য সেটুকু এখানে লিখছি না। আমি আবেদন করি, সম্মানিত আওয়ামী সভানেত্রী যেন এ প্রসঙ্গে তার মূল্যায়ন পুনর্বিবেচনা করেন।

এখন ভোটার ও ভোট প্রসঙ্গে আসি। এবারের চার দলীয় ঐক্যজোট যত ভোট পেয়েছে সবই কি তাদের প্রতি আস্থার ভোট? বহু বিদগ্ধজন এবং জ্ঞানী-গুণীজন বলেছেন যে,



www.nagorikpathagar.org

চার দলীয় জোট কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট অর্থাৎ নেগেটিভ ভোট। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী সব সময় বলেন, তিনি জনগণের ভোটের ও ভাতের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। কথাটি বহুলাংশে সত্য। তিনি সংগ্রামী রাজনৈতিক নেত্রী। কিন্তু তিনি জনগণের জানমাল ও সম্মানের নিরাপত্তার জন্য সংগ্রাম করেছেন কি না এটি প্রশ্নসাপেক্ষ ব্যাপার। যদি করে থাকেন তাহলে এক ডজন সন্ত্রাসী রাজা বা গডফাদার এবং কয়েক শত সন্ত্রাসী নেতা গত পাঁচ বছরে কেমনে সৃষ্টি হয়েছিল? সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতা তথা জনগণকে নিরাপত্তা প্রদানের ব্যর্থতা আওয়ামী লীগের অনেক ভাল কাজকে ম্লান করে দিয়েছে এটা লাখ লাখ লোকের মুখের কথা এবং অনুভূতি।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ১০ অক্টোবরের মধ্যে পুনঃনির্বাচন না হলে অসহযোগ আন্দোলন করবেন। মানে আবার ধর্মঘট, হরতাল,মিছিল, উৎপাদন বন্ধ,পরিবহন বন্ধ, বন্দর বন্ধ, রফতানি বন্ধ, অর্থনীতি ধ্বংস ইত্যাদি। একটি নির্বাচনের পর এটাই যদি জনগণের ভাগ্য থেকে থাকে তাহলে জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা এ ভাগ্য মেনে নেবেন কি নেবেন না। জনগণ মানে, তাদের নির্বাচিত নেতারা, জনগণ মানে সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা, জনগণ মানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারীগণ।

বৃহস্পতিবার ৪ অক্টোবর অপরাহ্নে আমি যখন এই লেখা লিখছি তখন বাজারে বহু রকমের গুজব। শনিবার ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকা মহানগরী থেকে প্রকাশিত সম্মানজনক পত্রিকা 'আজকের কাগজ'-এর তৃতীয় সংস্করণের প্রথম পৃষ্ঠায় ডান দিকে একটা সাংঘাতিক খবর ছিল। শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ 'নির্বাচনের পরে সহিংসতা সৃষ্টির ব্লু-প্রিন্ট? প্রভাবশালী মহলের গোপন বৈঠক॥ রেডিও- টিভি ভবন ঘেরাওয়ের পরিকল্পনা॥ কারচুপির অজুহাতে পদত্যাগ করবেন ২ কর্মকর্তা।' সংবাদটির পরিবেশক কাগজ প্রতিবেদক। যারা সংবাদটি পড়েননি তারা পুরান পত্রিকা সংগ্রহ করে বা ওয়েব সাইটে গিয়ে দেখতে পারেন। যদিও প্রকাশ্যে বলা হয়নি, তথাপি সংবাদটি মনোযোগ দিয়ে পড়লে অনুধাবন করা যায় যে, সম্ভাব্য গোলযোগ সৃষ্টিকারী হিসাবে আওয়ামী লীগের দিকেই জোরালো ইংগিত দেয়া হয়েছে। সম্মানিত পাঠকগণ ঢাকা থেকে প্রকাশিত আরও একটি বড় পত্রিকা 'দৈনিক জনকণ্ঠ'-এর ৩০ সেপ্টেম্বর সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার একদম নিচে প্রকাশিত একটি সংবাদের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারেন। শিরোনাম ছিল এইরূপ 'জরুরি অবস্থা ঘোষণার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টির পরিকল্পনা!' সংবাদটি অনেকটা আজকের কাগজের সংবাদের মতো। মনোযোগ দিয়ে সংবাদটি পড়লে ধারণা পাওয়া যাবে যে সম্ভাব্য বিশৃঙ্খলাকারী হিসাবে বিএনপির দিকে ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে। নির্বাচনের পর এখন যদি বড় কোন বিশৃঙ্খলা দেখা যায় তাহলে পাঠক সমাজকে কষ্ট করে মিলিয়ে নিতে হবে যে, কোন পত্রিকার রিপোর্টের সঙ্গে পরিস্থিতি বেশি মিলছে। অর্থাৎ গণ্ডগোল সৃষ্টির পূর্ব পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবায়িত হবে বা হবে না। বিশেষত ঢাকা



www.nagorikpathagar.org

মহানগরীতে জনমতে ভীষণ শঙ্কা বিরাজ করছে এই মুহূর্তে এই মর্মে যে, দেশে কি জরুরি অবস্থা জারি হবে বা দেশে কি সামরিক শাসন জারি হবে? প্রশংসনীয় সেবা প্রদানকারী সামরিক বাহিনী কি শাসক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হবে? এই সব প্রশ্ন সাংঘাতিক কঠিন এবং স্পর্শকাতর। গত পাঁচ বছরে ক্রমপ্রসারমান ও স্থিতিশীলতা অর্জনকারী বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কারণেই এগুলো ছাপানো সম্ভব হচ্ছে।

শ্মশানকে সোনার বাংলায় পরিণত করা কঠিন কাজ। সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করা সহজতর। আওয়ামী লীগের সম্মানিত সভানেত্রী শেখ হাসিনার সামনে দুটি রাস্তা খোলা আছে। প্রথম রাস্তা হল শ্মশানকে সোনার বাংলায় পরিণত করা। দ্বিতীয় রাস্তা হল সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করা। তিনি কোন রাস্তাটি বেছে নেবেন সেটা তিনিই ভাল জানেন। '৮২ সাল থেকে নিয়ে আমরা বেশিরভাগ সময় রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়েছি। কিছুসংখ্যক রাজনীতিবিদের সহযোগিতায় একটি সফল ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে একটি সফল সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসেছিলেন। সেনাবাহিনীর মেধাবী অফিসারদের সহায়তায়, মেধাবী দক্ষ আমলাদের সহায়তায় এবং সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার আলোকে জেনারেল এরশাদ হতে পারতেন একজন জনদরদী ডিক্টেটর। কিন্তু তিনি হয়েছিলেন আধা সফল দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ, যার নৈতিকতা ছিল সম্পূর্ণ পঙ্কিল এবং অগ্রহণযোগ্য। আর্থিক কেলেঙ্কারির নতুন নতুন দিগন্ত তিনি খোলেন, যেই দিগন্তগুলো অত্যন্ত সফলভাবে পরবর্তী ১০ বছরে অধিকতর উন্মোচিত করা হয়। বাধ্য হয়ে তাকে অপসারণ করার জন্য প্রচণ্ড রাজনৈতিক আন্দোলন হয়।

'৯১-তে গণতান্ত্রিক সরকার আসার পর জনগণ শান্তির আশায় ধৈর্য্যশীল থাকলেও ক্ষমতাসীন ও বিরোধীদলীয় কিছু রাজনীতিবিদের অদূরদর্শী রাজনীতির কারণে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল থাকে। অনুরূপভাবে ১৯৯৬ সালে নতুন রাজনৈতিক সরকার আসার পরে পুনরায় জনগণ শান্তির আশায় আশান্বিত হয়। এবারও কিছু সরকারদলীয় রাজনীতিবিদের অপরিণামদর্শী আচরণের জন্য জনগণকে বহু দুঃখ-কষ্ট পোহাতে হয়। গত ১০ বছরে সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির কারণে দেশের অর্থনীতি দারুণভাবে মার খেয়েছে। দেশের সুনাম নষ্ট হয়ে গেছে, বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা কি সম্মানিত রাজনীতিবিদগণের কাছে এইটুকু চাইতে পারি না যে, আপনারা দয়া করে দেশবাসীকে শান্তি দিন।

শেখ হাসিনা এবং বেগম খালেদা জিয়া উভয়েই সরকারে যেমন ছিলেন তেমনি উভয়েই বিরোধী দলেও ছিলেন। ধর্মঘট বা হরতাল ডাকার এবং ধর্মঘট বা হরতালে বিরোধিতা করার অভিজ্ঞতা উভয়েরই পূর্ণ হয়েছে। ইংরেজীতে বলে 'দাস ফার এণ্ড নো মোর ' অর্থাৎ যথেষ্ট হয়েছে আর না। ১ অক্টোবর তারিখে জনগণ সবদিকে বিবেচনা করে, নিজেদের বর্তমান ও ভবিষ্যত বিবেচনা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিবেচনা করে



www.nagorikpathagar.org

নিজেদের রায় দিয়েছে। দেশের সম্মানিত জনগণ তথা ভোটারগণ মনে করেছে যে, এরশাদ, হাসিনা এবং খালেদার মধ্যে দেশের নেতৃত্বের জন্য খালেদাই সর্বাপেক্ষা যোগ্য। তাই বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন ৪ দলীয় জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি যে আস্থা প্রকাশ হয়েছে, সেটা তার জনদরদ, দেশপ্রেম এবং সংগ্রামী নেতৃত্বের প্রতি আস্থা। গণতন্ত্র এই শিক্ষা দেয় যে, একজন ব্যক্তিও যদি বিরোধী দলে থাকে তার মতামতকে সম্মান করতে হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে ২৮৩ আসনের মধ্যে ৬৩ আসন হচ্ছে শতকরা ২২ ভাগ, কিন্তু ২৮৩ আসনের মোট ভোটারের মধ্যে আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোট ২২ ভাগের বেশি। গণতান্ত্রিক রীতিতে এই ভোটারের মতামতকে উপেক্ষা করার কোন অবকাশ নেই। এটাই শেখ হাসিনার এই মুহূর্তে অন্যতম সম্মানজনক শক্তি। অতএব আমরা কি ১৯৯১ সালে ফেরৎ যাব? নাকি ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করব। এই সিদ্ধান্তের মূল উপাত্ত সম্মানিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সম্মানিত শেখ হাসিনার প্রতি আমার শেষ নিবেদন এই যে, আপনি আল্লাহর দয়া এবং সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাস করেন বলেই হয়তো রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তসমূহে উমরাহ করার জন্য পবিত্র মক্কা শরীফে ছুটে যান। আপনি নিশ্চয় জানেন যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং তিনি রাজাকে ফকির বানাতে পারেন ও ফকিরকে রাজা বানাতে পারেন। তিনি দান করলে অপরিসীম ও অফুরন্ত দান করতে পারেন। এমনও তো হতে পারে, আল্লাহ আপনাকে সুযোগ দিচ্ছেন আত্মসমালোচনা ও সংশোধনের জন্য যাতে ভবিষ্যতে আবার রাজা হতে পারেন। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের অথবা সাবেক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক উত্থান ও পতনের দিকে আপনি নজর দিতে পারেন। যদি ঐশী ইংগিতসমূহ আপনি বুঝতে সচেষ্ট না হন বা ভুল বোঝেন, তা হলে আপনি যে অধিকতর বিপর্যয়ের দিকে যাবেন না তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে? হে সম্মানিত শেখ হাসিনা, আপনি ছিলেন ১৩ কোটি বাংলাদেশীর নেতা আর আমি হলাম ওই ১৩ কোটির অতি নগণ্য একজন। আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন প্রকারের তুলনা হয় না। তথাপি বিনীতভাবে একজন নাগরিক হিসাবে কথাগুলো বললাম।

দৈনিক যুগান্তর ০৭/১০/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

# বেগম খালেদা জিয়া এবং সেনাবাহিনীকে সতর্ক অভিনন্দন

জীবনের অপর নাম যুদ্ধ। প্রত্যেকের জীবনই একটি চলমান যুদ্ধ। বেগম খালেদা জিয়ার জীবন এর থেকে ভিন্ন নয়। লেঃ জেঃ হারুন-অর-রশীদ বীরপ্রতীকের জীবনও এর থেকে ভিন্ন নয়। আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য এই দুই ব্যক্তিত্বের সমীপে বা তাদের নিয়ে কিছু বক্তব্য নিবেদন করা।

বেগম খালেদা জিয়া তৃতীয়বারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি '৯১-তে অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনের সময় আমি (ব্রিগেডিয়ার ইবরাহিম) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে ডাইরেক্টর অফ মিলিটারি অপারেশনস হিসেবে দায়িত্ব পালনরত ছিলাম। নির্বাচনকালে সেনাবাহিনীকে দেশব্যাপী মোতায়েন করা, তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সুষ্ঠু নির্বাচনে সহায়তা করা ইত্যাদি ছিল মিলিটারি অপারেশনস ডাইরেক্টরেটের ওই মুহূর্তের অন্যতম কাজ। ওই সময় জনগণের মধ্যে বলাবলি ছিল যে, নৌকা নির্বাচনে জিতবে। কারণ আওয়ামী লীগের কর্মী বেশি, সাংগঠনিক তৎপরতা বেশি এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে বেশি দিনের। নির্বাচনের ফলাফল কিন্তু ভিন্ন রকম ছিল। ক্ষমতায় আসে বিএনপি। এবার (২০০১সাল) জনগণও বলেছেন যে, নির্বাচনে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে। নির্বাচনপূর্ব জনমত জরিপগুলোতে বিএনপি অগ্রগামী ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, মোট ভোটার জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিএনপি সমর্থক এবং জামায়াত সমর্থকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও মত প্রকাশের যোগফল বিজয়ের ইঙ্গিতবহ ছিল। অন্ধ যেকোনো ব্যক্তি হিসেব করে দেখতে পারতেন বা এখনো করে দেখতে পারেন। তাই এবার যদি বিএনপি নেত্রী বা অন্যান্য নেতা বলে থাকেন যে, 'ইনশাআল্লাহ আমরা দুই-তৃতীয়াংশ সিট পাব, তা হলে তিনি বলেছেন অন্তত চারটি জিনিসের ওপর ভিত্তি করে। প্রথমটা হলো, যদি আল্লাহ চাহেন। দ্বিতীয়টা হলো, ৯৬-এর ভোটপ্রাপ্তির যোগফল। তৃতীয়ত, '৯৬ গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কিন্তু ২০০১ সালে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে এমন একটি উপাদান হলো, সমাজের বৃহত্তর অংশের বিশাল মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের মধ্যে উদার ইসলামি মূল্যবোধের প্রতি সমর্থন। চতুর্থত, অর্থাৎ সবচেয়ে শেষে যেটি বলতে হবে সেটি হচ্ছে বিগত ৫ বছরে আওয়ামী লীগের (বিশেষত) উচ্চপর্যায়ের নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্যোগে ও সমর্থনে পরিচালিত অনিয়ম ও সন্ত্রাস, যেই সন্ত্রাসের কারণে জনগণের জান-মাল ও ইজ্জত নিরাপদ ছিল না। এসব কিছুর যোগফল হলো আওয়ামী লীগের ওপর ভোটারদের অনাস্থা এবং বিএনপির ওপর আস্থা। আমি যখন আস্থা এবং অনাস্থা শব্দটি ব্যবহার করছি তখন অবশ্যই এটাকে তুলনামূলকভাবে নিতে হবে।



www.nagorikpathagar.org

আমি আওয়ামী লীগের বিপর্যয়ের বিস্তারিত কোনো মূল্যায়ন এখানে করছি না। কিন্তু আওয়ামী লীগপন্থী একজন বিখ্যাত কলামিস্টের কয়েকটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা অতীব প্রয়োজনীয় যাতে করে নতুন সরকার ছাপার অক্ষরের বাইরের কথা বা মর্ম বুঝতে পারেন। ... আমার সহৃদয় পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, আমি আমার কলামে বহুবার লিখেছি (অনুজপ্রতিম কলামিস্ট আবুল মোমেনও লিখেছেন),এটা দুটি রাজনৈতিক দল বা জোটের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচিগত পার্থক্যের দ্বন্দ নয়, এটা একাত্তরের অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধের আরো একটা রক্তাক্ত অধ্যায়। এটা একাত্তরের শত্রুদের পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত জোটের সঙ্গে বর্তমানের নেতৃত্বহীন ও নীতিহীন আওয়ামী লীগের আরেকটি লড়াই। ... অবশ্যই এই পরাজয়ের ব্যাপারে অনেক ছোট ছোট ফ্যাক্টর কাজ করেছে। ...প্রথমে এই পরাজয়ের পেছনে আওয়ামী লীগের নিজস্ব ভূমিকাটা ব্যাখ্যা করি। শেখ হাসিনা আমলাচক্রের হাতে বন্দী হয়ে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়েছিলেন। দেশের প্রগতিমনা মুক্তবুদ্ধির বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এবারের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সমর্থনে এই বুদ্ধিজীবীদের কোনো জোরালো ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। প্রেস ও মিডিয়ার সঙ্গে শেখ হাসিনা গত পাঁচ বছরে কোনো সুসম্পর্কই গড়ে তুলতে পারেননি। ... মুখে সেক্যুলারিজমের বাণী, কিন্তু কাজে বিএনপি নেত্রীর অনুকরণে বিভিন্ন মাজারে দৌড়াদৌড়ি, ব্যক্তিগতভাবে আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মাচারণ এবং মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক চক্রের প্রতি নতজানু নীতি দেশের মানুষের কাছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে পার্থক্যের ভেদ রেখাটি ক্রমশ অস্পষ্ট করে ফেলেছে।

নির্বাচনের পূর্বে অন্তত এক মাস বড় রাজনৈতিক দল দুটিই নির্বাচনী প্রচারণায় অতি ব্যস্ত ছিল। তুলনামূলকভাবে জনগণের দৃষ্টি ও মনোযোগ বেশি ছিল দলীয় প্রধানরা কী বলেন। তাদের কথা, আচার-আচরণ, বেশভূষা, মুখভঙ্গি, ইতিহাসনির্ভরতা,ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ইত্যাদি বিষয় জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে দলীয় প্রধানের ভাবমূর্তি, ব্যক্তিত্ব তথা ক্যারিশমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই বিবেচনাতে বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার মধ্যে জনগণ বেগম খালেদা জিয়াকেই পছন্দ করেছেন। উপরে যা বললাম সেই প্রেক্ষাপটে বেগম খালেদা জিয়া, চারদলীয় ঐক্যজোটের অন্য নেতৃবৃন্দ এবং তাদের সমর্থনকারী ভোটারদের অভিনন্দন। এখানেই শেষ নয়। আমি অবশ্যই অভিনন্দন জানাই আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং ওই দলেরও নির্বাচিত হয়ে আসা নেতৃবৃন্দ ও তাদের সমর্থক ভোটারগণকে। গণতন্ত্রের মূল মর্ম জনগণের অনুভূতি ও রায়কে সম্মান করা। যেহেতু একটি দেশ সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ওপর ভিত্তি করে চলবে তাই তাদের যেমন আনন্দ ও গর্ব তেমনি তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্বও বেশি। ভোটারদের মধ্যে যারা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়ে গেল তাদের মতামতকে যদি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় অথবা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয় তা হলে বিপদ আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা হওয়ার সুবাদে বেগম খালেদা জিয়া এখন দেশের নেতা এবং জাতির নেতা। গত কয়েক দিন বেগম খালেদা



www.nagorikpathagar.org

জিয়ার কথাবার্তা, আচার-আচরণ ইত্যাদি অত্যন্ত সংযত এবং পরিপক্ক। আমার আবেদন থাকবে সর্বপ্রকার উস্কানির মুখেও যেন তিনি অবশ্যই এটি বজায় রাখেন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সৃষ্টিকর্তা আছেন। মৃত্যুর পর আমাকে পুনরুত্থান করা হবে, আমাদের কর্মের মূল্যায়ন হবে এবং আমরা পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হবো। আমি এও বিশ্বাস করি যে, এ পৃথিবীতে জীবনযাপন ও সামাজিক শৃঙ্খলার জন্য সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত বিধান আছে। আমি বিশ্বাস করি, শুধু কর্ম ফলই যেমন ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না তেমনই নিষ্ক্রিয় নিষ্কির্ম কাউকেও সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহতায়ালা অযথা দয়া দেখিয়ে পুরস্কৃত করেন না। মহান আল্লাহর সকল সিদ্ধান্তের পিছনে গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষের যিনি নেতা হন তাকে এ মুহূর্তে আল্লাহও মনোনীত করেছেন বলে ধরে নিতে হবে। শুধু আজকে ২০০১ সালে নয়, সর্বকালের জন্যই এই তত্ত্ব প্রয়োজ্য বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি। তাই বেগম খালেদা জিয়াকে শুধু জনগণের প্রতি নয়, অবশ্যই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহতায়ার প্রতিও দায়বদ্ধ থাকতে হবে।

আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি একটি বিশেষ সুযোগ বেগম খালেদা জিয়াকে দেওয়া হয়েছে। তিনি এই দেশ এবং জাতিকে যেমন একতাবদ্ধ করতে পারেন তেমনি আবার অন্য কর্তৃক সৃষ্টি করা বিভক্তিকে আরো ব্যাপক করতে পারেন। আমরা একতার পক্ষে। তিনি এই দেশ থেকে সন্ত্রাস দূর করতে পারেন, নিদেনপক্ষে কমানোর আন্তরিক চেষ্টা করতে পারেন। অপর পক্ষে তিনি তার দলের ব্যক্তিদের খুশির জন্য বা উপকারের জন্য এ বিষয়টি জেনেও না জানার বা দেখেও না দেখার ভান করতে পারেন। আমরা আশা করি তিনি সন্ত্রাস দমনে আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করবেন। আমরা তার প্রচেষ্টার শুভ কামনা করি। দুনীর্তির বিষয়েও একই কথা। ফিলিপাইনের এক সময়ের প্রেসিডেন্ট ফার্ডিন্যান্ড মার্কোস অথবা ইরানের এককালীন রাজা রেজা শাহ পাহলবী এই দুটি নাম হচ্ছে অন্তত এক ডজন বিখ্যাত বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে অন্যতম, যাঁরা তাদের শাসন আমলে দুর্নীতির (পাহাড় নয়) পর্বত গড়েছিলেন। কিন্তু এর কোনো প্রকার ফলভোগ করে যেতে পারেননি। নিজেদের দেশের মধ্যেই সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের দিকে যদি নজর দেই তাহলেও অনুরূপ কথা মনে আসবে। অতএব বেগম খালেদা জিয়া এবং তার প্রশাসনকে এই প্রসঙ্গে সাবধান হতে হবে। বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে এত বেশি সংখ্যক সংসদ সদস্য আছে যে, তিনি অন্য কোনো একক ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল নন। অতএব তিনি অবশ্যই দেখেশুনে দুর্নীতিবিমুখ নেতাদের সহায়তা নেবেন এটাই কাম্য।

শপথ নেওয়ার দু'একদিন পরেই বেগম খালেদা জিয়া ওমরাহ করতে যাবেন। আল্লাহর ঘরে এবং মহানবী (স:)-এর রওজা-পাকে. তিনি কী বলবেন সেটা তিনিই ভালো জানেন। ১৩ কোটি বাঙালি তথা বাংলাদেশীর মাত্র একজন হয়ে আমি নিবেদন করব যে,যেটাই আল্লাহর কাছে বলেন বা চান, সেটা যেন বুঝে-শুনে চান বা বলেন। কোনো প্রকার ওয়াদার বরখেলাপ যেন না হয়। আল্লাহর ঘরে যাওয়া যেমন একটি অ্যাসেট



www.nagorikpathagar.org

(হ্যাঁ-সূচক সম্পদ) তেমনই একটি লাইয়াবিলিটি (অর্থাৎ যেতে পারার এবং ওয়াদার সম্মান যদি রক্ষা করতে না পারেন, তা হলে দুঃসংবাদ থাকতে পারে)। আমরা চাই, আপনি আল্লাহর রহমত অধিকতর প্রাপ্ত হোন যাতে করে আপনার সরকারের মাধ্যমে দেশবাসী উপকৃত হন। প্রায় ৭ মাস আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পবিত্র মদীনা নগরীতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে নতুন নির্বাচন সম্বন্ধে যে ওয়াদা উচ্চারণ করেছিলেন, তিনি তা না পালন করে যে ন্যাক্কারজনক উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন ওই রকম যেন আর কেউ না করেন।

এখন এই নির্বাচন কেমন হয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করি। নির্বাচনী ফলাফলের বিভিন্ন মূল্যায়ন আছে। প্রথমে একটি নেতিবাচক মূল্যায়ন আছে। ৬-১০-২০০২ তারিখের জনকণ্ঠের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার সংবাদভাষ্য থেকে উদ্ধৃত করছি :

**... ভারতের নির্বাচনে বিজেপি জোট যখন জয়লাভ করে তখন নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী । কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি পুরো ব্যাপারটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বিজেপি জোটের বিরোধী পক্ষ তাদের প্রাপ্তিটুকু নিয়ে সংসদের ভিতরে এবং বাইরে যুগপৎ আন্দোলন করছে। বিজেপি জোট ইচ্ছা করলেও যা খুশি করতে পারছে না। পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জী বাম জোটের কাছে গোহারা হেরেছেন আবার। তার মানে এই নয় যে মমতা ব্যানার্জী সংসদ ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি মিছিলও করছেন, পুলিশের ঠ্যাঙানিও খাচ্ছেন, আবার সংসদেও যাচ্ছেন। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি এবং বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনের যে চিত্র আমি সংগ্রহ করেছি তা থেকে আমার মনে হয়েছে এটা প্রকৃতপক্ষে (ছিয়ানব্বই সালের) পনেরই ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের আরো চতুর এবং সম্প্রসারিত সংস্করণ হয়েছে। কিন্তু পনের ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে তো টেকনিক্যালি মানা হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার কনসেপটটা তো পনেরই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনেরই ফল। আওয়ামী লীগ পঁচাত্তরের নির্বাচনে, একাশির কিংবা ছিয়াশির মতো জঘন্য নির্বাচনেও কৌশলগতভাবে অংশ নিয়েছে। কেন নিয়েছে? তার কারণ জনমতকে প্রস্তুত করার জন্য সময় দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আন্দোলন করার জন্য বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। আওয়ামী লীগের যারা এই নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন তাদের অনেকেই হয়েছেন দুর্বৃত্তদের কূটকৌশলের কাছে। আমার কথা হলো পাঁচ বছর ক্ষমতায় থেকেও কেন তারা ব্যর্থ হলেন কূটচক্রীদের চিহ্নিত করতে?...কিন্তু, ব্যতিক্রমহীনভাবে সকল বিদেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষক, প্রায় সকল দেশী নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা, প্রায় সকল রাজনীতি সচেতন মহল এবং মিডিয়া জগতের প্রায় সকল ব্যক্তিত্ব এক বাক্যে বলেছেন যে, জনগণ প্রচুর সংখ্যায় ভোট দিয়েছে। ভোটারদের মধ্যে প্রচুরসংখ্যক নারী ভোটার ছিল। সকলের মতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষতার মাপকাঠিতে এই নির্বাচন অনায়াসে গ্রহণযোগ্য।**

ভোটারদের যে বিশাল উপস্থিতি এবং মোটামুটি সুষ্ঠু ও মোটামুটি নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব হয়েছে তা ভোটারদের মনে আগ্রহ এবং স্বস্তির জন্য। ভোটারদের মনে স্বস্তি ছিল



www.nagorikpathagar.org

যে, তারা ভোট দিতে যেতে পারবেন, স্বাচ্ছন্দ্যে নিজের ভোট দিতে পারবেন এবং পুনরায় বাড়িতে ফিরে আসতে পারবেন। ভোটারদের মনে আগ্রহ ছিল যে, তারা নীরবে দেশের শাসন সম্বন্ধে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করবেন। এই যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এটাও স্বস্তিপূর্ণ পরিবেশের কারণে। এই স্বস্তিপূর্ণ পরিবেশ তথা মোটামুটি নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীসহ সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যবৃন্দ, বিডিআর-পুলিশ-আনসার-ভিডিপি সদস্যবৃন্দ সকলেই পরিশ্রম করেছেন। গত ৫ বছর যাবৎ ক্রমঅবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দুর্যোগতম মুহূর্তে, হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়ে সেনাবাহিনী সদস্যগণ ম্যাজিকের মতো কিছু করে ফেলবেন সেটা কল্পনা করা হয়নি। তারপরেও সেনাবাহিনী যে আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের দ্বারা ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে নিয়ে পরবর্তী ১৩ দিন কাজ করেছে সেটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। সেনাবাহিনী প্রধান লে. জে. হারুণকে এবং তার মাধ্যমে সকল অফিসার ও সৈনিকবৃন্দকে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই। পলিটিক্যাল এবং প্রফেশনাল উভয় আঙ্গিকে বিতর্কিত সাবেক সেনাপ্রধান জে. মুস্তাফিজুর রহমান বীরবিক্রমকে এক্সটেনশন না দিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেশ ও জাতির কল্যাণ করেছিলেন। লে. জে. হারুণ সেনাপ্রধান হওয়ার পর, ৩০ মার্চ ২০০১ তারিখে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশে প্রদত্ত কোনো একটা মন্তব্যের জন্য মিডিয়াতে বিতর্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু আমাদের মূল্যায়নে তিনি ওইরূপ বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। গত ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি কয়েকজন প্রখ্যাত সম্পাদককে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নিজের ধ্যান-ধারণা এবং গণতন্ত্রের প্রতি কমিটমেন্ট ফুটিয়ে তোলেন বলে আমি মনে করি। তার সাক্ষাৎকারটি ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখের প্রথম আলো, যুগান্তর ও মানবজমিনে ছাপা হয়। অনেকে বলেছিলেন যে, এটা ইচ্ছাকৃতভাবে আত্মপ্রচারের শামিল। আমাদের মূল্যায়নে, সেপ্টেম্বরের শেষভাগে বাংলাদেশে বিদ্যমান জনমনে ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আশঙ্কাজনক ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সেনাপ্রধানের বক্তব্য সময়োপযোগী ছিল। সেনাপ্রধানের ওই বক্তব্য জনগণের মনে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ওপর এবং তাদের ভোটের অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে আস্থা বা কনফিডেন্স সৃষ্টি করেছিল। তার কথা এবং পুরো সেনাবাহিনীর কাজের জন্য নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে পুনরায় ধন্যবাদ। এই নির্বাচনে সম্পৃক্ত থেকে সেনাবাহিনী বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক অঙ্গনে সিভিল-মিলিটারি সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল। অর্থাৎ, এই ধারণা পুনঃস্থাপন করল যে, তারা জনগণের সেনাবাহিনী যারা জনগণের সেবায় নিয়োজিত এবং তারা দেশ ও জনগণের কল্যাণের বাহক ও রক্ষক। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সেনাবাহিনীর এই নতুন করে আবিষ্কার করা পরিচয় তাদের '৮২ বা '৮৬ সালের কিছু কিছু নেতিবাচক ভূমিকাকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলবে। অদূর ভবিষ্যতে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ যে নতুন ভূমিকা নেবে সেখানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বড় অবদান থাকবে। এ প্রসঙ্গে ভবিষ্যতে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথম আলো ০৮/১০/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

# বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রশ্ন ও কর্নেল তাহেরের চিন্তা : উপমহাদেশের সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিত

এই সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি, এবং সুধীবৃন্দ।

আমার বিনীত শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। আজকে থেকে ২২ বছর পূর্বে যে বীর মুক্তিযোদ্ধা ফাঁসীর মঞ্চে হাসতে হাসতে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন, তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। আমাদের এই মাতৃভূমির জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন এবং উভয় উদ্দেশ্যে যাঁরা আহত হয়েছেন, নিগৃহীত হয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আজকের এই মহতী সভায় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে যাঁরা সম্মানিত করেছেন, অর্থাৎ কর্নেল তাহের সংসদকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১। আজকের আলোচনার বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনা বেশি হয়নি। ইদানীংকালে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী পত্রিকায় এ বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধ দেখেছি। প্রথমটি দৈনিক ভোরের কাগজে, মাস ছয়েক পূর্বের কোন এক সংখ্যায় ঐ পত্রিকারই সম্পাদক মতিউর রহমান কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধ, যার নাম ছিল নিরাপত্তার ধারণা এবং সম্পদ বণ্টনের ওপর এর প্রভাব। দ্বিতীয়টিও ভোরের কাগজেই মাসদেড়েক পূর্বেকার কোন একদিনের তারিখে। প্রবন্ধের নাম প্রতিরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন এবং জনগণের অংশীদারিত্ব; লেখক চাকুরীরত গ্রুপ ক্যাপ্টেন ইসফাক ইলাহী চৌধুরী। ইংরেজী দৈনিক ডেইলি স্টার-এর পহেলা জুলাই ১৯৯৮-এর সংখ্যায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ, নাম 'স্ট্রাটেজিক বেসিস অব বাংলাদেশেস এক্সক্লুসিভ ডিফেন্স' যার বাংলা মানে এ রকম করা যায় বাংলাদেশের একান্ত বা নিজস্ব প্রতিরক্ষার কৌশলগত ভিত্তি। লেখক জনাব খুরশিদ হামিদ। এ লেখাগুলি বললাম এ জন্যে যে, কিছু কিছু কথা যা আমি বলব তা কোনক্রমেই জনসম্মুখে প্রথমবার আসছে না, অর্থাৎ ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু আমি বলার প্রসঙ্গে গুরুত্ব হলো এই যে, আমি একজন প্রাক্তন সেনাকর্মকর্তা। সকল প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তার জন্য এটা প্রযোজ্য নাও হতে পারে, কিন্তু আমাকে, চাকরি জীবনে দায়িত্বের সুবাদেই আজকের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত এবং মানসিকভাবে চিন্তাযুক্ত থাকতে হয়েছে, একাধিকবার।



www.nagorikpathagar.org

২। আমি মনে করি প্রতিরক্ষা বিষয়ে দেশের জ্ঞানী ও গুণীজনদের মধ্যে আলোচনা হওয়া ভাল। আজকের এই আলোচনার মাধ্যমে যদি বিদ্যমান ক্ষীণ প্রক্রিয়াটি সবল হয় তাহলে আমরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করব। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নিয়ে বাংলাদেশীগণকেই ভাবতে হবে, বিদেশী কেউ এসে আমাদের জন্য সে কাজটি করে দিয়ে যাবেনা যদি না তিনি লর্ড ক্লাইভের গুণে গুণান্বিত ও বৈশিষ্ট্যময় হন। এবং আমরা এ মাটিতে আর লর্ড ক্লাইভ ও তার বন্ধু মীর জাফরকে চাই না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, দেশ হিসাবে জন্মের প্রথমদিন থেকেই, যেহেতু আমরা অন্যের সাহায্য ও পরামর্শের উপর নির্ভরশীল সেহেতু আমাদের জাতীয় ভাবেই বদঅভ্যাস হয়েছে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া। ঐ যুক্তিতেই, মনের অসতর্ক অংশে, প্রতিরক্ষা বিষয়েও একটি অবহেলা জন্ম নিয়েছে। জন্মের সময়ই ১৯৭১ মুক্তিযুদ্ধ কালে যেকোন পরিস্থিতি বা যেকোন কারণেই হউক আমাদের স্বাধীন জন্ম অন্যের গভীর সহায়তায় হয়েছে, সেহেতু অনেকের মনেই প্রতিরক্ষা বিষয়ে গঠনমূলক চিন্তা নিরুৎসাহিত হয়।

৩। সাধারণভাবে জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে এবং সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিয়ে অন্য কোন সুযোগে আলোচনা হয়ত হবে। আজকের আলোচনা প্রতিরক্ষা নিয়ে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মানেই কিন্তু নিরাপত্তা ব্যবস্থা নয়। অর্থাৎ ন্যাশনাল সিকিউরিটি বা জাতীয় নিরাপত্তা মানে কিন্তু ন্যাশনাল ডিফেন্স বা জাতীয় প্রতিরক্ষা নয়। তবে উভয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। প্রতিরক্ষা নিরাপত্তারই অংশ তথা নিরাপত্তার বস্তুগত বাস্তবায়ন বা ফিজিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন হলো প্রতিরক্ষা বা ডিফেন্স। সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান বলেছেন, আসলেই আমাদের দেশের রাজনৈতিক নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে নিরাপত্তানীতি বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় বলে আমরা শুনিনি। তেমন কোন দলিল বা প্রস্তাব আমরা দেখি না। তবে বিশেষ মহলে এ নিয়ে কিছুটা আলোচনা হয় অবশ্য। তবে সেটাও সব সময় সরাসরি বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে হয় না। কথাটা সত্যের নিকটতম। তবে জাতির সবচেয়ে বড় দুর্যোগের মুহূর্তে তথা বহিঃশত্রুর আক্রমণকালে সেনাবাহিনী কি করবে, সেটা সেনাবাহিনীর জানা আছে। অর্থাৎ মনে করুন, বাংলাদেশে ফুটবল ফেডারেশন এবং জাতীয় ফুটবল টিমের জন্য কোন কোচ না থাকলে, ঐ ফুটবল টিমের যা অবস্থা হতে পারে ঐ রকম কোন কিছু। ঐ এগারোজন খেলোয়াড় অবশ্যই খেলবে এবং কোন না কোনদিকে গোল করতে পারে।

৪। কর্নেল তাহের আমার থেকে এগার বছর বড় ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর সক্রিয় কর্মজীবন বা একটিভ লাইফ মাত্র পাঁচ বছর। সাত মাস মুক্তিযুদ্ধে, আনুমানিক এক বছর শান্তিকালীন সেনাবাহিনীতে এবং আরো বৎসরাধিককাল বেসামরিক দায়িত্বে। তিনি মাত্র ১৫ বৎসর সামরিক চাকরি করার মাথায়



www.nagorikpathagar.org

সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করত অবসর নেন। সেনাবাহিনীতে থাকা অবস্থায় এবং তার পরেও তিনি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করতেন এবং সোচ্চার হয়ে কথা বলতেন। প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে কর্নেল তাহেরের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না কারণ আমি অনেক কনিষ্ঠ ছিলাম। এ বিষয়ে আমি দুইটি পুস্তকের উপরে নির্ভরশীল। প্রথম পুস্তকের নাম অসমাপ্ত বিপ্লব-তাহেরের শেষ কথা, দ্বিতীয় সংস্করণ; ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬। লেখক লরেন্স লিফশুলৎস। দ্বিতীয় পুস্তকের নাম ফাঁসির মঞ্চে কর্নেল তাহের- একটি অজানা কাহিনী, ১ম সংস্করণ; জানুয়ারি, ১৯৯৬, লেখক-আনোয়ার কবির। লিফশুলৎস এর লেখা পুস্তকের ১৩০ পৃষ্ঠা থেকে ১৫৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ২৫ পৃষ্ঠাব্যাপী কর্নেল তাহেরের ভাষণটি মুদ্রিত আছে, যেই ঐতিহাসিক ভাষণটি তিনি ১৯৭৬এর জুলাইতে স্পেশাল ট্রাইবুনাল-এর সামনে তাঁর নিজ পক্ষ সমর্থন করে দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের যুদ্ধের কৌশল নিয়ে কিছু কথা বলেছেন, যেগুলো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় চিন্তায় প্রাসঙ্গিক লিফশুলৎস এর পুস্তকের ১১ থেকে ২৬ এই ১৬ পৃষ্ঠায় লিফশুলৎস কর্তৃকই লেখা বাংলা প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ আছে। ঐখানেই লিফশুলৎস, কর্নেল তাহেরের মতে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য বা আকাঙ্ক্ষিত সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। আমি একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি। কিন্তু এসব করতে হলে দেশের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে অন্যান্য সব সমাজে প্রচলিত কায়দা থেকে ভিন্ন করে সম্পূর্ণ নতুন কাঠামোর অধীন করে গড়ে তুলতে হতো। সামরিকীকরণ ও সামরিক স্বৈরতন্ত্র দমন করতে হলে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক সেনাবাহিনীর দরকার ছিল। তাহের জানতেন সশস্ত্র বাহিনীর সামনে মাত্র দুটো পথ। হয় তারা দেশের দরিদ্রতার সমাধানে এগিয়ে আসবে, নতুবা অন্যান্য অনেক দেশে যেমন হয়, তারা এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অংশ হয়ে দাঁড়াবে, দেশের ক্রমবর্ধমান দরিদ্রতা টিকিয়ে রাখাটাই হবে যার কাজ।

এক কথায় বলা যায়, তাহের যেমন আমাকে বলেছিলেন, একটা দরিদ্র ও অনুন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে কৃষি ও শিল্পে বিনিয়োগ করার মতো উদ্বৃত্ত অর্থনৈতিক সম্পদ খুব কমই থাকে। সেনাবাহিনী একদিকে এই উদ্বৃত্ত অর্থনৈতিক সম্পদ সৃষ্টির কাজে জড়িত হতে পারে। সেক্ষেত্রে তারা দেশের বিনিয়োগ ক্ষমতার প্রসারে সাহায্য করবে। আর তা যদি না হয়, তবে সেনাবাহিনী দেশের অপ্রতুল অভ্যন্তরীণ সম্পদের ওপর সবচেয়ে বড় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। যেই সেনাবাহিনী সামরিক পরজীবী শক্তিতে পরিণত না হয়ে বরং সমাজকে উদ্বৃত্ত আয় এনে দেবে সেই সামরিক শক্তিকে সম্পূর্ণ নতুন এক কাঠামোতে সংঘবদ্ধ করার কথা তাহের সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নেবার পরপরই স্বাধীনতার শুরু থেকে বলে আসছিলেন।



www.nagorikpathagar.org

কর্নেল তাহেরের দ্বিতীয় আশংকাটিই বাস্তবায়ন হল কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন প্রথমটি।

৫। কর্নেল তাহেরের কুমিল্লা সেনানিবাসে তৎকালে অবস্থিত ৪৪ পদাতিক ব্রিগেড কিছু অভিনব কাজে অংশ গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু করে। যথা, সেনানিবাসের ভিতরে পতিত জমিতে এবং সেনানিবাসের চতুর্পাশ্বের গ্রামের পতিত জমিতে চাষাবাদ করা অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদনে জাতীয় প্রচেষ্টায় অবদান রাখা। এই কাজটি তিনি করেছিলেন নিজ বুদ্ধি ও বিবেচনায়। প্রত্যেক সেনানিবাসে প্রত্যেক ইউনিটের আশে-পাশে কিছু খালি জমি থাকত। এই জমিগুলি ঐ ইউনিটকে বরাদ্দ দেওয়া হত। ইউনিট ঐ জমিগুলি সেনানিবাসের আশেপাশে কোন চাষীকে বর্গা দিত। এই নিয়মে তিনটি লাভ হত যথা, জমিটি ব্যবহার হল, ইউনিট কিছু উপার্জন করল এবং চাষীও কিছু উপার্জন করল। এই নিয়মটি বহু বছর যাবৎ বৃটিশ-ভারতীয়, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রচলিত ছিল। বিগত বছরগুলিতে সেনানিবাসগুলির আয়তন বাড়েনি কিন্তু ইউনিটের সংখ্যা বেড়েছে ফলে ইউনিটগুলির নামে বরাদ্দ করা যায় এমন জমির পরিমাণ কমে আসছে। ঢাকা সেনানিবাসে এই প্রথাটি এখন নাই বললেই চলে। কর্নেল তাহের ১৯৭২ সালে একটি ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যথা—গ্রামকে সেনানিবাসের ভিতরে না এনে, সেনানিবাসকে গ্রামে নিয়েছিলেন। এখনো মাঝে মধ্যে সেনাবাহিনীকে প্রকল্প ভিত্তিতে বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হয়, যেমন সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প, কুমিল্লা গোমতী নদী বাঁধ আংশিক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প, ফছিয়াখালী হতে লামা সড়ক নির্মাণ প্রকল্প ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষণীয় যে, সেনাবাহিনীকে কোন গঠনমূলক প্রকল্পে নিয়োগের কোন পরিকল্পনা বা অবকাশ স্থায়ীভিত্তিতে নাই। কর্নেল তাহের যা চেয়েছিলেন; তার মধ্যে এটিই অন্যতম। কর্নেল তাহের ও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে চেয়েছিলেন দেশের মাটিতে বা দেশের ভিতরে থেকে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করতে। কিন্তু অন্য অনেকে চেয়েছিলেন ভারতের মাটিতে প্রধান ঘাঁটিসমূহ রেখে যুদ্ধ পরিচালনা করতে। কর্নেল তাহের চেয়েছিলেন ধীরে ধীরে দেশের ভিতরে কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-সৈনিক সকলের মিলিত কয়েক লক্ষ জনবলের গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলতে। এবং ঐ গেরিলা বাহিনী দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে দখলদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে দেশ স্বাধীন করতে। অপর দিকে অন্য অনেকেই সম্মত ছিল আধা গেরিলা আধা নিয়মিত, ক্ষুদ্রাকৃতির মুক্তিবাহিনী দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার একটি পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় দেশকে পাকিস্তানীদের হাত হতে মুক্ত করা। গত ২৭ বছরের প্রকাশিত বিভিন্ন মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বই পুস্তক পড়ে আমার মনে এই



www.nagorikpathagar.org

ধারণা জন্মেছে যে, শেষোক্ত ধারণাটি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের চিন্তা-প্রসূত ছিল। যদি কর্নেল তাহেরের পরিকল্পনা মোতাবেক গেরিলা যুদ্ধ হত তাহলে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সেনাবাহিনীর মনোবল এবং বর্তমান প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তাভাবনা অন্য রকম হত।

৬। প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই যে প্রশ্নটি আসে সেটি হলো প্রতিরক্ষা কার বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান মনে মনে কল্পনা করুন। আমাদের ভূমি সীমান্ত বা ল্যান্ড বাউন্ডারী ২ (দুই) হাজার মাইলের অধিক। এর ১০ (দশ) ভাগের নয় ভাগ ভারতের সঙ্গে; দশ ভাগের এক ভাগ মাত্র বার্মা বা মায়ানমার এর সঙ্গে। দক্ষিণ এশিয়ার একটি ম্যাপকে দেয়ালে টাঙিয়ে দূরের থেকে প্রত্যক্ষ করলে মনে হবে ভারতের দেহের ভিতরে একটি বাইরের হাত ঢুকে আছে। পেটের ভিতরে টিউমারের মত। আমাদের দেশকে যদি কেউ শারীরিকভাবে আক্রমণ করে তাহলে কে করতে পারে এবং কোন দিক দিয়ে করতে পারে এটিই মূল প্রশ্ন। কেউ আক্রমণ করবে কি করবে না, করলে কেন করবে, বা না করলে কেন করবে না ইত্যাদি প্রশ্ন এই মুহূর্তে বিবেচ্য নয়। বাংলাদেশকে কেউ আক্রমণ না করুক সেটা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। কিন্তু করলে কারা করবে সেটার উত্তর আমাদের জানা উচিত। তাদের নিজেদের প্রয়োজনে, আমাদের ইমিডিয়েট প্রতিবেশীরই বাংলাদেশ আক্রমণ করার সম্ভাবনা শতকরা নব্বই ভাগ। দশ ভাগ রেখে দিলাম লর্ড ক্লাইভের আমলের বাণিজ্যগোষ্ঠির ছদ্মবেশে সেনাদলের মত বিংশ শতাব্দির কোনো গোষ্ঠির জন্য।

৭। অদৃশ্য কিন্তু প্রয়োজনীয় আংগিকগুলি বাদ দিলে, বর্তমান সময়ে দেশ আক্রমণ দৃশ্যত ত্রিমাতৃক যথা জলে, স্থলে ও আকাশে। অনুরূপ, প্রতিরক্ষা বাহিনীও দৃশ্যতঃ ত্রিমাতৃক যথা জলে, স্থলে ও আকাশে। আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীও ত্রিমাতৃক যথা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। অতি সম্প্রতি পনের বিশদিন আগের কোন তারিখের দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের তুলনামূলক শক্তির বর্ণনা তুলে ধরে প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। পুরাপুরি না হলেও মোটামুটি নির্ভরযোগ্য চিত্র, যেকোন দেশের সেনাবাহিনী সম্বন্ধেই, মিলিটারী বেলেন্স নামক বাৎসরিক-সাময়িকীতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহকে গড়ে তোলা হয়েছে সনাতনিক বা কনভেনশনাল ধারণা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে অর্থাৎ বহিঃশত্রু আক্রমণ করলে আমি যুদ্ধ করব এবং মাতৃভূমি রক্ষা করব। বাংলাদেশের মাটিতে ১৯৭১ সাল ব্যতীত আর কোনো আধুনিক যুদ্ধ সংগঠিত হয় নাই। ১৯৭১ সালের যুদ্ধটি আমাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধ বলে পরিচিত। পাকিস্তানের কাছে প্রথমে ছিল একটা আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দমন, পরে হয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ। ভারতের কাছে



www.nagorikpathagar.org

এটা ছিল পাকিস্তান বিরোধী একটি যুদ্ধ। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পত্রপত্রিকায় গত ২৭ বছরে বহুবার বলা হয়েছে, কিন্তু গত ২ মাসে অতিমাত্রায় অধিক বার বলা হয়েছে এবং লেখা হয়েছে যে, পাকিস্তান এবং ভারত উভয়ে স্বাধীনতার পর থেকে তিনটি যুদ্ধে লড়েছে – দুইটি কাশ্মীর নিয়ে এবং ৩য়টি বাংলাদেশ ও অন্য অঞ্চল নিয়ে। ১৯৭১ সালের যুদ্ধের শেষের তিন সপ্তাহের অভিজ্ঞতাই কেন জানি বাকী আট মাসের অভিজ্ঞতা থেকে বেশী প্রাধান্য পায় বা পাচ্ছে। ১৯৭১ সালে যেমন এই মাটিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী কনভেনশনাল অপারেশন পরিচালনা করেছিল, যদি তাদের প্রয়োজন পড়ে তাহলে তারা পুনরায় সেটা করবে। অপর পক্ষে, পাকিস্তান বাহিনীর দখলদারিত্ব ও আক্রমণের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী যা করেছিল এবং ভারতীয় সনাতন পদ্ধতির আক্রমণের বিরুদ্ধে শেষের তিন সপ্তাহে পাকিস্তানী বাহিনী যা করেছিল, এই উভয়েরই সংমিশ্রণে গড়ে তোলা একটা পদ্ধতি আমাদেরকে ভবিষ্যতে অনুসরণ করতে হবে বলে আমি মনে করি। তবে বর্তমানের জন্য দুইটা গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য উপাদান আছে। প্রথমটি হল বিগত ২৭ বছরে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি ও দর্শনীয় পরিবর্তন। যমুনা সেতু একটি উদাহরণ। এটি দখল করার জন্য অগ্রিম বিমানবাহিত আক্রমণ খুবই স্বাভাবিক। যমুনা সেতু কোন পক্ষ কর্তৃক নষ্ট করার জিনিস নয়। এটাকে অক্ষত রেখে ব্যবহার নিশ্চিত করাই হবে লক্ষ্য। ঐরূপ পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমরা কতটুকু প্রস্তুত সেটা আলোচনার দাবি রাখে। দ্বিতীয় বিবেচ্য উপাদানটি হল এই যে, ১৯৭১ এ পাকিস্তানীরা যখন ভারতীয়দের সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করে (পরিকল্পনার একটা প্রকাশ-যোগ্য রূপ বা ভাষ্য জেনারেল নিয়াজির পুস্তকের ৩০৫ থেকে ৩১৬ পৃষ্ঠায় বিধৃত আছে) তখন, বাংলাদেশের মাটি ও পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভারতীয়রা অনভিজ্ঞ ও অনবিহিত ছিল। কিন্তু এখন যখন আমরা বাংলাদেশীরা কোন চরম দুর্যোগের পরিকল্পনা করব তখন মনে রাখতে হবে বিগত সাড়ে ২৭ বছরের বহুমাত্রিক সম্পর্কের মাধ্যমে আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের মাটি, মানুষ ও আকাশ সম্বন্ধে অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও অবহিত হয়েছেন।

৮। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী আয়তনে ক্ষুদ্র। সরঞ্জামে বেশি দুর্বল না হলেও সবল নয়। সামরিক অভিজ্ঞতা থেকে অনুমান করতে পারি কি পরিমাণ সংখ্যার বা আয়তনের সেনাদল নিয়ে কেউ বাংলাদেশ আক্রমণ করতে পারে। এই রকম কোন যুদ্ধ যদি সূচিত হয় তাহলে আমাদের প্রতিরক্ষা যুদ্ধ শুরু হবে। অনুগ্রহ পূর্বক আশির দশকের ইরান ও ইরাকের মধ্যকার ৬ বৎসর মেয়াদী সীমান্ত যুদ্ধের কথা খেয়াল করুন। কেহই হারে নাই কেহই জিতে নাই, কারণ উভয়ের মধ্যে সামরিক শক্তির ব্যালেন্স বা ভারসাম্য ছিল। বাংলাদেশ ক্ষেত্রে



www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশের অনুকূলে এই রকম অনুমান করা বা কল্পনা করা কঠিন, বলতে গেলে বাতুলতা মাত্র। সনাতন শক্তির ভারসাম্য আক্রমণকারীর পক্ষে থাকার সম্ভাবনা নির্ঘাত। তাহলে কি বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা যুদ্ধ করবে না বা বাংলাদেশ কি অবশ্যম্ভাবীভাবে যুদ্ধে হেরে যাবে? উত্তর হল, না। বাংলাদেশ অবশ্যই প্রতিরক্ষা যুদ্ধ করবে এবং ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ পরাজিত হবে না। যে ভারসাম্যের কথা আমি একটু আগে বললাম ঐ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অনুকূলে শক্তি গড়ে তোলা সনাতন পদ্ধতিতে প্রায় অসম্ভব। কারণ বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র এবং সামরিক খাতে প্রত্যক্ষ ব্যয় জনগোষ্ঠীর নিকট নিরংকুশভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। বলা যায় যে, সামরিক খাতে উল্লেখযোগ্য ব্যয় বাড়ানোর মত অর্থনৈতিক শক্তি আমাদের নাই এবং অদূর ভবিষ্যতে হবেও না। এ জন্যেই, বাংলাদেশের ভবিষ্যতের প্রতিরক্ষা যুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রতিরক্ষা-নীতি, বিশেষ রণকৌশল এবং প্রয়োজনীয় বাহিনী গঠন জরুরি ভিত্তিতে বিবেচনার দাবি রাখে।

৯। এখন সময় আসছে বর্তমানে প্রতিরক্ষার জন্য মওজুদ সংগঠন এবং বোধগম্য প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় চিন্তা-ভাবনা নিয়ে সীমিত আলোচনা করার। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় যতগুলি সেনানিবাস আছে তার মধ্যে ৮টি বড় যথা-ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, যশোর এবং রংপুর। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৭টি ডিভিশনের সদর দপ্তর ৭ জায়গায় এবং সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত। পৃথিবীর অনেক দেশে ডিভিশন নাম সংগঠনের উপর আর একটি সংগঠন থাকে যেটাকে কোর বলা হয়, কিন্তু বাংলাদেশে সেইটি নাই। নিচের দিকে ব্যাটালিয়ান ব্রিগেড ইত্যাদি এবং উপরের দিকে ডিভিশন এই হলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কাঠামো। উপরন্তু পুরো বাংলাদেশকে ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে, যে সুবাদে ঢাকার বাহিরে অবস্থিত ৭ (সাত) টি ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টারই ঐ অঞ্চলগুলি দেখাশুনা করে। উদাহরণস্বরূপ, আমার চাকুরী যাওয়ার পূর্বে আমি যশোর অঞ্চলের আঞ্চলিক অধিনায়ক বা এরিয়া কমান্ডার এবং যশোর সেনানিবাসে অবস্থিত ডিভিশনটির অধিনায়ক বা জি, ও, সি ছিলাম। আমার আঞ্চলিক সীমা রেখা ছিল উত্তরে পদ্মা, পূর্বে পদ্মা ও মেঘনা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রেখা। ঐ এলাকায় ১২৭ টি থানা ছিল। এই রকম সব এরিয়াতে সীমারেখার অভ্যন্তরে বা এরিয়ার ভিতর যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব এরিয়া কমাণ্ডারের তথা জিওসি-র। তাকে সম্ভব সকল পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য সৈন্য সামন্ত দেওয়া আছে। ঐ সংগঠনগুলি অনেক ক্ষেত্রেই অপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ। তবে বিনীত ভাবে বলতে চাই যে দেহ আর বড় করতে চাইনা, কিন্তু বিদ্যমান দেহের প্রয়োজনীয় অংগ-প্রত্যঙ্গগুলির সংযোজন করা (তথা সংগঠন করা) প্রয়োজন বলে মনে করি।



www.nagorikpathagar.org

এখন আর একটি উদাহরণ নিন ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে ব্যাটালিয়ান আছে, তার উপরে ব্রিগেড আছে, তার উপরে ডিভিশন আছে, তার উপরে কোর আছে, তার উপরে কমান্ড হেড কোয়ার্টার আছে এবং সব কিছুর উপর দিল্লিতে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর আছে। সমগ্র ভারতকে ভৌগোলিকভাবে ৪ (চার) টি কমাণ্ড হেড কোয়ার্টারের আওতায় বিভক্ত করা হয়েছে। ইস্টার্ণ কামাণ্ডের হেড কোয়ার্টার হলো কলিকাতা মহানগরীতে অবস্থিত ফোর্ট উইলিয়ামে। ভারতীয় নৌবাহিনীতেও দুটো কমান্ড আছে। যথা পূর্বাঞ্চলীয় ও পশ্চিমাঞ্চলীয়। ভারতীয় সেনাবহিনী বিরাট আকৃতির; তাদের সীমান্ত থেকে বহির্মুখি সম্ভাব্য অপারেশন এলাকা বা কর্মক্ষেত্র বিরাট বিধায় তারা তাদের সেনাবাহিনীকে নিজেদের প্রয়োজন মত সংগঠন করেছে। আমরাও বাংলাদেশে, আমাদের প্রয়োজন মত নিজেদেরকে সংগঠিত করতে চেষ্টা করছি। আমি বলতে দ্বিধা করব না যে, বিবিধ অসুবিধা বা পিছুটানের কারণে আমরা লক্ষ্য মাত্রায় পৌছাতে পারি নাই। কখন পারব তাও বলা মুশকিল।

১০। প্রতিরক্ষা বিষয়ে চাকুরিতে থাকা অবস্থায় কোন অফিসারের পক্ষে খোলামেলা আলোচনা করা অসম্ভব না হলেও অসুবিধাজনক। অবসর নেওয়ার পর আগ্রহী এবং যোগ্য অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাগণ এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে। ভারতে এ অভ্যাসটি বহুল প্রচলিত। পাকিস্তানে গত আট বছর যাবৎ দানা বেঁধে উঠছে। উন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলিতে এটি অতি আবশ্যকীয় পানতা ভাত। বাংলাদেশে অভ্যাসটি চালু করার চেষ্টা করছি। পিস মেকিং ও স্ট্রাটেজিক স্ট্রাডিজ এর উপরে একটা থিংক-ট্যংক তথা-প্রতিষ্ঠান করার জন্য আমি চেষ্টারত আছি। সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেই। ১৯৯১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীসমূহের যিনি অধিনায়ক ছিলেন তথা-ইস্টার্ন কমান্ডের কমান্ডার ছিলেন, সেই লে: জে: এ, এ, কে নিয়াজী ১৯৯৮ সালে একটি পুস্তক লিখেছেন। এটি অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস থেকে প্রকাশ করা হয়েছে। পুস্তকের নাম দি বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান। অপর পক্ষে, ১৯৭১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কলকাতা কেন্দ্রিক ইস্টার্ণ কমান্ড হেড কোয়ার্টারের প্রধান স্টাফ অফিসার যাকে চীফ অব স্টাফ বলা হয়, সেই একাত্তর সালের চীফ অব স্টাফ তৎকালীন মেজর জেনারেল (পরবর্তীকালে লেঃ জেনারেল) জে এফ আর জেকব একটি পুস্তক লিখেছেন। পুস্তকের নাম সারেন্ডার এ্যাট ঢাকা-বার্থ অব এ নেশন। পুস্তকটি ঢাকা থেকে দি ইউনিভারসিটি প্রেস লিঃ ১৯৯৭ সালে প্রকাশ করেছে। এই পুস্তকগুলিতে উভয় পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ঘটনাবলী পাওয়া যায়। উভয় পুস্তকেই আলোচনা যেমন আছে, তেমন সমালোচনাও আছে। আমি জেনারেল জেকবের বই থেকে একটি



www.nagorikpathagar.org

উদ্ধৃতি দিব। পুস্তকের ১৬০-১৬১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি অনুচ্ছেদের অংশের বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপ—

জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিদেশনীতি এবং সামরিক কৌশল প্রণয়ন এবং সমন্বয় করার জন্য কোন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল যে নাই, এই অনুপস্থিতিটি গভীরভাবে অনুভূত হয়েছিল।---------। সর্ব-উচ্চ পর্যায়ে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য কোন চীফ অব স্টাফ পরিষদ বা চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ নাই।---------- বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মিলিটারী স্ট্রাটিজি বা সামরিক কৌশল (বা সামরিক রণনীতি) পড়াশুনার প্রতি অবহেলা হত। আমাদের স্টাফ কলেজ এবং কলেজ অব কমবেট-এ টেকটিকস এবং স্টাফ ডিউটিজ পড়ানো হত ব্রিগ্রেড এবং ডিভিশন পর্যায় পর্যন্ত, কিন্তু তিন বাহিনীর কোন বাহিনীরই সদর দপ্তরে কোন সমন্বিত বা কমপ্রিহেনসিভ স্ট্রাটিজিক স্টাডিজ বা রণ কৌশলের মূল্যায়ন করা হয় নাই। এবং জাতীয় নিরাপত্তায় কোন সম্ভাব্য দুর্যোগের মুহূর্তের জন্য প্রযোজ্য কোন আপদকালীন (বা আপৎকালীন) ব্যবস্থার মুল্যায়ন তথা- স্ট্রাটিজিক এসেসমেন্ট সম্পূর্ণ গুরুত্ববিহীন ছিল। আমি বিনীতভাবে নিবেদন করব যে,আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা উপরের বর্ণনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলে যায়।

১১। অনেক ব্যক্তি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এই ধরনের একটা ধারণা প্রকাশ করেন যে, ভারতের সংগে আমরা কোনক্রমেই টিকতে পারব না, তথা- সম্মুখ সমরে ভারতীয় বাহিনী অবশ্যই আমাদের বাহিনীকে অতি অল্প দিনে পর্যুদস্ত করে ফেলবে, অতএব আমাদের কোন বাহিনী গড়ে তোলা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করাটাই একটা অপচয়। আমি এই মতবাদের সঙ্গে জোরালো  দ্বিমত পোষণ করি। স্থায়ী সামরিক বাহিনীর বিকল্প শুধুমাত্র নাগরিক বা সিটিজেন আর্মি বাস্তবসম্মত নয়। বস্তুত, আমাদের প্রতিরক্ষা নীতির বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা পড়ে আমি একটা ওপেন সিকরেট আবিষ্কার করতে পারছি। সেই ওপেন সিকরেটটি হল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পনর অথবা বিশ অথবা পঁচিশ অথবা ত্রিশ অথবা চল্লিশ দিন মেয়াদের একটা সময়ে গণবাহিনী বা গেরিলা বাহিনী, পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক স্থান নিবে এবং দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ শুরু করবে। তবে ঐ সময় জনগণের কোন একটি অংশ ক্ষুদ্র হলেও আক্রমণকারীকে যে সাহায্য করবেনা সেটাও গ্যারান্টি দিয়ে বলা যাচ্ছে না। এই ধরনেরই একটা চিন্তা-ভাবনা বিগত বৎসরগুলিতে মাঝে মধ্যে হয়েছে। যার ফলে আনসার এবং ভিডিপি বাহিনীর জন্ম হয়েছিল। মোদ্দা কথা হল,ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে গণমুখী ও গণ- সংশ্লিষ্ট করতে হবে। জনতাকে নিয়েই আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়তে হবে। তার একটা বড় অংশ হবে গেরিলা বাহিনী। বাংলাদেশের পুরো জমিটাই হবে যুদ্ধ ক্ষেত্র। ঐ গেরিলা বাহিনীকে এমনভাবে গড়ে তুলতে



www.nagorikpathagar.org

হবে যাতে করে বাংলাদেশে সনাতন পদ্ধতির প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহ কর্তৃক আক্রমণকারী শত্রুকে ঠেকিয়া রাখা বা ব্যস্ত রাখার অবস্থায়ই গেরিলা বাহিনী স্থান নিতে পারে। এর জন্য পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি শান্তিকালীন সময়ে কিছু কিছু আঙ্গিকে প্রকাশ্যে আবার কিছু কিছু আঙ্গিকে গোপনে নিতে হবে। তার আগে অবশ্য প্রয়োজন, জাতীয় ভিত্তিতে মোটামুটি ঐকমত্য- তত্ত্বের উপরে, এবং তত্ত্বের ব্যাপারে জন সমর্থন।

১২। বিদ্যমান সামরিক বাহিনী তাদের মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষিত কাজ কতটুকু করতে পারবে সেটা নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। আমার মতবাদ হল বিদ্যমান সামরিক সংগঠনগুলিতে যে কমতি বা ডিফেসিয়েনসি আছে এইগুলিকে ধীরে ধীরে পূরণ করা হউক, প্রশিক্ষণের গুণগতমান উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক, ব্যবস্থাপনার গুণগতমান উন্নত করা হউক, নেতৃস্থানীয় তিনশতাধিক অফিসারের মধ্যে গণমুখী সমন্বয়কামী চিন্তার প্রসার ঘটানো হউক এবং সর্বশেষ মনোবল ধ্বংসকারী বা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধিকারী অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ নিষ্পত্তি করা হউক। সাপ্তাহিক চলতি পত্র ২২শে জুন ১৯৯৮-এর ভাষায়, ঘুষের বাজেট না দিয়ে বাস্তবধর্মী বাজেট প্রয়োজন। একই বাজেট নিয়ে ১৩ই জুন ১৯৯৮-এর দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠায় বর্ণিত প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির হিসাবে শুভংকরের বিরাট ফাঁকটি বন্ধ করা প্রয়োজন। ১১ই এপ্রিল ১৯৯৮ ভোরের কাগজের ৫ নং পৃষ্ঠায় ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার ভারতীয় প্রতিরক্ষা সম্বন্ধে অভিযোগ করে কলাম লিখেছেন যার শিরোনাম ছিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আরো স্বচ্ছতা প্রয়োজন। আমি এই মঞ্চ থেকে আমাদের দেশের ব্যাপারেও একই আহবান জানাচ্ছি। যদিও আমাদের দেশে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনা শীর্ষ পর্যায়ে দ্বিখণ্ডিত যথা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর মাধ্যমে।

১৩। বিগত মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর পর দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিত পরিবর্তিত হয়েছে। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যকার পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং কোনখানে হঠাৎ করে ব্যবহার আমাদের জন্য মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে। উভয় দেশই এখন বলছে যে তারা প্রথম ব্যবহার করবে না। গত মাসের ৩০ তারিখে সন্ধ্যাবেলা হোটেল শেরাটনের বল রুমে প্রাক্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী আই. কে. গুজরাল যে ভাষণটি দিয়েছিলেন সেটির লিখিতরূপ উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। সেখানে নয় নম্বর পৃষ্ঠায় অনুচ্ছেদের শুরুতেই জনাব গুজরাল বলেন, ইন্ডিয়া আনডারটুক দি নিউক্লিয়ার টেস্টস বিকজ ইন্টারনেশন্যাল কমিউনিটি (মানে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক ভারতের বাস্তবভিত্তিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আশংকাগুলিকে যেহেতু আমলেই নেওয়া হচ্ছিল না, তাই, ভারত পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়)।



www.nagorikpathagar.org

ঐ একই যুক্তিতে ভারত যদি কোন সময় পারমাণবিক অস্ত্র প্রথম ব্যবহার করে ফেলেন তাহলে আমাদের করার কিছুই থাকবে না। বাংলায় প্রবাদ আছে যে, কোন কাজ করানো যায় ছলে বলে ও কৌশলে। আমি বল প্রয়োগ বাদ দিচ্ছি। অন্য সকল পন্থায় দক্ষিণ এশিয়ায় পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা স্তিমিত করতেই হবে।

১৪। আমাদের দরকার পারমাণবিকের বদলে মানবিক ও মানবীয় অস্ত্র। মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা জীবন যাত্রার মান যেমনই উন্নত করতে পারবো তেমনি প্রতিরক্ষায় মানব সম্পদের ব্যবহার ও গুণগতভাবে উন্নত করতে পারবো।আমার বক্তব্যের সর্বশেষ নিবেদন হলো যে, নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা সমন্ধে চিন্তা-ভাবনায় রক্ষণশীলতা , প্রাচীনতা ও রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত হতে হবে। স্বাধীন চিন্তার অবকাশ দিলে উন্নত বক্তব্য আশা করা যায়। ধন্যবাদ।

[২০শে জুলাই ১৯৮৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি মিলনায়তনে তাহের সংসদ আয়োজিত সেমিনারে পঠিত এবং ২২তম তাহের দিবস স্মারকপুস্তিকা 'চেতনায় তাহের'-এ প্রকাশিত]



www.nagorikpathagar.org

# বোকামির কারণেই বিএসএফ মারা গেছে

বাংলাদেশ-ভারত সাম্প্রতিক সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম বলেছেন, নিজের দেশের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত না করে ধৈর্য্যের সাথে এটা অতিক্রম করতে হবে। এই সমস্যার সাথে কেবল পররাষ্ট্র ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নয়, বিডিআর এবং বাংলাদেশের আপামর জনগণের দেশপ্রেমসিক্ত অনুভূতির সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বলেন, রৌমারীতে ৩ জন বিডিআর সদস্যের পাশাপাশি ১৬ জন বিএসএফ সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনা দুঃখজনক হলেও যে প্রশ্নটি থেকে যায় তাহলো- বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের মাটিতেই বিএসএফ সদস্যরা নিহত হলো কেন? এ প্রশ্নটির ওপর আমাদের মিডিয়া জগৎ কম গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, বিডিআর সদস্যগণ দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। বিডিআর-এর দক্ষতা ও সাহসিকতার জন্য সরকার ও দেশবাসী গৌরববোধ করতে পারে। ভারতকে সালাম দিলেই দেশপ্রেমিক হবো, অন্যথায় নয়- এ মানসিকতাটা সঠিক নয়। তবে হ্যাঁ, আমরা অযথা মারামারি চাই না। প্রয়োজনও নেই। মেজর ইব্রাহিম '৭১ সালের রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা। বীর প্রতীক খেতাবধারী। তিনি সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজ-এর নির্বাহী পরিচালক। প্রতিষ্ঠানটি একটি বেসরকারি থিংক ট্যাঙ্ক যার অন্যতম কাজ হচ্ছে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ওপর কাজ করা। বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের সাম্প্রতিক রক্ষীদের ভূমিকা নিয়ে মানবজমিন-এর পক্ষ থেকে গতকাল তার সাথে আমরা কথা বলি।

প্রশ্ন : সাম্প্রতিক সীমান্ত সমস্যাকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

জেনারেল ইবরাহিম : বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত সমস্যাকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে। প্রথমত, দ্বিপক্ষীয় জরিপের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে সীমান্ত রেখা চিহ্নিতকরণের কাজটি শেষ করতে হবে। ২৭ বছর আগের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি খুবই কম এবং যতটুকু জানি ভারতীয় পক্ষে শিথিলতাটাই বড় অন্তরায়। অনেকদিন যাবৎ যদি অনেকগুলো সীমান্ত সমস্যা অমীমাংসিত থাকে তা হলে কোনো না কোনো সময় সেসব এলাকায় সেটা বিস্ফোরণ হতে বাধ্য। দ্বিতীয় আঙ্গিক হচ্ছে উভয় দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী দু'টির মধ্যে যে কোনো কারণেই হউক না কেন বিদ্যমান অবিশ্বাস ও ক্ষোভ। বিএসএফ-এ যখন এবং যেসব এলাকায় বাংলাভাষী সদস্য ছিলো বা আছে সেখানে উত্তেজনা ও অবিশ্বাস কম বলে জানা যায়। কিন্তু ভারতের অন্য ভাষাভাষী সদস্যের সাথে আমাদের দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর মানসিক আস্থা কম। তৃতীয় আঙ্গিক হচ্ছে : প্রতিশোধের প্রবণতা। সিলেট সীমান্তে



www.nagorikpathagar.org

পাদুয়া গ্রাম বিডিআর উদ্ধার করেছে। আপাতদৃষ্টিতে এবং ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এটাকে বিএসএফ-এর ব্যর্থতা বলা যায়। এই ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য অন্য কোনোখানে সফলতা অর্জনের একটি সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা বিএসএফ-এর মনে জন্ম নেয়াটা অস্বাভাবিক নয়। বস্তুগত যুক্তি বা তথ্য-প্রমাণ দিয়ে এটা প্রমাণ করা যাবে না। এটা অভিজ্ঞতালব্ধ মূল্যায়নের বিষয়। বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাদুয়া গ্রামের ঘটনার বিবরণ এসেছে। রৌমারীতে ১৬ জন বিএসএফ সদস্য নিহত হওয়ার ঘটনা দুঃখজনক হলেও যে প্রশ্নটি থেকে যায়, সেটি হলো বাংলাদেশের মাটিতেই তারা নিহত কেন হলো? এ প্রশ্নটির ওপর আমাদের মিডিয়া জগৎ গুরুত্ব কম দিচ্ছে। সমস্যাটির সাথে পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তথা বিডিআর এবং বাংলাদেশের আপামর জনগণের দেশপ্রেমসিক্ত অনুভূতির সম্পর্ক রয়েছে। নিজ দেশের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত না করে ধৈর্যের সাথে এটাকে অতিক্রম করতে হবে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকার ভালো, বিডিআর খারাপ– এ জাতীয় বক্তব্যের ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

জেনারেল ইবরাহিম : এ ধরনের বক্তব্য অসৌজন্যমূলক এবং কাম্য নয়। যিনি বা যারা এ বক্তব্য দিচ্ছেন তাদের আমি কিছু বলতে পারছি না। কিন্তু আমার দেশে কেউ যদি এটা মেনে নেয় সেটা অগ্রহণযোগ্য। ভালো হউক, মন্দ হউক উপরন্তু কর্তৃপক্ষ বা অধিনায়ককেই দায়িত্ব নিতে হয়। এটাই শিখেছি। বিডিআর কি সরকারের নির্দেশ অমান্য করেছে? বিডিআর সদস্যগণ দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। বিডিআরের দক্ষতা ও সাহসিকতার জন্য সরকার ও দেশবাসী গৌরববোধ করতে পারে। দু'একটি বড় বড় পত্রিকায় কেউ কেউ বলছেন, এটা বিডিআর কর্তৃক সাধন করা একটি নাশকতামূলক কাজ। কেউ কেউ বলেছেন, বিডিআর-এর ভিতর পাকিস্তানি পকেট আছে। এ সকল বক্তব্য মোটেও কাম্য নয়। ভারতকে সালাম দিলেই বাংলাদেশ প্রেমিক হবো, অন্যথায় নয়– এ মানসিকতা সঠিক নয়। তবে হ্যাঁ, আমরা অযথা মারামারি চাই না।

প্রশ্ন : যে পরিস্থিতিতে বিডিআর গুলি চালিয়েছে, তার কি কোনো বিকল্প ছিল?

জেনারেল ইবরাহিম : পত্রিকা থেকে যে বিবরণ পেয়েছি তাতে মনে হয় বিডিআর-এর বিকল্প ছিলো নিজেরা মরা এবং তাদের বিওপি বিএসএফ সদস্যদের হাতে তুলে দেয়া। ঐ রকম পরিস্থিতিতে বিডিআর সদস্যদের জনগণ নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত করতো। এখন স্থানীয় জনগণ ২০/৩০ মাইল দূর থেকে সাহসী বিডিআর সদস্যদের দেখতে যাচ্ছে। তখন এর উল্টো হতো।

প্রশ্ন : রণাঙ্গনে আপনার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে, কেন এতো বিএসএফ সদস্য মারা গেলো?

জেনারেল ইবরাহিম : বিষয়টি খুবই সিম্পল। তাদের বোকামির কারণেই তারা মারা গেছে। পাশাপাশি বিডিআর সদস্যরা অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। গ্রামবাসীরাও



www.nagorikpathagar.org

ইনফরমেশন দিয়ে তাদের সহযোগিতা করেছে। সৈনিকদের সব সময় একটি শিক্ষা দেয়া হয়, 'কিলিং রেঞ্জের' ভিতর না আসা পর্যন্ত 'ফায়ার ওপেন' না করা। বিডিআর তাই করেছে। যখন তারা দেখেছে চতুর্দিক দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলা হয়েছে, তাদের নিজের জীবন ও ভূমি বিপন্ন, তখন তারা খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। বিএসএফ প্রথমে গুলি চালালেও বিডিআর গুলি করেনি। তারা চুপ করে ছিল। বিএসএফ তখন আরো উৎসাহ নিয়ে কিছুটা রিল্যাক্সড মুডে সামনের দিকে এগিয়ে গেলে রেঞ্জের ভিতর আসামাত্র বিডিআর ফায়ার ওপেন করে। বিডিআর এ রকম করবে, বিএসএফ মনে করেনি। ঘটনার যেসব বর্ণনা এসেছে, তাতে এটাই মনে হয়েছে।

প্রশ্ন : ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

**জেনারেল ইবরাহিম : এ প্রসঙ্গে আমি সব সময় আড়াই হাজার বছর আগেকার একটি ঘটনা মনে করি। দ্বিগবিজয়ী গ্রিক বীর আলেকজান্ডার সিন্ধু নদীর তীরে এসে ক্ষুদ্র একটি রাজ্যের রাজা 'পুরু'কে বন্দী করেন। তিনি পুরুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কেমন ব্যবহার আশা করেন? পুরু উত্তর দিয়েছিলেন, একজন রাজার নিকট থেকে আরেকজন রাজার যেমন হওয়া উচিত। আমাদের প্রতিবেশী ভারত এটা বুঝলে ভালো।**

প্রশ্ন : '৯৬-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে সেনাবাহিনীর একটি ঘটনা এবং ২০০১-এর নির্বাচনের আগে বিডিআর-এর ঘটনার কোনো মিল খুঁজে পান কি-না?

**জেনারেল ইবরাহিম : প্রশ্নের উত্তরটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। যথাসময়ে নিশ্চয়ই দেশবাসী এ বিষয়ে অবগত হবেন। উভয় ঘটনার পেছনে সুপ্ত লক্ষ্য ছিলো বলে আমার কাছে অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু লক্ষ্য যে পূরণ হবেই– এমন গ্যারান্টি যারা ঘটনার পেছনের লোক, তারাও দিতে পারেন না।**

দৈনিক মানবজমিন ২৫/০৪/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

# পাদুয়া থেকে রৌমারী-চাঁদপুরে মেঘনা-পদ্মা?

দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ বা সীমান্ত সংঘর্ষ নতুন কোন জিনিস না। কিন্তু কোনো কোনো সময় এ ধরনের ঘটনা বিশেষ চিন্তার উদ্রেক করে। এখন থেকে ৮৫ দিন আগে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে সীমান্ত সংঘর্ষ ঘটেছিল সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে এবং তার মাধ্যমে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ পেয়েছে। ২৬ এপ্রিল ২০০১ তারিখে আমিও একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ এই পত্রিকায় লিখেছিলাম। বেশকিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি এবং কিছু মন্তব্য প্রকাশ থেকে বিরত থেকেছি। এই মুহূর্তে সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে লেখালেখি বন্ধ। দু'দেশের যৌথ সীমান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ সৃষ্টি হয়েছে। ২০ জুন ২০০১ পত্রপত্রিকার একটি সংবাদ ছিল যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'এক বছরের মধ্যে সীমান্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব।' পত্রিকান্তরে শিরোনাম ছিল 'সমাধান হবে।' তিনি ১৯ জুন মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এ কথা বলেন। দৈনিক জনকণ্ঠের ২২ জুন ২০০১ তারিখে ১২ পৃষ্ঠায় বড় শিরোনাম ছিল '১৮ দিনে বিএসএফ-এর গুলিতে ৯ জন নিরীহ মানুষ খুন।' একই দিনে অর্থাৎ ২২ জুন তারিখে সকল পত্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দে সাজানো কিন্তু একই অর্থ বহনকারী সীমান্ত নিয়ে শিরোনাম ছিল। যথা- 'দিল্লি বৈঠকে সমঝোতার পর এ ধরনের ঘটনা দুঃখজনক' (মাতৃভূমি) : 'সীমান্ত ফের উত্তপ্ত : বাংলাদেশের প্রতিবাদ' (মানবজমিন)। ২, ৩ ও ৪ জুলাই ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষেও উভয় দেশের পক্ষ থেকে নৈরাশ্যজনক না হলেও তাৎপর্যপূর্ণ ফলাফল বের হয়ে আসেনি। অতএব যৌথ সীমান্ত ওয়ার্কিং গ্রুপ কার্যকর হওয়া সত্ত্বেও সমস্যা সমাধানের আন্তরিকতা যথাযথ মাধ্যমে ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর অন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না সেটা প্রশ্নাধীন বিষয়। তাই এপ্রিল মাসের সীমান্ত সংঘর্ষের কারণে সীমান্ত সমস্যা ছাড়াও বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের আরো কয়েকটি আঙ্গিক নিয়ে আলোচনার প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যকার আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক কী রকম আছে ও কী রকম হলে ভালো, আলোচনার দাবিদার প্রশ্নগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। তবে আলোচনা করার আগে নাতিদীর্ঘ পরিসরে পাদুয়া ও রৌমারীর ঘটনার স্মৃতিচারণ অপরিহার্য।

গত মে মাসের ২৩ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিতে সীমান্ত সংঘর্ষের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। ২৫ মে তারিখে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক মাতৃভূমিতে সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবেদন ছাপানো হয়েছে (মনে হয় হুবহু)। এতে পাঠক সমাজ উপকৃত হয়েছেন, এ অনুমান করা যায়। আমার এই নিবন্ধ লেখায় ওই প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা রেখেছে।



www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সীমান্তের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪ হাজার ১৫৬ কিলোমিটার। এর মধ্যে স্থল সীমান্ত হচ্ছে ৩ হাজার ৯৭৬ কিলোমিটার এবং জল সীমান্ত হচ্ছে ১৮০ কিলোমিটার। মোট সীমান্তের মধ্যে মাত্র ৪২ কিলোমিটার সীমান্ত নিয়ে ভারতের সঙ্গে এখন পর্যন্ত সমস্যা বিদ্যমান। এই ৪২ কিমি-এর মধ্যে ৩৫.৫ কিমি সীমানা উভয়পক্ষ যৌথভাবে চিহ্নিত করে বাঁশের খুঁটি লাগিয়েছে, কিন্তু কংক্রিট বর্ডার পিলার লাগানো সম্ভব হয়নি। ৪২ কিমি-র মধ্যে ৬.৫ কিমি সীমানা এখন পর্যন্ত অচিহ্নিত রয়েছে। সীমান্ত নিয়ে সার্বিক সমস্যার আওতায় আরো দুটি আঙ্গিক আছে। একটি হলো অপদখলীয় এলাকাসমূহে অপদখল ক্ষান্ত করে সঠিক দেশের কাছে হস্তান্তর এবং ছিটমহলসমূহ দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময় করা। সীমান্তরেখা চিহ্নিতকরণ, অপদখলীয় এলাকা সঠিক মালিকের কাছে হস্তান্তরকরণ এবং ছিটমহলসমূহ দুদেশের মধ্যে বিনিময়, এই তিনটি কাজ সঠিক সমাধা করার নিমিত্তেই ১৯৭৪ সালের ১৬ মে তারিখে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু উভয় দেশ অনুমোদন না করলে এই চুক্তি বলবৎ হবে না। চুক্তি স্বাক্ষরের কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলাদেশ চুক্তিটি অনুমোদন করলেও বিভিন্ন অজুহাতে ভারত এটিকে এখনো অনুমোদন করেনি। ফলে সমস্যা থেকেই গেছে। ১৯৭৫ সালে ভারত এবং বাংলাদেশ উভয় দেশের কর্তৃপক্ষ যৌথ বর্ডার গাইড লাইনস বলবৎ করে। এ গাইড লাইনগুলো মেনে চললে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে বিরোধ কম হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু ভারতীয় পক্ষ এ বিষয়ে খুবই উদাসীন বলে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রায়শই বলা হয়ে থাকে। গত কয়েক দিনের দৈনিক পত্রিকার সংবাদ বাছাই করলেও প্রায় প্রতিদিনই সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ কর্তৃক এই গাইড লাইন ভঙ্গের খবর পাওয়া যাবে।

সিলেট জেলার উভয় সীমান্তে পাদুয়া গ্রামে গুলিবিহীন সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল গত এপ্রিল মাসের ১১ থেকে ১৮ তারিখ। এর একটু ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার। বিগত কয়েক বছরে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত জুড়ে রিং রোড বা সীমান্ত সড়ক তৈরি করে তাদের বিএসএফ-এর বিওপিগুলোর মধ্যকার যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে। এখন পর্যন্ত যে অল্প সীমান্ত এলাকায় রিং রোড নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি তার মধ্যে 'লাখাট-পাদুয়া' অন্যতম। পাদুয়া গ্রাম বাংলাদেশের মতে বাংলাদেশের ভূমি। ১৯৭১-এর আগে পাদুয়া গ্রাম নিয়ে ভারতের সঙ্গে কোনো বিরোধ ছিল না। ১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক সেখানে একটি ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিল এবং স্বাধীনতার পর মুক্তিবাহিনী তা ছেড়ে আসে। তখনই একান্ত অনৈতিকভাবে বিএসএফ ক্যাম্পটি দখল করে ব্যবহার করতে থাকে এবং বিগত ৩০ বছর যাবৎ সেটি ব্যবহার করে আসছে। দখলিস্বত্ব বলে একটি কথা আমাদের সমাজে চালু আছে। ওই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই গত কয়েক বছর যাবৎ ভারতীয় কর্তৃপক্ষ পাদুয়াকে অপদখলীয় ভূমি হিসেবে উপস্থাপন করে আসছে। কিন্তু বিডিআর কখনই সেটি মানেনি। বিডিআর বেশ কিছুদিন যাবৎ বিএসএফকে অনুরোধ করছে ওই



www.nagorikpathagar.org

ক্যাম্পটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। পাদুয়ার বিএসএফ-এর মতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ না পাওয়ায় স্থানটি বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়নি। বিগত মার্চ মাসের শেষের দিকে দেখা গেল যে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের লাখাট ক্যাম্প এবং পাদুয়া ক্যাম্পের মধ্যে সড়ক নির্মাণ শুরু করেছে। নির্মিতব্য ও নির্মাণাধীন সড়কটি সীমান্ত রেখা থেকে মাত্র ২০-২৫ গজ দূরে হওয়ায় সেটা ১৯৭৫ সালের বর্ডার গাইড লাইনস-এর পরিপন্থী হয়ে পড়ে। অতএব বাংলাদেশ পক্ষ বিএসএফ-এর কাছে কাজ বন্ধ করার দাবি জানায়। বিএসএফ অস্থায়ীভাবে কয়েক দিন কাজ বন্ধ রাখার পর ১১ এপ্রিল রাতের অন্ধকারে অতিরিক্ত সৈন্যের পাহারাধীনে পুনরায় সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করে। পরবর্তী চার দিন বিডিআরের পক্ষ থেকে একাধিক চেষ্টা করা হয় বিএসএফকে বৈঠকে আনতে এবং নির্মাণকাজ বন্ধ করাতে, কিন্তু সম্ভব হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে ১৫ এপ্রিল দিবাগত রাতে আশপাশের এলাকা থেকে অতিরিক্ত সৈন্য যোগাড় করে বিডিআর পাদুয়ায় অবস্থিত বিএসএফ ক্যাম্পের অল্প দূরত্বে তিনটি অবস্থান গ্রহণ করে। এর ফলে ঘোষিত অবরোধ না হলেও এবং বিএসএফ-এর চলাচলের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপিত না হলেও কার্যত এটি অবরোধে রূপান্তরিত হয়। পাদুয়ার বিএসএফ এবং পাদুয়ার চারপাশে বিডিআর উভয় বাহিনীই নিজস্ব চেইন অফ কমান্ড মোতাবেক উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। এর মধ্যে সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে উভয়পক্ষের মধ্যে বৈঠক হতে থাকে।

সম্মানিত পাঠক, অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল করুন যে, এ ঘটনা বাংলাদেশের প্রধান দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি ১৮ এপ্রিল ভোরে। একটি দৈনিকে শিরোনাম ছিল : '৩০ বছর পর ভারতের দখল থেকে পাদুয়া গ্রাম পুনরুদ্ধার, তামাবিল সীমান্তে উত্তেজনা।' আরেকটি দৈনিকের শিরোনাম ছিল : 'সিলেট সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফ মুখোমুখি : যেকোন মুহূর্তে সংঘর্ষ।' তৃতীয় একটি দৈনিকের শিরোনাম ছিল : '৩০ বছর পর ভারতীয় অবৈধ দখল থেকে বাংলাদেশী গ্রাম পুনরুদ্ধার।' একযোগে ইংরেজি ও বাংলা সব পত্রিকায় প্রায় একই রকম শিরোনাম ছিল এবং সংবাদের সূত্র ছিল ঢাকা মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিডিআরের সদর দপ্তরে বিডিআরের মহাপরিচালক কর্তৃক আহূত সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত ব্রিফিং। অর্থাৎ সুদূর সিলেটের উত্তর সীমান্ত থেকে সংবাদটি কোনো সাংবাদিক কর্তৃক ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত হয়নি। বরং পরিস্থিতির একটি সুনির্দিষ্ট পর্যায়ে সরকারের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা (তথা বিডিআরের মহাপরিচালক) রাজনৈতিক সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি নিয়ে পাদুয়া অবরোধের কমবেশী ৪৮ ঘণ্টা পর সাংবাদিকদের জানান এবং আরো ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা পর মিডিয়ার মাধ্যমে দেশবাসী জানে।

ঘটনা ঘটানো এবং ঘটনাটি দেশবাসীকে জানানোর প্রক্রিয়া এমন ছিল যে, বিডিআর তার স্বাভাবিক তৎপরতার বাইরে একটি অস্বাভাবিক কাজ করেছে। অর্থাৎ হে বাংলাদেশবাসী! দেখুন, 'বাংলাদেশ সরকার ভারতের কাছ থেকে জমি উদ্ধারে সফল হয়েছে।' এই কলামে বলা উচিত একটু পরে, কিন্তু এই মুহূর্তে বলে রাখছি যে,



www.nagorikpathagar.org

বিডিআর প্রধান মহোদয় প্রেস ব্রিফিং দেয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই পাদুয়া থেকে বিডিআর সরে আসে এবং বিএসএফ অবরোধমুক্ত হয়। 'পাদুয়া পুনরুদ্ধার' খবরটি যতবড় শিরোনামে পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়েছিল, 'পাদুয়া পরিত্যক্ত' এ খবরটি তার এক-চতুর্থাংশ আকারে প্রকাশিত হয় এবং রৌমারীর ঘটনার খবরের ডামাডোলে পাদুয়া হারানোর খবর হারিয়ে যায়। সে পাদুয়া এই মুহূর্তেও বিএসএফ-এর দখলে। অতএব ১৭ এপ্রিল সাংবাদিকদের ব্রিফিং দেয়া এবং ১৮ এপ্রিল পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'পাদুয়া পুনরুদ্ধার'-এর নামে চমকপ্রদ শিরোনাম সৃষ্টি করাটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিডিয়া স্টান্ট বলেই এখন মনে হচ্ছে।

পাদুয়ায় বিডিআর যা করেছে সেটা অবশ্যই সঠিক। গত দুমাসে কিছু কিছু ব্যক্তিত্ব বা লেখক কোনো কোনো পত্রিকায় প্রশ্ন তুলেছেন যে, হঠাৎ করে বিডিআর কেন পাদুয়া দখল করতে গেল বা পাদুয়া যদি বাংলাদেশেরই ভূমি হবে তাহলে এত সরকার এবং বিডিআরের মহাপরিচালক গত হয়ে গেল কিন্তু তারা কেন কিছু করল না? আমার অনুভূতি হয়েছে যে, শুধু পাদুয়া দখল করার জন্যই কোনো সরকার কোনো নির্দেশ বিডিআরকে দেয়নি এবং বিডিআরের আগেকার কোনো মহাপরিচালক পাদুয়ার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিডিআরকে ওই আদেশ দেননি। এবারের ঘটনার উৎপত্তি পাদুয়ায় ভারত কর্তৃক সীমান্তনীতি লংঘন করে সড়ক নির্মাণ। সড়কটি নির্মিত হচ্ছে পরে ভাঙা আরো মুশকিল হবে উপলব্ধি করেই বিডিআরের মহাপরিচালক অবরোধ ব্যবস্থার আদেশ দিয়েছিলেন। এরূপ আদেশ দেওয়ার আগে বিডিআরের মহাপরিচালক মহোদয় তার উপরস্থ কর্তা অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন কি নেননি সেটা আমাদের জন্য খুবই গৌণ ব্যাপার এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিডিআরের মহাপরিচালকের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ আনুষ্ঠানিক বা আধা আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের ব্যাপার। কিন্তু এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। সে প্রসঙ্গে এখানে একটু উল্লেখ করছি, পরে আবার উল্লেখ করব। ২০ এপ্রিল দৈনিক ভোরের কাগজ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ। সেটি হচ্ছে, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট বা আপদকালীন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরপরই আমাদের দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হঠাৎ করে বলে ফেলল যে, পাদুয়ার ঘটনা ঘটানোর আগে বিডিআর আমাদের অবহিত করেনি এবং পাদুয়া ছেড়ে দেওয়ার আগেও আমাদের কিছুই জানায়নি। ঢাকা থেকে ২৩ এপ্রিল তারিখে অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত ভারতীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের বক্তব্য ছিল, 'সীমান্তের ঘটনা বিডিআরের একক পদক্ষেপ, বাংলাদেশ সরকার কিছুই জানত না।' একটি সরকার কখনো দ্বিখণ্ডিত হতে পারে না। অতএব আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিক্রিয়া সার্বিকভাবে দেশের প্রশাসন সম্বন্ধে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই সুযোগে ভারতের প্রশাসন বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পায়।



www.nagorikpathagar.org

গত দুমাসে ভারতীয় কিছু কিছু পত্রিকা এবং সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনগুলোতে প্রকাশিত সংবাদের ওপর ভিত্তি করে বলতে পারি যে, ২৬ এপ্রিল তারিখে এই পত্রিকারই কলামে যেটা গল্প আকারে বলেছিলাম সেটাই ঠিক। রৌমারীর ঘটনার পরবর্তী ১৫-২০ দিন ভারতের রাজনৈতিক সরকারের ব্যক্তিত্বসমূহ এবং বড় বড় আমলা অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলেছেন। দৃশ্যত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সরকারের উপকার করার জন্য বাংলাদেশের বিডিআর, জনগণ ও সেনাবাহিনীকে নিয়ে অনেক উল্টাপাল্টা কথা বলেছে। ভারত থেকে প্রচারিত ব্যক্তিমালিকানাধীন টিভি চ্যানেলসমূহ বিবিধ রাজনৈতিক মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা ও আমলাদের মতামত এবং বক্তব্য প্রচার করেছে। ভারতীয় পত্রপত্রিকা ও সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে প্রচারিত বক্তব্য বাংলাদেশের অতি অল্প লোক প্রত্যক্ষভাবে পড়েছে। ওইগুলোর বরাতে আমাদের পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সংবাদ ও তথ্য হাজার হাজার বাংলাদেশী পড়েছে। ভারতীয় টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠানসমূহ হাজার হাজার বাংলাদেশী প্রত্যক্ষভাবে দেখেছে ও শুনেছে। এর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশীদের একটি অংশ বিব্রত হয়েছে। অপর অংশ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়েছে।

পাদুয়ায় যখন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি, তখন বাংলাদেশ সীমান্তের অন্যান্য জায়গায় কী হচ্ছে? বাংলাদেশের সীমান্ত কর্তৃপক্ষ সরেজমিন ভারতীয় কোনো আগ্রাসী প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন কি ছিলেন না, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। তবে যেহেতু রৌমারীর কাছে বড়াইবাড়ি বিওপিতে ১৯ এপ্রিল সকালে ভারতীয় আক্রমণের সময় মাত্র ১০ জন বিডিআর সদস্য উপস্থিত ছিল বলে জানা গেছে এবং এ ধরনের সংখ্যাই বিওপিগুলোতে উপস্থিত থাকে বলে জানি; সেহেতু আমার উপসংহার হচ্ছে যে, বাংলাদেশ সীমান্ত কর্তৃপক্ষ পাদুয়ার কারণে বিশেষ কোনো আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতি গ্রহণ করেনি। পাশাপাশি প্রশ্ন হচ্ছে, পাদুয়ায় যখন উত্তেজনাকর পরিস্থিতি চলছিল তখন ভারতীয় পক্ষে কী হচ্ছিল, এ প্রশ্নের উত্তর আমি ২৬ এপ্রিল ২০০১ তারিখে লেখা এ পত্রিকায় প্রকাশিত কলামে দিতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তখন উত্তর দিয়েছি পরোক্ষভাবে বা রূপক বা গল্পের ছলে।

এখন কিঞ্চিৎ খোলাসা করছি। সাপ্তাহিক আউটলুক, ইন্ডিয়া টুডেতে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ভারতীয় রাজনৈতিক সরকারের আদেশে বা বকা খেয়ে দিল্লিতে অবস্থানকারী বিএসএফ-এর সর্বভারতীয় প্রধান শিলিগুঁড়িতে অবস্থিত অন্যতম ইন্সপেক্টর জেনারেলকে নির্দেশ দেন। শিলিগুঁড়ির প্রধান তার অধীনস্থ, বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ এলাকার সঙ্গে মেঘালয় সীমান্তের জন্য দায়ী বিএসএফ ডিআইজিকে নির্দেশ দেন। ডিআইজি মহোদয় তার অধীনস্থ, বিএসএফ ব্যাটালিয়ন কমান্ডারকে নির্দেশ দেন। ব্যাটালিয়ন কমান্ডার মহোদয় তার অধীনস্থ, বাংলাদেশের রৌমারী থানার বিপরীতে অবস্থিত বিএসএফ-এর কোম্পানি কমান্ডারকে নির্দেশ দেন। নির্দেশের দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক নির্যাস ছিল অনেকটা এ রকম : 'পিচ্চি একটা দেশ বাংলাদেশ। তার বাহিনী হলো বিডিআর। ঢাল-তলোয়ার কি আছে তার? আমাদের



www.nagorikpathagar.org

বিএসএফকে ঘেরাও করলো পাদুয়ায়, কত সাহস তার? তোমরা বিএসএফ কি ঘুমিয়ে ছিলে? লজ্জা লাগে না বিডিআর-এর হাতে যে অপমান হলো? আমরা সাত-পাঁচ বুঝি না, মার খেয়েছ, পাল্টা মার দিবে। দিয়ে এসে বলবে। বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে ওয়ারলেস করবে।' যেই কথা সেই কাজ। ১৫ এপ্রিল রাতে পাদুয়া অবরোধ হওয়ার পর থেকে নিয়ে ১৮ এপ্রিল মধ্য রাত হচ্ছে প্রায় ৭২ ঘণ্টা সময়। এ সময়টিতে একদিকে বিএসএফ কর্তৃপক্ষ বিডিআরের সঙ্গে পতাকা বৈঠক করতে থাকে, অন্যদিকে বিএসএফ প্রস্তুত হতে থাকে সীমান্তের অন্য কোথাও বিডিআরকে ধরে 'ডাণ্ডা মরে ঠাণ্ডা' করে দেওয়ার জন্য। বিএসএফ কর্তৃক ওই 'ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা' করার স্থানটি নির্বাচিত হয় ভারতের মানকাচরের বিপরীতে বাংলাদেশের বড়াইবাড়ি গ্রাম ও বিওপি। সময় নির্ধারিত হয় ১৮ এপ্রিল দিবাগত রাত তথা ১৯ এপ্রিল ভোর ৪টা।

বড়াইবাড়ি এলাকার বড়াইবাড়ি গ্রাম এবং বিওপি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের ভূমিতে। ভারতের দিক থেকে অগ্রসর হলে সীমান্ত রেখার পরেই হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র নদী। নদীর পর হচ্ছে অল্প কিছু ভারতীয় জমি, যেটা বাংলাদেশের অপদখলে আছে। তারপরেই হচ্ছে বাংলাদেশের বড়াইবাড়ি গ্রাম। ঢাকায় বিডিআরের মহাপরিচালক কর্তৃক সাংবাদিকদের পাদুয়ার ঘটনা জানানোর ১০-১২ ঘণ্টা পর ১৮ এপ্রিল অতি প্রত্যুষে রৌমারীতে বিএসএফ আক্রমণ করে এবং হতাহত হয়। ওই খবর বৃহত্তর দেশবাসী জানতে পারে ১৯ এপ্রিল সকালের পত্রিকা পড়ে। পত্রিকার পাঠকগণের কাছে মনে হবে এই যে, ১৮ তারিখের ভোরের পত্রিকায় পাদুয়ার ঘটনা পড়লাম এবং ১৯ তারিখের ভোরের পত্রিকায় রৌমারীর ঘটনা পড়ছি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুটি ঘটনা ঘটল! কী আশ্চর্য! আসলে সরেজমিন পাদুয়া ঘটনার ৭২ ঘণ্টার পর রৌমারীর ঘটনা ঘটেছে। অতএব সামরিক পেশাগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রৌমারীর ঘটনাকে কোনোক্রমেই কোনো তাৎক্ষণিক স্থানীয় সিদ্ধান্ত বলা যাবে না। এটা ঠাণ্ডা মাথায় গৃহীত ভারতের একটি সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন ছিল। যেমনটি ঠাণ্ডা মাথার একটি সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করেছিল পাদুয়ায়।

বাংলাদেশের রৌমারী থানার বড়াইবাড়ি গ্রামের সীমান্তে, ভারত কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে বহু আগেই। এই কাঁটাতারের বেড়াতে আবার গেটও আছে। বহুসংখ্যক বিএসএফ সেই গেট খুলে বাংলাদেশে ঢোকে। বাংলাদেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কেমন করে বিএসএফ-এর সৈন্যদল পথ ভুল করে বা দিক হারিয়ে ফেলে বা বাংলাদেশের বিওপিকে চিহ্নিত করতে দেরি করে। পত্রপত্রিকায় আরো প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশের বিওপির বিডিআর সদস্যরা ত্বরিৎ সংবাদ পায় এবং বিদ্যমান আত্মরক্ষামূলক প্রস্তুতিকে জোরদার করে। ৩ শতাধিক বিএসএফ সদস্যের জন্য ১০-১২ জন বিডিআর সদস্য সংবলিত বিওপিকে ধূলিস্যাৎ করে দেওয়া কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু ভবিতব্য ঘটনাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়। বিডিআরের সৈন্যরা সংখ্যায় মাত্র অল্প কয়েকজন হলেও তারা ছিল পরিকল্পিতভাবে প্রস্তুত করা প্রতিরক্ষা অবস্থানে। আর বিএসএফ সদস্যরা ছিল খোলা ধানক্ষেতে। যা হওয়ার তাই হয়েছে। পাখির মতো গুলি খেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বিএসএফ বাংলাদেশের মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। কতজন বিএসএফ



www.nagorikpathagar.org

সদস্য বাস্তবে আসলে মারা গেছে সেটা প্রকাশিত হয়নি। বাংলাদেশ থেকে ১৬-১৭টি মৃতদেহ ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং সুনির্দিষ্টসংখ্যক অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেরত দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের গ্রামবাসী বিএসএফকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে সীমান্ত থেকে গ্রামের ভেতরে এনেছিল বা লাঠিসোঁটা দিয়ে পিটিয়ে বিএসএফকে মেরে ফেলেছে– এ ধরনের কথা ভারতীয় পক্ষ থেকে বেসরকারি ও আধা সরকারিভাবে কিছুদিন বলা হলেও পরে এ ধরনের গাঁজাখুরি বক্তব্যের ওপর কেউ জোর দেয়নি। নিরেট সত্য হলো বাংলাদেশের মাটিতে বাংলাদেশের বিওপি আক্রমণের পর্যায়ে বিডিআরের আত্মরক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের কারণে বিএসএফ মারা গেছে। বড়াইবাড়ি বিওপিতে উপস্থিত বিডিআর, বিএসএফ-এর প্রাথমিক আক্রমণ রহিত করার পর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামবাসী যোগ দেয়। পাক্ষিক চিন্তা, দশম বর্ষ, সংখ্যা ১-২ তারিখ ৩০ জুন ২০০১-এর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় আবু ছাঈদ স্বপনের লেখা পত্র পাঠক দেখতে পারেন। জনাব ছাঈদের লেখা পত্রের শিরোনাম হচ্ছে 'ভারতের বিরুদ্ধে রৌমারীবাসীর মুক্তিযুদ্ধ।' 'সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড পিস স্টাডিজ' কর্তৃক ঢাকা মহানগরীর সিরডাপ মিলনায়তনে ১৩ মে ২০০১ তারিখে দিনের বেলা আয়োজিত সীমান্ত সংঘর্ষ আলোচনায় বিশেষভাবে দাওয়াত দিয়ে রৌমারী থেকে আনা হয়েছিল বড়াইবাড়ি গ্রামের পল্লী চিকিৎসক জনাব সাইফুল ইসলাম লাল মিয়াকে। সেদিনের সেই আলোচনা সভায় দায়িত্ব পালনরত ২২ জন সাংবাদিক ভাই এবং ১৫০ জন অন্যান্য সুধী ব্যক্তির সামনে লাল মিয়া কীভাবে বিডিআর সদস্যদের সঙ্গে বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তার বিস্তারিত বর্ণনা দেন। সেই আলোচনার সারমর্মের কমবেশি পরের দিন ঢাকার ১৮টি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রৌমারী ঘটনা নিয়ে মিডিয়া এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যক্তিত্বদের মতপ্রকাশ পর্যালোচনার দাবি রাখে। বাংলাদেশী মিডিয়া এ কথা বা তথ্য দেরিতে প্রকাশ করা শুরু করে যে, রৌমারীতে বিএসএফই আক্রমণকারী ছিল। তাও সকল গুরুত্বপূর্ণ দৈনিক পত্রিকা সমান গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেনি। পাঠক সমাজের কাছে মনে হচ্ছিল যে, ভারতীয় বক্তব্যটি সত্য নাকি সরেজমিন যা হয়েছে সেটা সত্য; কোনটি প্রকাশ করবে এ নিয়ে আমাদের প্রধান সংবাদপত্রসমূহ কিছু সন্দেহ ও দ্বন্দ্বে আছে! সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ছিল বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশের প্রায়ই নিশ্চুপ থাকা এবং সেই অংশের একটি ক্ষুদ্র অংশ কর্তৃক অবিশ্বাস্যভাবে ভারতীয় বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করা। দুটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ কলাম বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ছোটকালে শিখেছিলাম, 'রাইট অর রং-মাই কান্ট্রি এবাভ এভরিথিং'; মানে, ঠিক হোক বেঠিক হোক, আমার দেশ সবার ওপরে। কিন্তু রৌমারীর ঘটনায় চোখ খুলে দিয়েছে। যেটা অতীতে কম বিশ্বাস করেছি সেটা এখন পুরোপুরি বিশ্বাস করতে হচ্ছে। ভারত যদি কোনোদিন আমাদের দেশ বা দেশের একটি ক্ষুদ্র অংশ আক্রমণ করে তাহলে হয়তো এমন বাংলাদেশীও পাওয়া যাবে যারা সেই কর্মটির প্রতিবাদ করবেন না। হয়তো কেউ কেউ পত্রিকার কলামে ও শিরোনামে স্বাগত জানাবেন।



www.nagorikpathagar.org

কয়েক মাস আগে ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তানি দূতাবাসের উপ-হাইকমিশনার এরফান রাজা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে একটি অপমানসূচক মন্তব্য করেছিলেন। তখন আবার বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক সমাজের একাংশ একদম নিশ্চুপ ছিলেন এবং হয়তো প্রার্থনা করছিলেন, যত তাড়াতাড়ি দেশবাসী ঘটনাটা ভুলে যায়। অর্থাৎ এরফান রাজার সময় কিছু লোকের পাকিস্তান-প্রেম এবং রৌমারীর সময় কিছু লোকের ভারত-প্রেম বৃহত্তর পাঠক সমাজ ও বাংলাদেশের সুধী সমাজের দৃষ্টি মোটেও এড়ায়নি। বর্তমানের তরুণ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আগামী ২৫ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত এ প্রসঙ্গে খুবই সাবধান থাকতে হবে বলে আমি মনে করি।

ভারতীয় পার্লামেন্টে কিছুসংখ্যক ব্যক্তি (সংসদ সদস্য) দাবি তুলেছিল, ঢাকার পিলখানায় অবস্থিত বিডিআরের হেড কোয়ার্টার উড়িয়ে দেওয়া হোক। সেটা আবার টেলিভিশনের বদৌলতে বাংলাদেশের দর্শকরাও দেখেছে। স্টার টিভিতে একটা আলোচনা অনুষ্ঠান হয়েছিল যেখানে অন্যান্যের মধ্যে একজন সাবেক রাষ্ট্রদূত জে এন দীক্ষিত উপস্থিত ছিলেন। যুগপৎ কিছু সারগর্ভ ও কিছু অসার বক্তব্য উচ্চারিত হয়। একজন আলোচক বলেই ফেলেছিলেন যে, ঢাকায় আমাদের অনেক লোক আছে, তারা কী করছে? এছাড়াও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অনেক গরম গরম কথা উচ্চারিত হয়। ভারতীয় পার্লামেন্টের গরম গরম কথার মতো ওই আলোচনা সভার গরম গরম কথাও যে সমগ্র ভারতবাসীর বক্তব্য না, এটা ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলে আমরাও বুঝি। তাই পাক্ষিক চিন্তার সঙ্গে একমত হয়ে আমাদের বলতে হয় যে, উভয় দেশের জনগণের মধ্যে একটা সমঝোতা ও সম্প্রীতির সম্পর্ক প্রয়োজন, যাতে করে উগ্রপন্থীরা সমগ্র জাতিকে বিপথগামী করতে না পারে।

১৩-মে'র সেমিনারে বিভিন্ন সুধী বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছিলেন। সেগুলোর সূত্র ধরে আরো কয়েকটা কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। আমি ক্রমিক নং দিয়ে কিছু বক্তব্য তুলে ধরছি। এক, প্রায় সব বক্তাই পরিষ্কার ভাষায় বলেন যে, ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি বাস্তবায়ন না করার কারণেই সীমান্ত সমস্যা এখনো জীবিত। অতএব ভারতের উচিত সেই চুক্তি রেটিফাই করা এবং বাস্তবায়ন করা। দুই, অনেক বক্তাই বলেন যে, জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি জনগণের ঐক্য এবং পোশাকধারী প্রতিরক্ষা বাহিনী বা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জনগণের সমঝোতা। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক সীমিত সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। যেহেতু বাংলাদেশের মতো গরিব দেশের পক্ষে অনেক বড় আকারে সামরিক বাহিনী বা বিডিআর তৈরি করা সম্ভব নয় তাই 'গণপ্রতিরোধ বাহিনী' তত্ত্বটি বিবেচনায় আনার প্রস্তাব আসে। একটা প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়নের জন্য সরকারকে তাগাদা দেওয়া হয়। তিন, বাংলাদেশের জনগণের মনমানসিকতা সম্বন্ধে প্রায় সবাই এক বাক্যে বলেন যে, বাংলাদেশীরা সহজ-সরল কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয়। ১৯৭১ সালে সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য তারা ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ হলেও আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে ওই কৃতজ্ঞতা সাধারণ জনগণ প্রকাশ করবে না। ভারত বড় দেশ হতে পারে কিন্তু



www.nagorikpathagar.org

তাতে জনগণ ভীত নয়। চার, বাংলাদেশের কিছু কিছু পত্রিকা রঙিন নকশা এঁকে বিস্তারিত প্রতিবেদন, ঘটনা প্রবাহ জনগণের কাছে সহজবোধ্য করেছে। এটা খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ ছিল। পাঁচ, বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টের কোনো কাঠামো নেই। যার ফলে অল্প সরকারি বক্তব্যের মধ্যেও স্ববিরোধিতা দেখা দিয়েছে এবং অস্পষ্টতা লক্ষণীয় ছিল। বাংলাদেশের চাঁদপুরে উত্তর থেকে আসা মেঘনা এবং উত্তর-পশ্চিম থেকে আসা পদ্মা মিলিত হয়েছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, দুটি স্রোতধারার পানি কিন্তু মেশেনি এবং ওই এলাকার যেকোনো নৌযাত্রী একটু খেয়াল করলেই এটা দেখতে পাবেন। বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষানীতি এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে কিন্তু এ রকম পারস্পরিক না-মেশা কাম্য নয়। ছয়, বাংলাদেশ সীমান্তের বিভিন্ন স্থানে বিএসএফ বহুদিন যাবত বাংলাদেশী জনগণের ওপর নানা অন্যায় আচরণ করে আসছে। রৌমারী এলাকা ওই রকমই একটি। যার কারণে রৌমারী এলাকার জনগণ মনের ভেতরে ভারতের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল এবং সুযোগ পাওয়া মাত্রই সেটার প্রকাশ ঘটেছে। দূর থেকে পর্যবেক্ষণকারী যেকোনো সুধী অনুমান করতে পারেন যে, বাংলাদেশের জনগণের মনে ভারতীয় বাণিজ্য আগ্রাসন, ভারতীয় টেলিভিশন আগ্রাসন ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকদের মনে কী রকম ধারণা। সাত, ভারতীয় প্রচার মাধ্যম এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ড দ্রুত ও তাৎক্ষণিক এবং ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে ছিল। অপরপক্ষে আমাদের দেশের তৎপরতায় মনে হয় ভারতের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল।

রৌমারী ঘটনার পর ঢাকার একটি ইংরেজি দৈনিকের সম্পাদক মহোদয় ভারতীয় পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে দুটি নিবন্ধ বা কলাম ছাপাতে পাঠিয়েছিলেন। ওই দুটি কলাম বাংলাদেশেও পরে প্রকাশিত হয়েছে। একটির শিরোনাম ছিল 'For India there are only two neighbours and Bangladesh is not one of them' এবং এর দ্বিতীয় শিরোনামটি ছিল 'India-Bangladesh relation : A wake-up call', বাংলাদেশী সম্পাদক মহোদয় যা বলেছেন তা শত-সহস্র বাংলাদেশীর মনের কথা, অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণ। দ্বিতীয় শিরোনামটির বাংলা অনুবাদ হচ্ছে, 'ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক : জেগে ওঠার আহ্বান'। আসলেই রৌমারীর ঘটনা বাংলাদেশের জনগণকে ভারতের সঙ্গে আমাদের পররাষ্ট্র নীতির ও বাণিজ্য নীতির পুনর্মূল্যায়নে বাধ্য করেছে। ভারতের বৃহৎ শক্তি সুলভ মনোভাবের ব্যাপারে আমাদের নীতিগত দৃঢ় অবস্থান গ্রহণে বিরত থাকার অসহায় পরিস্থিতি থেকে আমাদের বের হতেই হবে। আমেরিকা ও ভারতকে যদি ছাগলের দুটি বাচ্চা মনে করি তাহলে আমরা তৃতীয় বাচ্চার মতো অযথা যেন না লাফাই। সেটিই এখন সময়ের আহ্বান। পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক সে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণের ঘটনাটি বিশ্বের অনেক দেশই স্বাভাবিকভাবে নেয়নি। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এবং পাকিস্তানে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে এবং অহরহ যোগাযোগ রেখেছে ও রাখছে। আরো বহু দেশ বহু কিছু বলেছে। অনেকেই কড়া কথা



www.nagorikpathagar.org

বলেছে। কিন্তু সবাই নিজ নিজ দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কিছু বলেনি। অর্থাৎ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো বা নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করতে উদ্যোগ নেয়নি। পাকিস্তানের সামরিক সরকার প্রসঙ্গে যে ভারতের মন বুঝে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি চলছিল, সেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানের সামরিক শাসককে শপথ নেওয়ার আগেই প্রেসিডেন্ট হিসেবে সৌজন্য সম্বোধন করেছে এবং সার্বিকভাবে কূটনৈতিক আন্তরিকতা নিয়ে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে পাকিস্তানের সামরিক সরকার সম্পর্কে বাংলাদেশের মন্তব্য যতটা গুরুত্ববহন করে ভারতের মন্তব্য পাকিস্তানের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

অন্য আরেকটি প্রসঙ্গ অতি অল্প পরিসরে আলোচনা করি। লোকে বলে অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে বাংলাদেশ মিয়ানমার বা বার্মার সঙ্গে এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে পারছে না। বেশ কয়েক মাস আগে মিয়ানমার থেকে অতি উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন একটি বৃহৎ প্রতিনিধিদলের ঢাকায় আসার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে সেই সফর বাতিল হয়। তার কারণ যেটি প্রকাশ্যে বলা হয়েছে, আসলে সেটি মোটেই সত্য নয় বলে বিজ্ঞজনদের বিশ্বাস। ভারত কিন্তু মিয়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ মোটেই কম রাখছে না। আমাদের থেকে এক ধাপ দূরের প্রতিবেশী চীনও মিয়ানমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলছে। কিন্তু আমরা উটপাখির মতো বালুর মধ্যে লুকিয়ে আছি। এখানে বলতে চাই যে, ৩০ বছর আগেকার মুক্তিযুদ্ধকালীন সহযোগিতার দোহাই দিয়ে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও বাণিজ্যনীতির ক্ষেত্রে, সীমাহীন সুযোগ আর মনে হয় পাওয়া উচিত হবে না। বাস্তবতা না মেনে লম্ফঝম্ফ করাটা বোকামির লক্ষণ। বাস্তবতা হলো ভারত আমাদের প্রতিবেশী। ভারত শুধু আকারে বড় নয়, অর্থনীতি, শিল্পমান, প্রতিরক্ষা বাহিনীর সংখ্যা, বিশ্ব কূটনীতিতে ভারতের চাহিদা– সবদিক দিয়েই ভারত বাংলাদেশ থেকে বড়। বাংলাদেশ ছোট এবং তুলনায় অনুন্নত। অতএব আমাদের এমন একটি সুচিন্তিত কৌশল প্রয়োজন যেন আত্মমর্যাদা বজায় রেখে নিজেদের স্বার্থ বিকিয়ে না দিয়ে বেঁচে থাকি। তার জন্য নিজেদের পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টা দরকার। আমি ভারতীয়দের দেশপ্রেমের প্রশংসা করি। তাদের কর্মকর্তাদের কর্মদক্ষতার প্রশংসা করি। আমি তাদের কুলীন ব্যবসায়ীদের দেশপ্রেমের প্রশংসা করি। আমার প্রার্থনা, সর্বক্ষেত্রে ভারতবিরোধিতা না করে কিছু ক্ষেত্রে আমরা যেন শিক্ষা নেই। ওই রকম একটি ক্ষেত্র হচ্ছে দেশপ্রেম তথা নিজ দেশের স্বার্থরক্ষার কৌশল।

দৈনিক প্রথম আলো ১৩/০৭/২০০১ইং এবং ১৪/০৭/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

# যাঁরা বলেন সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই তাঁরা বাংলাদেশকে ভারতভুক্ত করতে চান

একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ফসল বাংলাদেশে বাস করে যারা বলেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই তাদের অনেকে এমনও মনে করেন যে, এ দেশের পৃথক স্বাধীন অস্তিত্বেরইবা কি প্রয়োজন? যদি তাই না হবে তাহলে যেখানে প্রতিটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের মানুষ মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায় সেখানে বাংলাদেশে এ ধরনের হীনম্মন্য, পরজীবী মানসিকতার জন্ম হয় কিভাবে? অকৃত্রিম দেশপ্রেমের টানে যৌবনের দুরন্ত দিনগুলোয় যে সামরিক কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন সেই মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহম্মদ ইব্রাহিম বীরপ্রতীক, পিএসসি আজ সঙ্গতকারণেই সশস্ত্র বাহিনীকে ঘিরে কোন নেতিবাচক প্রচারণা মেনে নিতে পারেন না। দৈনিক ইনকিলাব প্রতিনিধির সাথে আলাপকালেও তিনি তাঁর সে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অকপটে। আয়তনে বিশাল ভারতের কাছে স্বাধীন বাংলাদেশ কিরূপ সমতা ও মর্যাদা আশা করে সে প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেন সম্রাট আলেকজান্ডার ও রাজা পুরুর মধ্যে আড়াই হাজার বছর পূর্বের আলাপচারিতার ঘটনা। সিন্ধু নদের তীরে ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা পুরুকে আলেকজান্ডার জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি আমার কাছ থেকে কিরকম ব্যবহার আশা করেন? রাজা পুরু গর্বের সাথে বলেছিলেন, রাজার নিকট থেকে, রাজার প্রতি, রাজার মতো। একই সাথে তিনি এও মনে করেন যে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা আর গত ৩০ বছর ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের বিরোধিতা করা এক বিষয় নয়। বাংলাদেশে প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে সাম্প্রতিক জনআলোচনাকে ইতিবাচক লক্ষণ হিসেবে উল্লেখ করে মেঃ জেঃ ইব্রাহিম জানান যে, প্রতিরক্ষা কেবলমাত্র সশস্ত্র বাহিনীর বিষয় নয়। তাই প্রতিরক্ষা নীতি নিয়ে এখন প্রকাশ্যে যেসব কথাবার্তা হচ্ছে তাতে জনগণ এ বিষয়ে যেমন জানার সুযোগ পাচ্ছে তেমনি প্রতিরক্ষা বিষয়ে তাদের যে ধোঁয়াটে ধারণা ছিল তাও অনেকেটা কেটে গিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে জনসচেতনতা। গণতান্ত্রিক একটি দেশে এভাবেই একটি বিষয়ে প্রথমে জনমত গঠিত হয় যা পরবর্তী সময় একটি নীতিমালা প্রণয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ কিরূপ হওয়া উচিত, এ প্রশ্নের তিনি বলেন যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা মতবাদ ঐরকম হওয়া উচিত যেটা বলে দেয় ভবিষ্যত যে কোন আক্রমণের সময় আমরা কিভাবে নিজেদের রক্ষা করব? এবং এ মতাবাদে এটা ধরে নিতে হবে, কেউ না কেউ আমাদের আক্রমণ করতে পারে। অর্থাৎ কখনো কারও আক্রমণের শিকার হব না এ ধারণা থাকা চলবে না। কারণ, যেকোন মুহূর্তে যেকোন দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার কথা ধরে নিয়েই



www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীর সকল দেশ প্রতিরক্ষা মতবাদ প্রণয়ন করে আসছে। এ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র, দরিদ্র দেশ হলেই যে প্রতিরক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা থাকবে না এ মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করে মেঃ জেঃ ইব্রাহিম জানান, বহু ক্ষুদ্রও দরিদ্র দেশ যাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেকটা বাংলাদেশের মতো তারাও অনেক কার্যকর প্রতিরক্ষা মতবাদ প্রণয়ন করেছে হুমকির খাতসমূহকে সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করে। ঠিক একইভাবে আমাদের দেশেও একটি প্রতিরক্ষা মতবাদ প্রণয়ন করা যেতে পারে। তবে তাঁর মতে, প্রতিরক্ষা মতবাদ বা Defencs Policy -র চেয়ে নিরাপত্তা মতবাদ বা Security Policy -র ব্যাপারে আমাদের অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। কারণ, তিনি মনে করেন, প্রতিরক্ষা শব্দটির সাথে ঐতিহ্যগতভাবে শুধু আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্সের নাম জড়িয়ে গেছে। কিন্তু নিরাপত্তা ধারণার সাথে প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গ ছাড়াও আরও অনেক বিষয় জড়িত রয়েছে যা একটি দেশ বা জাতিকে রক্ষার পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিতে পারে। কারণ, প্রতিরক্ষাবাহিনী হচ্ছে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার সর্বশেষ মাধ্যম। এরপূর্বে রয়েছে পররাষ্ট্রনীতি, নিকট ও দূরের প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক, জনগণের মনোবল, বাণিজ্য নীতিমালা, অর্থনৈতিক অবস্থানসহ আরও বহু অনুষঙ্গ যেগুলো একত্রে একটি দেশের সার্বিক নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলে। অথচ আমাদের দেশে তা করা হয়নি বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, আজ আমরা অর্থনৈতিক আগ্রাসনের শিকার হলেও নীতিমালার অভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছি না। এখন যদি একারণে সব কলকারখানা লোকসান দেয়, লাখ লাখ লোক বেকার হয়ে যায় তাহলে অর্থের যোগান আসবে কোথেকে? এবং তাঁর প্রশ্ন যদি অর্থ না থাকে তাহলে প্রতিরক্ষা বাহিনী চলবে কি দিয়ে? এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ ও একটি পরিবারের উদাহরণ দিয়ে মেঃ জেঃ ইব্রাহিম বলেন, একজন নবপরিণীতা স্ত্রীর কাছে নিরাপত্তা হলো তার স্বামী, একটি শিশুর কাছে নিরাপত্তা হলো তার মা। পরবর্তীকালে হয়তো এই পরিবারটি আরও বেশি নিরাপদে থাকার জন্য একটি বাড়ী করতে চায়, গাড়ী কিনতে চায়। ঠিক একইভাবে নিরাপত্তা ধারণা সময়ানুযায়ী পরিবর্তিত হয়ে থাকে। পরিবারের ক্ষেত্রে যেমন নিরাপত্তার আঙ্গিক হলো আমি যাতে বেঁচে থাকতে পারি, সম্মানের সাথে বেঁচে থাকতে পারি ও বেঁচে থাকার স্থানটি যেন অন্তত থাকে তেমনি একটি দেশের ক্ষেত্রেও তিনি মনে করেন, নিরাপত্তা মতবাদ এমনভাবে প্রণীত হতে হবে যাতে এটি উপযুক্ত পররাষ্ট্রনীতি, কার্যকর অর্থনৈতিক নীতিমালা ও জনগণের মনোবল বা জনমত দ্বারা সমর্থিত হয়। এবং এভাবে একটি উপযোগী মতবাদ প্রণয়ন করা সম্ভব হলে যে কোন পর্যায়ে, যে কোন দেশ থেকে আসা হুমকিকে এদেশের জনগণ প্রতিহত করতে পারবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

এদিকে বাংলাদেশের সম্ভাব্য শুত্রু ও হুমকির খাতসমূহ বিবেচনায় মেঃ জেঃ ইব্রাহিম নির্দিষ্ট করে কোন দেশের নাম বললেও একথা বলতে দ্বিধা করেননি যে, ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার প্রায় তিন চতুর্থাংশ ভারত দ্বারা



www.nagorikpathagar.org

পরিবেষ্টিত। আর দক্ষিণ-পূর্বে দু'শ মাইলের মতো সীমানা রয়েছে মায়ানমারের সাথে। এ দুটোই আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। পাড়া, মহল্লার যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, ঝগড়াঝাটি হয় তা প্রতিবেশীর সাথেই হয়ে থাকে এ মত ব্যক্ত করে তিনি বলেন, যদি কারও সাথে আমাদের ঝগড়াবিবাদ বা সশস্ত্র বৈরীতার সৃষ্টি হয় তাহলে তা সঙ্গতকারণেই হবে নিকটতম প্রতিবেশীর সাথে। এ ক্ষেত্রে তিনি বলতে চান যে, ভারত সবসময় একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু তিনি এও মনে করেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানই বলে দেয়, যদি কোনদিন কোন বিষয়ে কারও সাথে বৈরীতার সৃষ্টি হয় তাহলে তা হওয়ার সম্ভাবনা ভারতের সাথেই বেশি। এবং এ ধরনের বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার মতো উপাত্তের কোন কমতি তাঁর দৃষ্টিতে নেয়। আজ ভারত সেদেশে এক কোটি বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের অভিযোগ করছে, নদীর উৎসমূখে বাঁধ দিয়ে পানি প্রবাহে সৃষ্টি করেছে বাধা। আবার ভারত মনে করতে পারে আমরা তাদের স্বার্থহানি ঘটাচ্ছি। এধরনের হাজারো কারণ উভয়ের মধ্যে মতপার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে যুদ্ধের আকারও নিতে পারে বলে মেঃ জেঃ ইব্রাহিমের অভিমত। এছাড়া আমাদের দ্বিতীয় প্রতিবেশী মায়ানমারের পক্ষ থেকেও শারীরিক আগ্রাসনের সম্ভাবনা তিনি উড়িয়ে দেননি। বরং এ ব্যাপারে তিনি উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন ১৯৯১ সালে রেজুপাড়া বিওনি নিয়ে মায়ানমারের সাথে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ঘটনাকে। একই সাথে সীমান্ত সংশ্লিষ্টতা না থাকার অন্য কোন দেশ যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ আক্রমণের সম্ভাবনা অনেক কম বলে উল্লেখ করেন। ঠিক একই যুক্তিতে পাকিস্তানেরও এদেশে ফিজিক্যালী আগ্রাসন চালানো ক্ষমতা নেই বলে তাঁর অভিমত। তবে বাংলাদেশে অনেকে স্বাধীনতার মুল শুক্র হিসেবে এখনো পাকিস্তানকে চিহ্নিত করেন এটা কতটুকু বাস্তবসম্মত সে ব্যাপারে তাঁর মত জানতে চাইলে তিনি বলেন, ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ, উথাপিত লাহোর প্রস্তাব যদি আক্ষরিত অর্থে বাস্তবায়ন করা হতো তাহলে তো আমরা তখনি পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পেতাম আজকের বাংলাদেশকে। তাই তাঁর প্রশ্ন, দীঘ ৩০ বছর স্বাধীন বাংলাদেশে বসবাস করে এখনো কেউ কেউ পাকিস্তানের চিন্তা করছেন কেন? অবশ্য তাই বলে পাকিস্তানের পক্ষে এদেশে আক্রমণ চালানো বা পাকিস্তানই আমাদের মূল শুক্র একথা মানতে তিনি মোটেই রাজি নন। বরং ভারত মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করলেও আর কতদিন তাদের কাছে আমাদের নতজানু হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে, ভারতপ্রেমীদের কাছে সে প্রশ্নই তিনি করেছেন। এ কারণেই তিনি মনে করেন, বাংলাদেশে আইএসআই-এর এজেন্ট থাকার প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক না হলেও ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর এজেন্টই সবচেয়ে বেশী। শত্রুমিত্র নির্ধারণ ও আগ্রাসন প্রসঙ্গে মেঃ জেঃ ইব্রাহিম তাই নির্দ্বিধায় সান্নিধ্যকে আক্রমণের মূলনীতি বিবেচনায় ভারতের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।



www.nagorikpathagar.org

এ পর্যায়ে যে কোন আগ্রাসন থেকে আত্মরক্ষার প্রশ্নে লিখিত প্রতিরক্ষানীতি প্রয়োজন কিনা জানতে চাইলে তিনি বাংলাদেশে আঠাশ বছর চাকরি জীবনের মূল্যায়ন করে বলেন, লিখিত নীতিমালা ছাড়াই যখন এতোদিন চালানো গেছে তাহলে আর লিখিত নীতিমালার প্রয়োজন কি? এছাড়া এই দীর্ঘ সময়ে সশস্ত্রবাহিনীর অগ্রগতিও এজন্য বাধাগ্রস্ত হয়নি। তবে লিখিত একটি নীতিমালা থাকলে সশস্ত্রবাহিনীর ক্রমবিকাশ ও উন্নয়ন অনেক সুসংহত হতো বলে তিনি স্বীকার করেছেন। তাহলে এতোদিন প্রতিরক্ষানীতি লিখিত আকারে প্রণয়ন করা হয়নি কেন এ প্রশ্নের উত্তর তিনি বলেন, লিখিত আকারে নীতিমালা প্রণয়ন অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। এক্ষেত্রে কাউকে না কাউকে দায়িত্ব নিতে হতো স্বাক্ষর দিতে হতো, বলতে হতো শত্রুকে, আক্রমণ আসবে কোত্থেকে? কিন্তু এ যাবৎ সে সৎসাহস হয়তো কারও হয়নি।

সীমান্ত সংস্পর্শ থাকায় যে প্রতিবেশীর সাথে বৈরীতার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেই ভারত সম্প্রতি তার প্রতিরক্ষা বাজেট ২৮% বৃদ্ধি করার প্রেক্ষিত্রে বাংলাদেশের কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত সে ব্যাপারেও মেঃ জেঃ ইব্রাহিমের রয়েছে অভিমত। এ প্রসঙ্গে তাঁর মত হচ্ছে বাহ্যত ভারত প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়িয়েছে পাকিস্তানের সাথে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের দিকে লক্ষ্য রেখে। বিশেষ করে কারগিল সঙ্কট বাধ্য করেছে ভারতকে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে। এছাড়া ভারতের রয়েছে চীনের মতো মহাপরাক্রমশালী প্রতিপক্ষ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রসঙ্গ হয়তো আসবে আরও পরে। তবে যায় শক্তি আছে সে যেমন শক্তি প্রয়োগ করে একটা শক্ত লাঠি ভাঙতে পারে তেমনি তার কাছে একটা সে যেমন শক্তি প্রয়োগ করে একটা শক্ত লাঠি ভাঙতে পারে তেমনি তার কাছে একটা পাটখড়ি ভাঙ্গা কোন ব্যাপারই নয়। তাই এ নিয়ে কিছুটা হলেও শংকিত হওয়ার কারণ আছে। কিন্তু তাই বলে ভারতের অর্থনীতি ২৮% প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধিকে সাপোর্ট করতে পারলেও আমাদের একই হারে বাজেট বৃদ্ধি হয়তো সম্ভব নয়। বরং আমাদের অর্থনীতি যতটুকু ভার বহন করতে পারে তা হিসেবে রেখেই বাজেট প্রণয়ন করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। এব্যাপারে তিনি সিস্টেম লসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, ভারতে সিস্টেম লস আমাদের চেয়ে কম। যা এদেশে মাত্রারিক্ত। কিন্তু কেউ সিস্টেম লস কমানোর দিকে নজর না দিয়ে একতরফাভাবে প্রতিরক্ষা বাজেট হ্রাস করার বিপক্ষে যুক্তি দিয়ে তিনি উল্টো জানাতে চান, যার শরীরে মেদ,ভুঁড়ি আছে তার অতিরিক্ত চর্বি কমানোর কথা বলা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু যার শরীরে ঠিকমতো মাংসই নেই তাকে কিভাবে আরও চিকন হওয়ার উপদেশ দেয়া যায়? তাই তিনি বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর বাজেট হ্রাস করার যে কোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমাদের নিজ অর্থনীতি থেকে বাজেট বৃদ্ধি হয়তো আপাতত সম্ভব নয়। কিন্তু বন্ধুপ্রতিম দেশের কাছ থেকে ২০/৩০ বছরের কিস্তিতে আমরা যেমন সমরাস্ত্র সংগ্রহ করতে পারি তেমনি বন্ধু দেশের সহায়তায় সমরাস্ত্র করখানা স্থাপন করে উৎপাদিত পণ্য দেশের কাজে লাগানো ছাড়াও বিদেশে রফতানির উদ্যোগ নেয়া যায়। তবে যদি প্রতিরক্ষা খাতে আদৌ কোন অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়ার সুযোগ হয় তাহলে তার মতে. সেই অর্থ দিয়ে



www.nagorikpathagar.org

বিমান আক্রমণ প্রতিরক্ষার জন্য শক্তিশালী এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম গড়ে তোলা প্রয়োজন। কারণ, এখনো আমাদের এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম অত্যন্ত দুর্বল । তাই মেঃ জেঃ ইব্রাহিম মনে করেন সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনীও সীমিত পরিসরে নৌ-বাহিনীর সমন্বয়ে একটি পৃথক এয়ার ডিফেন্স কমান্ড গড়ে তোলা যেতে পারে।

এদিকে বিশ্বের চতুর্থ বৃহৎ সশস্ত্রবাহিনীর অধিকারী ভারতের সাথে যুদ্ধ করার প্রশ্ন ন থাকায় বাংলাদেশে সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজন নেই একটি চিহ্নিত মহল কর্তৃক এ ধরনের প্রচরণার ব্যাপারে অভিমত জানতে চাইলে মেঃ জেঃ ইব্রাহিম অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলেন, মুক্তিযুদ্ধ করেছি দেশ আক্রান্ত হলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার জন্য নয়। আর যারা সশস্ত্রবাহিনী বিলুপ্ত করার কথা বলেন তারা মনে করেন, ভারতের ভেতর বাংলাদেশ লীন হয়ে গেলে ভাল হয়। তাই তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এসব কথিত বুদ্ধিজীবীর সাথে একমত হতে পারছেন না বলে জানান। এবং একমত হতে না পারার জন্য কোন দুঃখবোধও তার নেই। তার মতে সশস্ত্রবাহিনী অবশ্যই থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ভারতের জনসংখ্যানুপাতে সশস্ত্রবাহিনী যে আকারের সেরূপ বাংলাদেশে জনসংখ্যানুপাতে বড় সশস্ত্রবাহিনীর প্রয়োজন হলেও নিরাপত্তা রক্ষার যতোটুকু প্রয়োজন ঠিক সে আকারের একটি সশস্ত্রবাহিনী অবশ্যই আমাদের থাকবে। তবে বাংলাদেশের মতো ছোট দেশে শুধুমাত্র সশস্ত্রবাহিনী থাকলেই চলবে না,পাশাপাশি এর সহায়তার জন্য নাগরিক সমাজকেও প্রস্তুত থাকতে হবে বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া তিনি এ অভিমত, দিয়েছেন যে, একটি শক্তিশালী, সুপ্রশিক্ষিত, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সশস্ত্রবাহিনী আকারে ছোট হলেও ক্ষতি নেই যদি একে প্রয়োজনে রাবারের মতো টেনে বড় করা যায়। এ ব্যাপারে তার পরামর্শ হচ্ছে যদি সশস্ত্রবাহিনী থেকে অবসর নেয়া সদস্যদের রিজার্ভ লিস্টে রাখা যায় ও গড়ে তোলা যায় শক্তিশালী আনসার ভিডিপি বাহিনী তাহলে জরুরী অবস্থায় খুব কম সময়ে বিশাল প্রতিরক্ষা বাহিনীকে দাঁড় করিয়ে দেয়া যায় শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধে। এভাবে শহীদ জিয়াউর রহমানের প্রণীত পরিকল্পনানুযায়ী এক কোটি আনসার, ভিডিপিবাহিনী গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি জানিয়েছেন অবগত সিটিজেন আর্মি কনসেপ্টে না গিয়ে আমাদের বরং এ ধরনের সেকেন্ড লাইন ফোর্স গঠনে জোর দেয়া উচিত। কারণ, তার বিশ্লেষণ অনুযায়ী সিটিজেন বা উৎপাদনশীল আর্মি কনসেপ্ট থিয়োরিটিক্যালি ভাল শোনালেও বাস্তবে পৃথিবীর কোথাও আজ এ ধারণা প্রয়োগ করা হয় না। এমনকি বিশ্বের কোন সামরিক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এ ধরনের কোন কনসেপ্ট পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়া আর্মিকে যারা কষিকাজসহ কথিত উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করতে চান তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আর্মি দিয়ে যদি একবার ব্যবসা করানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে সেটি আর ফাইটিং আর্মি থাকবে না হবে বেনিয়া আর্মি। তবে সশস্ত্রবাহিনীকে জাতীয় প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ সময় গণশিক্ষা জনস্বাস্থ্যসেবা, স্কুলঘর নির্মাণ ইত্যাদি সেবামূলক কাজে নিয়োজিত করার কোন নেতিবাচক দিক নেই বলে তিনি বলেছেন।



www.nagorikpathagar.org

## ৬ . পার্বত্য চট্টগ্রাম

# পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল

মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইব্রাহিম। ১৯৭১ সালে ২৭ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩ নম্বর সেক্টরে মেজর শফিউল্লাহর (পরবর্তীকালে সেনা বাহিনীর প্রধান) অধীনে যুদ্ধ করে বীরপ্রতীক উপাধি পেয়েছিলেন। চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানাধীন বুড়িশ্চরে জন্ম এই বীর সন্তানের। তার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে এই চট্টগ্রামে। ১৯৬৮ সালে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে কুমিল্লা বোর্ডের অধীনে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে দেড় বছর পড়ালেখা করেন সেখানে। ১৯৭০ সালে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে 'সোর্ড অব অনার' তুল্য কমান্ডার ইন চীফ'স কেইন পেয়েছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে এই দুর্লভ সম্মান অর্জন করেছেন মাত্র ৪ জন বাঙালি। সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার পর তিনি ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অনেক ঘটনার সাক্ষী তিনি। ১৯৯৬ সালের ২০ মে'র এক ঘটনায় তাঁকে চাকরিচ্যুত করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ হয় তাঁর সঙ্গে। পাঠকদের কাছে তা তুলে ধরা হলো ঃ

**প্রশ্ন : পার্বত্য চট্টগ্রামের সেনাবাহিনী তথা নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন সঠিক ছিল বলে মনে করেন।**

জেনারেল ইবরাহিম : সেখানকার বিরাজমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।

**প্রশ্ন : বিগত সময়ে সেনাবাহিনী সেখানকার মানুষের ওপর অত্যাচার করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তা কতটুকু সত্য?**

জেনারেল ইব্রাহিম : অতীতে এ ধরনের ভুলভ্রান্তি হতে পারে। পরে তা কর্তৃপক্ষের নজরে আসা মাত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

**প্রশ্ন : শাস্তি পেয়েছে এমন সদস্য সংখ্যা কত?**

জেনারেল ইবরাহিম : সেনা, বিডিআর ও পুলিশ মিলে তিন শতাধিক হবে।

**প্রশ্ন : কতজন সেনা সদস্য শান্তি বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে?**



www.nagorikpathagar.org

জেনারেল ইব্রাহিম : সঠিক তথ্য মনে নেই। তবে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য নিহত হয়েছে এক হাজারের নিচে।

প্রশ্ন : তাহলে তো নিরাপত্তা বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক।

জেনারেল ইবরাহিম ঃ দায়িত্ব পালনে এ ধরনের ক্ষতি অস্বাভাবিক কিছু নয়।

প্রশ্ন : শান্তি বাহিনীর সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের শান্তি স্থাপন প্রক্রিয়ায় আপনার সংশ্লিষ্টতা কতটুকু।

জেনারেল ইবরাহিম : দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা অফিসার হিসেবে ১৯৮৭ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত ৩ বছর প্রত্যক্ষভাবে এবং পরের তিন বছর পরোক্ষভাবে আমি গঠনমূলক ভূমিকা পালন করি।

প্রশ্ন : শান্তি বাহিনীর সঙ্গে বিগত সরকারগুলোর আলোচনার ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার এই চুক্তি সম্পাদন করেছে বলে আপনি মনে করেন?

জেনারেল ইবরাহিম : আওয়ামী লীগ বলেছে তারা বিগত সরকারগুলোর আলোচনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চুক্তি সম্পাদন করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। ফলে বিগত বিএনপি সরকার শান্তি বাহিনীর সঙ্গে আলোচনা করে কতটুকু অগ্রসর হয়েছিল তার কোনো প্রতিবেদন আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে হস্তান্তর করেছে বলে আমি শুনিনি।

প্রশ্ন : চুক্তির ফলে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা কতটুকু?

জেনারেল ইবরাহিম : চুক্তির দুর্বল দিক কাটিয়ে ওঠার শর্তসাপেক্ষে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সরকার আন্তরিক ও কঠোরভাবে তা বাস্তবায়ন করতে পারলে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল। তা না হলে অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকবে পার্বত্য চট্টগ্রামে।

প্রশ্ন : আপনি বললেন চুক্তির দুর্বল দিকের কথা। কোনগুলো দুর্বল দিক?

জেনারেল ইবরাহিম ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালিদের প্রতি প্রকাশ্য আইনগত কোনো বাধা নেই। তথাপি চুক্তি বাস্তবায়নের সময় এমন প্রতিকূল পরবেশ সৃষ্টি হতে পারে, যে কারণে বাঙালিদের পার্বত্য চট্টগ্রাম ত্যাগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব চুক্তির ধারাগুলো আরো সুস্পষ্ট করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্তে সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার ভূমিকা অস্পষ্ট। তৃতীয়ত, বাঙালি ও পাহাড়িদের মধ্যে কট্টরপন্থী গ্রুপ রয়েছে যারা চুক্তি মানে না। কট্টরপন্থীদের নিবৃত্ত করার নিমিত্তে সরকার ও জনসংহতি সমিতির ভবিষ্যৎ ভূমিকা অস্পষ্ট।

প্রশ্ন : এবার অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে চাই। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন কখন, বীরত্বের জন্য কোনো খেতাব পেয়েছেন কি?

জেনারেল ইবরাহিম : ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পূর্ণকাল আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি, সরকার আমার সাহসিকতার জন্য বীরপ্রতীক উপাধি দিয়েছিলেন।



www.nagorikpathagar.org

প্রশ্ন : আমরা জানি ১৯৮১ সালে জেনারেল জিয়াকে হত্যা করার পর আপনি আসামি পক্ষের উকিল ছিলেন এবং আপনার ভায়রা একই কোর্ট মার্শাল-এর বিচারক। ঐ সময় জিয়া হত্যাকাণ্ডের বিচার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। এই অভিযোগ কতটুকু সত্য?

জেনারেল ইবরাহিম : আমারও দৃঢ় বিশ্বাস এই বিচার প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ ছিল। তবে ঐ সময় পরিবেশটা আসামি পক্ষের জন্য বৈরি ছিল।

প্রশ্ন : তখন কি কিছু করার ছিল না?

জেনারেল ইবরাহিম : আইনের বিধনমতে ঐ আদালতেই আমরা প্রতিবাদ উপস্থাপন করেছিলাম।

প্রশ্ন : ১৯৯৬ সালে সেনাবাহিনীতে কী ঘটেছিল? কেন আপনাকে চাকরিচ্যুত করা হলো?

জেনারেল ইবরাহিম : ১৯৯৬ সালের ২০ মে ঘটনার ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। তদন্ত পরিচালিত হয়েছে সেনাবাহিনীর আইনের ধারা লঙ্ঘন করে। এ ক্ষেত্রে আমি আইনের আশ্রয় পাইনি। তদন্তের ফলাফল পূর্বনির্ধারিত ছিল বলে আমার কাছে বিভিন্নভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

প্রশ্ন : এরূপ অনিয়ম হলে তার কী কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থা নেই।

জেনারেল ইবরাহিম : সেনাবাহিনী এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেটি নিজের আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। এ রূপ প্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ যদি আইনের বিধান লঙ্ঘন করেন তাহলে সেটা প্রতিকারের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা অস্পষ্ট। 'স্পর্শকাত'র এই অজুহাত দেখিয়ে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের ব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ আছে।

প্রশ্ন : আপনি বললেন এরূপ ব্যবস্থায় সেনাবাহিনীর আইনের বিধান লঙ্ঘিত হলে তা প্রতিকারের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা অস্পষ্ট। যদি সর্বোচ্চ আদালত এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিতে পারে তাহলে আপনারা সেখানে যাননি কেন?

জেনারেল ইবরাহিম : আমি নিয়ম মোতাবেক পদক্ষেপ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত করেছি। যেহেতু তিনি সরকার প্রধান। ১২ মাস অপেক্ষা করে আবার রিমাইন্ডার দিয়েছি প্রধানমন্ত্রীর কাছে। সেখানে কোনো উত্তর বা প্রতিকার না পেলে রাষ্ট্রপতির কাছে দরখাস্ত করবো। সেখানেও যদি কোনো প্রতিকার না পাই তাহলে আদালতে যাবো।

প্রশ্ন : ঐ ঘটনায় ১৫ জন সেনা কর্মকর্তার ওপর অবিচার করা হয়েছে। আপনারা কি সবাই প্রতিকারের জন্য আবেদন করেছেন?

জেনারেল ইবরাহিম ঃ হ্যাঁ।



www.nagorikpathagar.org

প্রশ্ন : এভাবে চলতে থাকলে তো সেনাবাহিনীর 'চেইন অব কমান্ড' ব্যাহত হতে পারে। এর কি কোনো স্থায়ী প্রতিকার নেই?

জেনারেল ইবরাহিম : গত ২৪ মাসের ঘটনাবলিতে চিন্তিত হওয়ার অবকাশ আছে। একমাত্র প্রতিকার রাজনৈতিক বিবেচনা বিবর্জিত পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের বিধান মোতাবেক সেনাবাহিনী পরিচালনা করা।

প্রশ্ন : আমরা জানি আপনার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায়। বন্দর সম্পর্কে আপনি অনেক কিছু জানেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর বারবার অচল হওয়ার কারণ কি?

জেনারেল ইবরাহিম : চট্টগ্রাম বন্দরে কিছু বিতর্কিত গোষ্ঠী তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করছে। সেখানে প্রাধান্য পাচ্ছে না জাতীয় স্বার্থ। এ কারণে বার বার বন্দরে সঙ্কট সৃষ্টি হচ্ছে।

চট্টগ্রাম বন্দর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের হৃদপিন্ড। বন্দরকে সচল রাখতে দেশের সকল নাগরিক ও রাজনৈতিক দলের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন : আপনি চট্টগ্রামের সন্তান। এ অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নিয়ে কি ভাবছেন?

জেনারেল ইবরাহিম : যেকোনো দেশের অর্থনৈতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, শিল্পায়ন ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি প্রয়োগ করা হয়নি। এ ধরনের শর্তগুলো মেনে চলা হলে চট্টগ্রাম হতো বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ড। বর্তমানেও চট্টগ্রামের ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলে তেল ও গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। এ ধরনের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো উচিত।

দৈনিক পূর্বকোণ ১৩/০৩/১৯৯৮



www.nagorikpathagar.org

# পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি তাই দিনে দিনে এর সমাধান সম্ভব নয়

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি, ৪০ বছরে তা দানা বেঁধেছে। তাই দিনে দিনে এর সমাধান সম্ভব নয়। দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করলে আরও নতুন করে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এই অভিমত মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম বীরপ্রতীক-এর। দৈনিক 'পূর্বকোণ'কে সম্প্রতি দেয়া বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি আরও বলেন, সমতলের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এবং পার্বত্য অঞ্চলের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী উভয়পক্ষের মধ্যে অনুধাবনের সমস্যাটিই হল মৌলিক সমস্যা। এখানে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই প্রথমে এ সম্পর্কে জাতিকে অনুধাবন করতে হবে এবং বুঝতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে চেষ্টা চালাতে হবে ক্রমান্বয়ে। জেনারেল ইবরাহিম ১৯৮৭ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৮৯ সালের ২৭ জুন পর্যন্ত সেনাবাহিনীর ২৫ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিও, রাঙ্গামাটি ৩০৫ পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার ও খাগড়াছড়ি ২০৩ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে ১৯৮৭ সালেও তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে সপ্তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এই সময়টাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বাহিনীর তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। চাকরির সুবাদে জেনারেল ইব্রাহিমকে দুর্যোগময় অবস্থার সাথে সামগ্রিকভাবে যুদ্ধ করেই চলতে হয়েছে। একই সাথে একজন পেশাদার সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করার কারণে তার পক্ষে সেনাবাহিনী ও শান্তি বাহিনীর কর্মকাণ্ডের সাথে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হওয়ার সহজ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। সঙ্গতকারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত তার বক্তব্য অত্যন্ত নির্ভরশীল এবং তথ্যসমৃদ্ধ। এ বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনারে প্রদত্ত বক্তব্য পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধ এবং সর্বশেষ তার লেখা 'পার্বত্য চট্টগ্রাম : শান্তি প্রক্রিয়া ও পরিবেশ-পরিস্থিতির মূল্যায়ন' গ্রন্থের কারণে জেনারেল ইবরাহিম ইতোমধ্যে একজন বিশেষজ্ঞ (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে) ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। হংকং থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিকী ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিউ-এর ভাষায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘটনাবহুল ইতিহাসের বহু অজানা তথ্য, খণ্ড চিত্র ও মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে বইটিতে।

১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পরও ওই অঞ্চলে ইনসারজেন্সি পুরোপুরিভাবে বন্ধ হয়নি। শান্তি বাহিনীর একটি বিরাট অংশ শান্তিচুক্তির সমর্থনে অস্ত্র সমর্পণ করলেও সেখানে নতুন



www.nagorikpathagar.org

করে গজিয়ে ওঠে অন্য একটি সশস্ত্র সংগঠন। মূলত শান্তিচুক্তি বিরোধী ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এ সশস্ত্র সংগঠন গঠন করে এলাকায় নতুন করে বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা শুরু করেছে বলে ব্যাপকভিত্তিক জনশ্রুতি রয়েছে। ইতোমধ্যে এ সংগঠনের ক্যাডাররা শতাধিক লোককে খুন, অপহরণের মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায় এবং কখনো কখনো শান্তিচুক্তি সমর্থকদের সাথে সশস্ত্র সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পার্বত্য শান্তিচুক্তির মূল্যায়ন করে তিনি বলেন, বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব দাবিকারী একটি সশস্ত্র গোপন রাজনৈতিক দলের সাথে দেশের নির্বাচিত সরকারের এ চুক্তি। বাস্তবে এ ধরনের অবস্থায় অন্তত বিশ্বের ৫০টি দেশের সরকারের সাথে এ জাতীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।

বিরোধীদল, স্থানীয় বাঙালি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের মধ্যে এ চুক্তি নিয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। বিরোধী দল বলেছে, দেশের স্বার্থ বিরোধী চুক্তি, বাঙালিরা তাদের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়া হয়েছে বলে এবং উপজাতীয়দেরও একাংশ পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর স্বার্থের পরিপন্থী চুক্তি হিসেবে মন্তব্য করেছে। এ বিষয়ে তিনি বলেন, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করার তথ্য সংবিধান বহির্ভূত নয়। কিন্তু তাদেরকে কি ক্ষমতা দেয়া হল, সকল জনগোষ্ঠীর জন্যে এটা উপকারী কিনা সেটিই বিবেচ্য বিষয়। ১৯৯৭ সালের চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বাঙালি জনগোষ্ঠীর বিষয়টি পরবর্তী আইনগুলোতে বস্তুনিষ্ঠ সঠিক চিকিৎসা পায়নি। সেখানে বাঙালিদের বিষয়টি অতীব স্পর্শকাতর ও নাজুক। তারপরও প্রকাশ্য আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি সন্তু লারমা প্রায় সময় বলে আসছেন অলিখিত চুক্তির কথা। বাঙালিদের বিষয়ে সরকারের সাথে যদি কোন অলিখিত চুক্তি হয় তা হবে স্বচ্ছতার অভাব। আর যদি লিখিত হয়ে থাকে তা হচ্ছে স্পষ্টতার অভাব।

বতর্মান পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিচুক্তি বিরোধী সংগঠনগুলোর বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতার সাথে জনসংহতি সমিতির পরোক্ষ সমর্থন রয়েছে বলে অনেকে অভিযোগ করেন। তারা তো চুক্তির শর্তানুসারে এখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। প্রয়োজনে জাতীয় রাজনীতির স্রোতধারায় তারা আন্দোলন করতে পারেন। ইতোমধ্যে সন্তু লারমাও সশস্ত্র সংগ্রামে ফিরে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মেজর জেনারেল (অবঃ) ইব্রাহিম বলেন, শান্তি চুক্তি সম্পাদন ইন্সারজেন্টদের আন্দোলনের একটি কৌশল। তখন পুরো আন্দোলনটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পরবর্তী প্রজন্মের হাতে পরিচালিত হয়। এ ক্ষেত্রে সন্তু বাবুর সক্রিয়তা না থাকলেও তার ধ্যান-ধারণা জড়িত রয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সীমান্তের বাইরের সাহায্য এবং সহযোগিতা স্বাভাবিকভাবে থাকে।

ইন্সারজেন্সির মতো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সামরিক অভিযান কতটুকু যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন? এ প্রশ্নের উত্তরে সাবেক সেনা কর্মকর্তা বলেন, আনুষ্ঠানিকভাবে



www.nagorikpathagar.org

ইন্সারজেন্সির সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। তবে এতটুকু বলা যায় : এটি একটি নতুন বা ভিন্নধর্মী সমাজ বা রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি দল বা জনগোষ্ঠী কর্তৃক একটি প্রতিষ্ঠিত সরকার কিংবা একটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সশস্ত্র সমন্বিত পদক্ষেপ বা সংগ্রাম। দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার ভিতরে কোন অঞ্চলে যখন ইন্সারজেন্সি চালু হয় তখন প্রতিষ্ঠিত প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সরকার এবং সমর্থিত জনতার কাছে যে কর্মকাণ্ড সন্ত্রাসী, হিংসাত্মক, জঙ্গী, বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে অভিহিত হয়, ইন্সার্জেন্ট ও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল জনগোষ্ঠীর কাছে তা মুক্তির সংগ্রাম, স্বাধিকারের সংগ্রাম, স্বাধীনতা সংগ্রামের নামান্তর। তাদের বিরুদ্ধে সরকার কিংবা কর্তৃপক্ষীয় পদক্ষেপগুলো আধিপত্যবাদী, দমনমূলক, নিপীড়নমূলক, নির্যাতনমূলক, হয়রানিমূলক এবং যুগপৎ মারণাত্মক কার্যকলাপ হিসেবে নিন্দনীয়। এ ক্ষেত্রে ইন্সারজেন্সি আক্রান্ত অঞ্চলের চারপাশে বিদ্যমান ভৌগোলিক বা আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব অবশ্যই পড়ে এবং তার মূল্যায়ন করা দরকার। তাই শুধুমাত্র সামরিক অভিযান চালিয়ে এ ধরনের সমস্যার শতভাগ সমাধান করা যায় না। রাজনৈতিক আঙ্গিক থেকে প্রাধান্য দিতে হয়। কারণ, রাজনীতি মানুষের মনকে জয় করতে পারে। তবে পাশাপাশি সামরিক ও আর্থিক সহায়তাও দিতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষেত্রে বলা যায় ঃ তারা আমাদের দেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি অংশ। নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের ভিত্তিতে তাদেরকে বাঙালি হতে বাধ্য করা ঠিক হবে না।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি নিয়ে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটি ক্ষোভ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে। তারা সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার চায়। একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা হিসেবে এখন আপনি কি ভাবেন?

তিনি বলেন, বিচ্ছিন্ন দু'একটি অতিরঞ্জন করে প্রকাশ পাওয়া ঘটনার কারণে সেখানকার পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর একাংশের মনে ক্ষোভ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু সেনাবাহিনী সেখানে সব সময় খারাপ কিছু করেছে, যে কারণে তাদের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হতে পারে– এমন ধারণা অমূলক। জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় সেখানে সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সেনাবাহিনীর সমন্বিত প্রচেষ্টা এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নে গতিসঞ্চার করেছে। তিনি বলেন, শান্তি প্রক্রিয়াও শুরু করেছিল সেনাবাহিনী। বলতে গেলে তাদের আত্মত্যাগের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকের শান্তিচুক্তি। তাছাড়া, দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার অভ্যন্তরে সেনাবাহিনী থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় বিশেষ করে যতদিন সেখানে সশস্ত্র তৎপরতা থাকবে ততদিন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনী অবস্থান করবে, প্রত্যাহারের প্রশ্নই ওঠে না। সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হলে সেখানে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেবে। একজনের মাথা অন্যজনে খাবে।



www.nagorikpathagar.org

খ্রিষ্টান মিশনারি তৎপরতা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে করেন কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে লাগোয়া ভারতীয় এবং মায়ানমারের প্রদেশগুলোতে বহু বছর ধরে রক্তক্ষয়ী ইন্সার্জেন্সি ও কাউন্টার ইন্সার্জেন্সি পরিস্থিতি বিদ্যমান। এই অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক মিল রয়েছে। এ সকল অঞ্চলের ঘটনা ও রাজনৈতিক আবহাওয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মনমানসিকতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মকাণ্ডের ওপর অতি সঙ্গত যুক্তিতেই প্রভাব ফেলেছে। উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগোষ্ঠীর মধ্যে উন্নতির লক্ষ্যে গত একশত বছরে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রসার আধুনিকায়নের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। বর্তমান উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি প্রদেশের মধ্যে ৫টি যথা ঃ মেঘালয় প্রদেশ, নাগাল্যান্ড প্রদেশ, মনিপুর প্রদেশ, মিজোরাম প্রদেশ এবং অরুণাচল প্রদেশ নিজেদের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে বেছে নিয়েছে। এতে করে আধুনিকায়ন ও উন্নতির পথে তারা বাকি ভারত থেকে অনেক দূর এগিয়ে যায়। চল্লিশের দশকে আসামের তৎকালীন লেঃ গভর্নর রেইনাল্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের কর্ণফুলি অববাহিকার পূর্বতীর আর সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রদেশগুলোর (আংশিক) সমন্বয়ে একটি খ্রিষ্টান মিশনারি রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোন সমর্থন মিলেনি। অবশ্য মিশনারিরা তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখেন ওইসব অঞ্চলে। তবে ভারতের তুলনায় তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকভিত্তিক ইতিবাচক কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। বিশেষ করে চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরাদের ক্ষেত্রে তারা পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়। বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান সশস্ত্র আন্দোলনের নেতৃত্বেও রয়েছে মূলত এই তিন সম্প্রদায়ের লোকজন। অতএব, মিশনারি তৎপরতা বিদ্যমান আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে বলে মনে করতে পারি না।

জেনারেল ইব্রাহিম পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান পরিস্থিতির মূল্যায়ন করেন এভাবে : চট্টগ্রাম বন্দরসহ চট্টগ্রামের ভৌগোলিক ও ভূ-কৌশলগত নিরাপত্তার জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আমাদের অপরিহার্য। এখন পার্বত্য চট্টগ্রাম যে আয়তনের তার থেকে কম আয়তন নিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ পৃথিবীতে রয়েছে। সুতরাং শুধু আয়তনের কারণে বলা যাবে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিচ্ছিন্ন দেশ হয়ে বাঁচতে পারবে কি পারবে না। তবে, উত্তর-পূর্ব ভারতকে যদি আমরা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দেশ মনে করি, তাহলে সেটি যে রকম ভূ-বেষ্টিত (ল্যান্ড-লক্‌ড), অনুরূপ পার্বত্য চট্টগ্রামও ভূ-বেষ্টিত হয়ে পড়বে। ভূ-বেষ্টিত হওয়ার কষ্ট লুকানোর কিছু না। গত দু'বছর যাবৎ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের জন্যে সুযোগ দাবি করে আসছেন। এই প্রদেশসমূহ বাংলাদেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে আগ্রহী। ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা দেশ হবে সেই কল্পনা অতি জরুরি নয়। তবে উত্তর-পূর্ব ভারত, উত্তর-পশ্চিম বার্মার জনপদের ভাগ্যের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনপদের ভাগ্য কিছুটা হলেও সম্পর্কিত থাকবেই। ভারত ও বার্মার



www.nagorikpathagar.org

উল্লিখিত জনপদগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সশস্ত্র সংঘাত ইত্যাদি পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রভাবান্বিত করবেই। এ কারণেই আমাদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে মোকাবিলা করতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙালি বসতি স্থাপন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে জেনারেল ইব্রাহিম বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে আদর্শ জনবসতি কি রকম হতে পারে সেটা আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। তবে উত্তপ্ত বা বিতর্কিত পরিস্থিতিতে বর্তমান যে জনগোষ্ঠী আছে সেটা আর না বাড়ানোই শ্রেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান জনগোষ্ঠীর অন্যতম হচ্ছে বাঙালি। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণে এবং জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় গঠনমূলক ভূমিকা রাখার স্বার্থে যে সংখ্যক বাঙালি এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে আছে তাদের সেখনেই থাকা শ্রেয়। শান্তি চুক্তির বদৌলতে এখন বাঙালিদের থাকা না থাকা একটি আলোচিত বিতর্ক। সরকার বলেছেন, বাঙালিরা থাকবে। কিন্তু জনসংহতি সমিতি বলছে, অলিখিত চুক্তির শর্তানুসারে বাঙালিরা থাকার কথা না। পনের পৃষ্ঠার অধিক দীর্ঘ একটি চুক্তিনামায় বহু কথা লেখা থাকার পরেও শুধু বাঙালিদের বিষয়ে কেন অলিখিত চুক্তি হল এটিই প্রশ্ন। সরকার পক্ষ বলছেন, কোন অলিখিত চুক্তি ছিল না। এ ক্ষেত্রে আমার সুপারিশ হচ্ছে, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখকে স্থিতাবস্থা মনে করে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে জনসংখ্যা ছিল সেটিকেই পার্বত্য জনগোষ্ঠী বলে ধরতে হবে। নতুন কোন বাঙালি বসতি সেখানে স্থাপিত হবে না, আবার যারা আছে তারাও অন্যত্র যাবে না। এই জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্যে বাংলাদেশী জাতি ও বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র যা কিছু প্রয়োজন তা করবে। আর এই ভু-খণ্ড রক্ষার জন্যে নিরাপত্তার সার্বিক দায়িত্ব থাকবে জাতীয় সরকারের হাতে। একই সঙ্গে পরিস্থিতির যাতে অবনতি না ঘটে তার জন্য অনুঘটক পর্যবেক্ষক এবং সতর্কতার প্রয়োজন।

দৈনিক পূর্বকোণ ৩১/০৩/২০০১ইং



www.nagorikpathagar.org

# ৭. পুলিশবাহিনী

## পুলিশবাহিনীর মৌলিক সংস্কার অপরিহার্য

পুলিশ বাহিনী জনসাধারণের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। পুলিশকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার শেষ নেই কেন। পুলিশের সমালোচনা মানে পরোক্ষভাবে সরকারের সমালোচনা, তা যে দলই ক্ষমতায় থাকুক না। ১৪ আগস্ট '৯৯-এ ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে পুলিশ সংক্রান্ত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয় ছিল 'পুলিশ ও সমাজ : পারস্পরিক প্রত্যাশা'। 'সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজ' সিএসপিএস আয়োজিত এ সভায় বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য, প্রাক্তন ইন্সপেক্টর জেনারল অব পুলিশ, প্রাক্তন সচিব, আইনবিদ, জাতীয় দৈনিকের সম্পাদক এবং কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা অংশ নেন। দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টার সে আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করে উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ তাদের নিজ নিজ পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরেন। কোন পত্রিকা কোন কথাটিকে গুরুত্ব দিল সেটা বোঝা যায় সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম দেখে। এই বিষয়ে দশটি বাংলা পত্রিকার শিরোনাম আমি এখানে উদ্ধৃত করছি।

এক. 'পুলিশকে পৃথক জবাবদিহি কাঠামোর আওতায় আনতে হবে : আইন প্রয়োগে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।' দুই. 'চুয়ান্ন ধারা ও রিমান্ড ব্যবস্থা বাতিলসহ পুলিশের অপরাধ ভিন্ন সংস্থা দ্বারা তদন্তের দাবি।' তিন. 'যাহারা পুলিশ বাহিনীতে ঘুস দিয়া চাকরি নেয় তাহাদের নিকট মানুষের প্রত্যাশা কি করিয়া পূরণ হইবে।' চার. রাজনীতিকীকরণই পুলিশ বাহিনীর প্রতি আস্থা কমার প্রধান কারণ'। পাঁচ. 'পুলিশের অপরাধ তদন্তে পৃথক কমিশন গঠনের সুপারিশ।' ছয়. 'পুলিশের কাছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় স্বতন্ত্র কমিশন গঠন প্রয়োজন।' সাত. 'জনগণের প্রতি সেবার মনোভাব আজো সৃষ্টি হয়নি পুলিশের, ফলে বিতর্ক থেকেই যাচ্ছে।' আট. 'পুলিশের অপরাধের তদন্ত পুলিশকে দিয়ে নয়'। নয়. 'রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের কারণে পুলিশ যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারে না।' দশ. 'ঋণখেলাপি চোর-ডাকাতরা রাজনীতিতে সংসদে, তাদের পরিচালিত পুলিশের কাছে ভাল কি আশা করা যায়?'

ঐ আলোচনা সভায় অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরা হয়। তার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য।

এক. পুলিশ কর্তৃক সংগঠিত কোন অপরাধ পুলিশ ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে তদন্ত করার বন্দোবস্ত করা। দুই. জনগণের মানসপটে পুলিশ সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত নেতিবাচক;



www.nagorikpathagar.org

এটা উন্নত করা। তিন. পুলিশের রাজনীতিকীকরণ বন্ধ করা। চার. পুলিশের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করা। পাঁচ. পুলিশের সমস্যাবলী পর্যালোচনা করে সেগুলি সমাধানের লক্ষ্যে উপযুক্ত সুপারিশের জন্য একটি সিভিল কমিশন গঠন করা। ছয়. পুলিশের নিজেদের ভেতরের দুর্নীতি বন্ধ করা। সাত. পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ন ও পুনঃপর্যালোচনা করা।

কারো পক্ষেই সকল সংবাদপত্র পড়া সম্ভব নয়। একথা মনে রেখেই বিগত বারো মাসের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পত্রপত্রিকা ঘেঁটে পুলিশ সংক্রান্ত যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ চোখে পড়েছে সেগুলোর শিরোনাম তুলে ধরছি।

দৈনিক অর্থনীতি : ৩১-১-২০০০। 'উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তার পর্যালোচনা–দিনাজপুরে ৩৫১টি নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় পুলিশের গাফিলতি। ৭০টি ত্রুটিপূর্ণ।' ৮-৯-৯৯ দৈনিক অর্থনীতি : 'পুলিশ ও আইনের প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, পিটিয়ে হত্যার প্রবণতা বাড়ছে।' ১৩-১-২০০০ দৈনিক ইনকিলাব : 'সিএমপি ট্রাফিক বিভাগের টোকেন, পুলিশ কর্মকর্তারা পান লাখ লাখ টাকা : ভিকটিম ৩৬ সার্জেন্ট'। ৪-৯-৯৯ : দৈনিক ইনকিলাব : '৮ মাসের খতিয়ান : ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৬৬১টি। জেল ও কোর্ট হেফাজতে মৃত্যু হয়েছে ৪৬ জনের।' ১২-১১-৯৯ ডেইলি স্টার : 'Systematic extortion all the way. Police collect over Tk. 32 lakhs a day from trucks in one route alone.' অর্থাৎ পদ্ধতিগত জবরদস্তির মাধ্যমে উৎকোচ আদায় : পুলিশ একদিনে এক রুটেই মাত্র ৩২ লাখ টাকা কামায়।

১৬-৪-৯৯ দৈনিক জনকণ্ঠ : 'একশ' পুলিশ অফিসারের ৩শ' কোটি টাকার সম্পত্তি।' ৩১-৭-৯৯ : দৈনিক জনকণ্ঠ : 'চার পুলিশ কর্মকর্তার ২০ কোটি টাকার সহায়-সম্পত্তি, সবই নাকি শ্বশুর বাড়ি থেকে পাওয়া?' ২৯-১২-৯৯ : দৈনিক জনকণ্ঠ : 'পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে, তিনিই পুলিশের সঙ্গে যোগ দিলেন এক অনুষ্ঠানে। ২৬-১-২০০০ : ডেইলি স্টারের একটি নিবন্ধ : 'The pressures on the police work force' (by Abul M Ahmad).

২০-১-২০০০ : দৈনিক ইত্তেফাকে একটি নিবন্ধ : 'পুলিশ প্রশাসনের দক্ষতা ও সততা' (কে এম সোবহান)।

১৯-৯-৯৯ : দৈনিক জনকণ্ঠ : 'পুলিশের প্রতি আস্থা কম। মানুষ ঝুঁকছে বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার দিকে।' ৫-৯-৯৯ : ডেইলি স্টার : 'Confidence in the Police' ১৭-৮-৯৯ : ডেইলি স্টার : 'Take police reform seriously'. ২০-৪-৯৯ : ডেইলি স্টার : 'Frame code of conduct for law enforcers immediately.



www.nagorikpathagar.org

সংবাদপত্র থেকে আরেকটি উদাহরণ। ডেইলি স্টার-এর ১৬ জানুয়ারির একটি খবরের শিরোনাম : Rising crimes, unemployment most serious problem-survey report'. (অপরাধ, বেকার সমস্যা চরমে-জরিপ প্রতিবেদন)।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম একটি সামাজিক ও বাজার গবেষণা কোম্পানির নাম ORG-MARG। তাদের বাংলাদেশী সহযোগী হচ্ছে অর্গ-মার্গ কোয়েস্ট। অর্গ-মার্গ বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল এবং শ্রীলংকায় একটি সমীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, বাংলাদেশের জনগণের ২২.৪ ভাগ মনে করে যে ক্রমবর্ধমান অপরাধই দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা, ২০.৬ ভাগ মনে করে যে বেকারত্ব হচ্ছে দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা। ভারতের উত্তরদাতাগণের গরিষ্ঠ সংখ্যক মনে করে, বেকারত্ব হচ্ছে সে দেশের এক নম্বর সমস্যা এবং মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে দ্বিতীয় প্রধান সমস্যা। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা ও তার প্রতিকার কি'? আমি বলব-বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা অকার্যকর পুলিশ ব্যবস্থা। এবং এখনই উচিত হবে একটি সৎ ও দক্ষ পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেয়া। এই ২০০০ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারিতেও যদি এই দুইটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে কোন পদক্ষেপ নেয়া শুরু হয় তাহলে ২০০৬ সালের পূর্বে সেটার ফল দেখতে পাওয়া যাবে না। আমি নিজে যেহেতু একজন প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা, তাই সামরিক বাহিনীসমূহের উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা ইত্যাদি আমার কাছে অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা। কিন্তু অবসর নেয়ার পর বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সঙ্গে মেশার সুযোগে দেশ ও সমাজ সম্পর্কে আমার চিন্তা-ভাবনায় মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। সেই সুবাদেই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশ ও সমাজকে যদি উন্নত করতে হয় তাহলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি সৎ ও দক্ষ পুলিশ বাহিনী গড়ে তুলতে হবে এবং মাঠপর্যায়ে তাদের দায়িত্ব পালনে গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে।

আমার মতে, দেশ ও জাতির নিরাপত্তার সঙ্গে যে কয়েকটি প্রশ্ন জড়িত তার মধ্যে তিনটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি হল দেশের ভৌগোলিক ও অন্যান্য স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে বসবাস উপযোগী রাখা এবং দেশের মানুষকে সভ্যতা ও সামাজিকতার নীতিমালার আওতায় বসবাস করার সুযোগ দেয়ার জন্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। অগ্রাধিকার বিবেচনায় অবশ্য শেষের কথাটি আমার মতে প্রথমে করতে হবে। সেটা হলে, অন্য দুটি সহজতর হবে। চলতি মাসের গোড়ায় রোটারি ক্লাব অব ঢাকা মিড টাউনের সাপ্তাহিক আলোচনা সভায় আমি অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। আমার আলোচ্য বিষয় ছিল 'গরিবের জন্য যুদ্ধ ও শান্তি'। গরিবের যুদ্ধটা হচ্ছে ক্ষুধা ও দৈন্যের বিরুদ্ধে। এবং তাদের জন্য শান্তিটা হচ্ছে সারাদিন মেহনত করার পর রাত্রিতে নিরাপদে ঘুমাবার আশ্বাস। বাংলাদেশের জনগণের চার ভাগের তিন ভাগ, পৃথিবীর যেকোন বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় দরিদ্র। অতএব



www.nagorikpathagar.org

সেই চারভাগের তিন ভাগের অধিক জনগোষ্ঠীকে যুদ্ধে জয়ী হতে হলে এবং শান্তি দিতে হলে যে পরিবেশ প্রয়োজন সেই পরিবেশ সৃষ্টিতে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে পুলিশ বাহিনীকে। কেউ যদি বলেন, সামরিক বাহিনী এতে ভূমিকা রাখতে পারে। তাহলে জবাবে বলতে হবে যে, পুলিশের কাজটাই সামরিক বাহিনী করবে। যেমন-গত বারো মাসে কয়েকবারই ঢাকা শহরে সেনা সদস্য মোতায়েন করা হয়েছিল ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এ প্রেক্ষাপটেই পুলিশের আগামী দিনের ভূমিকা সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। পুলিশের দক্ষতা, কার্যকারিতা, সততা, মনোবল ইত্যাদিতে যে ধস নেমেছে সেটা আমাদের বৃহত্তর সমাজ, প্রশাসন ও নাগরিক জীবনের প্রেক্ষাপটে মোটেই বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। বাংলাদেশের সবাই সৎ এবং পুলিশই শুধু দুর্নীতিগ্রস্ত একথা বলারও কোন অবকাশ নেই। সেনাবাহিনীতে ২৭ বছর চাকরিকালে সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে যে ধারণাই পোষণ করে থাকি না কেন, এখন আমি বলতে বাধ্য যে, বাংলাদেশের হেন পেশা নেই যেখানে চাকরিরত ব্যক্তিরা কমবেশি দুর্নীতিগ্রস্ত নয়। কেউ বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত, কারণ তার চাহিদা কিংবা লোভ বেশি এবং তার সুযোগও বেশি। কেউ কম দুর্নীতিগ্রস্ত, কারণ হয়তো তার চাহিদা কম অথবা সুযোগ কম। সুযোগ আছে কিন্তু দুর্নীতি করছে না এমন লোক খুঁজে পেতে হলে খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার মত তল্লাশি চালাতে হবে। তাহলে প্রশ্ন উঠে শুধু পুলিশকে নিয়ে এতো কথা কেন? উত্তর হলো, পুলিশকে নিয়ে এতো মাথাব্যথা এই জন্য যে, পুলিশ হচ্ছে স্বরবর্ণের মত। স্বরবর্ণ ছাড়া যেমন কোন উচ্চারণ সম্ভব নয়, পুলিশ ছাড়াও তেমনই কোন প্রশাসনিক ক্রিয়া সম্ভব নয়। অথবা পুলিশ হচ্ছে রসায়ন বিজ্ঞান-এর ১০২টি মৌলিক পদার্থের মত যেগুলির সংমিশ্রণেই যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি। তাই আমাদেরকে সর্বাগ্রে পুলিশের দিকে নজর দিতে হবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে সার্বিক দূষিত পরিবেশে, দুর্নীতিগ্রস্ত সকল পেশার মধ্যে হঠাৎ করে একটি পেশা (পুলিশ) কে কিভাবে দুর্নীতিমুক্ত ও উন্নত করা যাবে। জবাবে বলতে হয় যে, এটা করতে হবে কয়েক প্রকারে, যেমন মটিভেশন বা প্রেরণা, আর্থিক উৎসাহ, কঠিন শাস্তি এবং সমাজে সম্মান বৃদ্ধির মাধ্যমে। অপরপক্ষে পুলিশ যখন নিজে উন্নত হতে এবং দুর্নীতিমুক্ত হতে শুরু করবে তখন তারা স্বাভাবিক মানসিক শক্তিতেই অন্য পেশায় কোন দুর্নীতি প্রশ্রয় দেবে না। বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগসাজশে বাংলাদেশের বনসম্পদ দ্রুত লোপ পাচ্ছে। যদি বন বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ দুর্নীতিবাজ হন তাহলে তার প্রত্যক্ষ প্রভাব কাঠ ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কোন পেশার উপর পড়বে না। ভূমি প্রশাসন বা ভূমি জরিপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা এবং চোরাচালান নিরোধ কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরাও দুর্নীতিগ্রস্ত। ঐ দুইটি বিভাগ যদি দুর্নীতিমুক্ত হয় তাহলে সমাজে একটি সীমিত প্রভাব পড়বে। কিন্তু পুলিশ বিভাগ যদি দুর্নীতিমুক্ত ও দক্ষ হয় তাহলে সমাজে ব্যাপক প্রভাব পড়তে বাধ্য। ভূমি জরিপকারী



www.nagorikpathagar.org

দল বা বন বিভাগের কর্মকর্তা দুর্নীতি করলে, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীরা হাসপাতালের ওষুধ চুরি করে বাজারে বিক্রি করলে, সিমেন্ট বা সার ব্যবসায়ী দ্রব্যে ভেজাল দিলে থানায় নালিশ করা যায়, আপনার কন্যাকে শ্বশুর বাড়িতে যৌতুকের জন্য অত্যাচার করলেও থানায় নালিশ করতে পারবেন। থানা যদি সৎ, দুর্নীতিমুক্ত ও দক্ষ হয়, তাহলে আপনার সুবিচার পাওয়ার পথে অনেকটা এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু পুলিশ যদি অসৎ ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়, তাহলে আপনি মামলা দায়ের করারও কোন জায়গা পাবেন না। আপনি সরকারি চাকরি করতে গেলে পুলিশের মাধ্যমে আপনার চরিত্র ও অতীত কর্মকাণ্ড যাচাই হবে। সনদপত্র ও রিপোর্ট দিবেন থানার ওসি। আপনি বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে চাকরি শুরু করার আগে এই মর্মে সদনপত্র লাগবে যে আপনি শৃঙ্খলার পরিপন্থী বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন নাই। দিনকে রাত করা এবং রাতকে দিন করার মত রিপোর্ট অনায়াশেই সম্ভব দুর্নীতিগ্রস্ত পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে। বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য, আমাদের অর্থবহ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সৎ দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ পুলিশ বাহিনী ও পুলিশ প্রশাসনের বিকল্প নেই।

পুলিশ বাহিনী তথা পুলিশ প্রশাসনের উন্নয়ন কি সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। ১৯৮৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৮৯ সালের জুন পর্যন্ত ২৪ মাস আমি বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি অঞ্চলে সেনাবাহিনীর ব্রিগেড কমান্ডার ছিলাম। তথাকথিত শান্তি বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট অশান্তি মোকাবিলা করে সাংবিধানিক শাসন প্রক্রিয়া চালু করার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম। সে সময় আমার অধীনে যে নিরাপত্তা বাহিনী কাজ করত তাদের মধ্যে পুলিশ অন্যতম। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের সদস্য এবং জেলা পুলিশের সদস্য এই উভয় প্রকারের পুলিশ মোতায়েন করা ছিল। দায়িত্বরত পুলিশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাগণের সহযোগিতায় এবং নিজে পরিশ্রম করে ও বুদ্ধি খাটিয়ে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সফল হয়েছিলাম।

আমি ঐ সময়কালে আমার অধীনে ন্যস্ত পুলিশদের পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কথা দেশবাসীর কাছে সশ্রদ্ধচিত্তে নিবেদন করছি। তাই দেশব্যাপী মোতায়েনকৃত পুলিশ সদস্যদেরকেও যে সঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব সেটা আমি বিশ্বাস করি। তবে তার জন্য নীতিমালা লাগবে এবং কাজটিকে উপর থেকে শুরু করতে হবে। অবশ্য ফল একদিনে পাওয়া যাবে না। আজকে শুরু করলে পাঁচ বছর পর কিছু ফল পাওয়া যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমি সরকারের কাছে জোর আবেদন জানাচ্ছি যে, আপনারা পুলিশ বাহিনীর সংস্কারে ব্রতী হোন, পুলিশের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করুন। পুলিশ বাহিনীতে নিয়োজিত মানবসম্পদ উন্নয়নে এবং যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি ক্রয়ে দুর্নীতি না হলে তা দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবেই। সরকার আসবে সরকার যাবে কিন্তু পুলিশ বাহিনী থাকবে। তাই এ বাহিনীর সংস্কার দেশের কল্যাণের জন্য অপরিহার্য।



www.nagorikpathagar.org

১৯৮৮ সালের আগস্ট মাসে একটি প্রজ্ঞাপন দ্বারা তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সরকার একটি পুলিশ কমিশন গঠন করেছিল, সেই কমিশন দীর্ঘ চার মাস পরিশ্রম করার পর ৩৩০ পৃষ্ঠার একটি রিপোর্ট দাখিল করেছিল। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি আমিনুর রহমান খান ছিলেন চেয়ারম্যান। নয়জন সদস্যের মধ্যে ছিলেন সাবেক প্রতিমন্ত্রী প্রফেসর আবদুস সালাম এমপি, প্রাক্তন মন্ত্রী ব্যারিস্টার রাবেয়া ভুঁইয়া, ইকবাল হাসান মাহমুদ এমপি, সাবেক সচিব জনাব সালাহউদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. কে. এম মহসীন, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের তৎকালীন সভাপতি ও বর্তমানে বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও লালবাগ শাহী মসজিদের খতিব মাওলানা আমিনুল ইসলাম। কমিশনের সদস্য সচিব ছিলেন তৎকালীন ডিআইজি এম আজিজুল হক। গত সোয়া এগারো বছরে এই রিপোর্টের সুপারিশ অতি অল্পই বাস্তবায়িত হয়েছে। কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্স বা কাজের তালিকা বেশ দীর্ঘ ছিল। সেখান থেকে আমি সংক্ষেপে চারটি উল্লেখ করছি।

ক. বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে পুলিশ বাহিনীর জনবলের সংখ্যা ও তাদের গুণগতমান যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত কিনা পরীক্ষা করা। উত্তর যদি না-সূচক হয় তাহলে সাংগঠনিক কাঠামো, জনবল, প্রশিক্ষণ, সাজসরঞ্জাম এবং সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা। খ. আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করা এবং অপরাধ অনুসন্ধান, নিরোধ ও তদন্তে দক্ষতা ও কার্যকারিতার বিদ্যমান মান পরীক্ষা করা ও সেগুলি উন্নতির লক্ষ্যে সুপারিশ করা। গ. মেট্রোপলিটন পুলিশ বাহিনীসমূহের দক্ষতা ও প্রভাব পরীক্ষা করা এবং কার্যকারিতা উন্নতির লক্ষ্যে সুপারিশ করা। ঘ. বিদ্যমান (১৯৮৮) পুলিশ-জনগণ-এর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি পারস্পরিক সম্পর্ক জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ। আজকে ২০০০ সালেও যদি এ রকম স্বনামধন্য অন্য ১০ ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আবার পুলিশ কমিশন গঠন করা হয়, তাহলে সেই কমিশনও ৮৮ সালের কমিশন থেকে ভিন্ন কিছুই বলবে না। অতএব সরকার ১১ বছর আগের রিপোর্টটি বাস্তবায়ন করলে আমরা দেশবাসী উপকৃত হই। দুঃখের বিষয় দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি দেশ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক ঐতিহ্য হল কমিশন গঠন করা, কেয়ামত সন্নিকটে মনে করে তড়িঘড়ি করে রিপোর্ট প্রণয়ন করা এবং অব্যবহিত পরেই সেটা ভুলে যাওয়া।

পুলিশের অকৃতকার্যতার জন্য নিম্নলিখিত নয়টি কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রথমত জনবলের অপর্যাপ্ততা এবং সাংগঠনিক কাঠামোতে অসম্পূর্ণতা, দ্বিতীয়ত যানবাহন, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিবিধ সরঞ্জামের অভাব। তৃতীয়তঃ জনগণের পক্ষ থেকে পুলিশের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার অভাব, পুলিশের উপর জনগণের আস্থার অভাব এবং বিচারকার্যে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্কের অভাব।



www.nagorikpathagar.org

চতুর্থত পুলিশের লোকভর্তি ও পদোন্নতি এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধায় ক্রটি, পঞ্চমত অপরাধ হলে সেটাকে তালিকাভুক্ত বা রেকর্ড না করা এবং ক্রটিপূর্ণ তথ্য (অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধের সংখ্যাকে কম দেখানো)। প্রদান। ষষ্ঠত অপরাধসমূহের অসন্তোষজনক ও লোকদেখানো তদন্ত এবং অপরাধীদেরকে নামকাওয়াস্তে প্রসিকিউট করা, সপ্তমত পুলিশ প্রশাসনের বাইরে থেকে তাদের কর্তব্য পালনে বাধা প্রদান করে বিশেষত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুলিশকে ব্যবহার করা। অষ্টমত পুলিশ বাহিনীতে দুর্নীতি এবং নবম কারণ পুলিশ বাহিনীতে কঠোর শৃঙ্খলার কার্যকর নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন ও তদারকির অভাব। মোটামুটি এই ধরনের বক্তব্যই গত ১০০ বছরে বিভিন্ন পুলিশ কমিশন রিপোর্টে বা পুলিশ সংক্রান্ত পর্যালোচনা রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে।

১৮২৯ সালে ইংল্যান্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্যার রবার্ট পীল-এর আগ্রহে ও উদ্যোগে পার্লামেন্টে আইন পাশ করে লন্ডন শহরের জন্য একটি পুলিশ বাহিনী গঠন করা হয়। প্রাথমিকভাবে সমালোচিত হলেও অতিশীঘ্রই পুলিশ বাহিনী গঠনের তত্ত্ব ও বাস্তবতা দেশ-বিদেশে বোদ্ধা নাগরিকগণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নগর পুলিশ সৃষ্টি হয় ১৮৩৩ সালে নিউইয়র্ক নগরীতে। তবে দক্ষিণ এশিয়ার ধারাবাহিকতা একটু অন্যরকম। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ দখলের সাত বছর পর ১৭৬৫ সালে তারা বাংলার দেওয়ানী লাভ করে। লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে ১৭৯২ সালে ডিসেম্বর মাসে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে একটি বিধান অনুমোদিত হয়, যার নাম ছিল 'Regulation for the Police of the Collectorship in Bengal, Bihar and Orissa.' ১৭৯৩ সালে তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশের জেলাসমূহকে তিনটি পুলিশী থানায় ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি থানার আয়তন ছিল কমবেশী ৪০০ বর্গমাইল। থানার পুলিশ প্রধানকে আখ্যা দেয়া হয়েছিল দারোগা। ১৮১৭ সালে আরেকটি নতুন বিধান বলে তৎকালীন পুলিশ বাহিনীকে সংস্কার করে নতুনভাবে চালু করা হয়। এই নতুন আইন ১৮৬১ সাল পর্যন্ত কার্যকর ছিল। ১৮৬১ সালের পুলিশ অ্যাক্ট মোতাবেক পুলিশ বাহিনীকে পুনরায় সংস্কার করা হয়। এর একটি নাতিদীর্ঘ প্রেক্ষাপটও আছে। ১৮৫৭ সালে সংগঠিত সশস্ত্র ঘটনা যাকে বিদেশীরা বলে সিপাহী বিদ্রোহ এবং আমরা গর্বের সঙ্গে বলি স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ, ব্রিটিশ শাসকদের চোখ খুলে দেয়। ভারতের শাসনভার তখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ সম্রাট (তখন সম্রাজ্ঞী) নিজ হাতে নিয়ে নেন। সম্রাজ্ঞীর সরকার দেশীয় মানুষ দিয়ে একটি পুলিশ বাহিনী গঠন করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। ১৮৬০ সালের জুলাই মাসে লন্ডন থেকে এই নির্দেশ আসে। আগস্ট মাসে তৎকালীন ভারত সরকার এইচ এম কোর্ট নামক একজন আমলার নেতৃত্বে একটি পুলিশ কমিশন গঠন করে। কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে জারিকৃত



www.nagorikpathagar.org

১৮৬১ সালের ৫নং আইন ঐ বছরের ২২ মার্চ হতে কার্যকর হয় এবং পরবর্তী চার দশক ধরে অব্যাহত থাকে।

১৯২০ সালে লর্ড কার্জন-এর নির্দেশে স্যার এন্ড্রু ফ্রেইজারকে সভাপতি করে আর একটি পুলিশ কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পুলিশ বাহিনী পুনর্গঠন করা হয়। ১৯৩৭ সালের ব্লান্ডি গর্ডন কমিটি এবং ১৯৩৯ সালের চৌকিদারি ইনকোয়ারি কমিটি কিছু সংস্কার সুপারিশ করলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে সেগুলি বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া যায়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারত সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার কমিটি পুলিশ সম্বন্ধেও কিছু কিছু সুপারিশ করে। তাদের অন্যতম বক্তব্য ছিল যে, পুলিশ তাদের উপর অর্পিত কাজের চাপ সামলাতে পারছে না। ব্রিটিশদের নিকট থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা পাওয়ার পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গে তথা পূর্বপাকিস্তানে পুলিশ বাহিনী ব্রিটিশ আমলের কাঠামোতেই এবং নীতিমালায় কাজ শুরু করে। ১৯৫৩ সালে বিচারপতি শাহাবুদ্দিন কমিটি এবং ১৯৫৬ সালে হ্যাচ বার্নওয়েল কমিটি পুলিশের সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ করলেও সেগুলোর কোনটাই বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৬০-৬১ সালে বিচারপতি বি. জি. কনস্টেনস্টাইনের নেতৃত্বে একটি পূর্ণাঙ্গ পুলিশ কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের বহুসংখ্যক সুপারিশের মধ্যে মাত্র কয়েকটি বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৬৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল এ. ও. মিঠা-এর নেতৃত্বে আরেকটি পুলিশ কমিশন গঠন করা হয়। গতানুগতিকতার বাইরে মিঠা কমিশনকে অন্যতম দায়িত্ব দেয়া হয়, বিগত পুলিশ কমিশনসমূহের সুপারিশসমূহের পরিণতি মূল্যায়ন করার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে মিঠা কমিশনের বক্তব্য আমাদের জন্য অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়।

রাজারবাগ পুলিশ লাইনে কর্তব্য ও বিশ্রামরত পুলিশ সদস্যগণ, ৭১-এর ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নগ্ন হামলার প্রত্যক্ষ শিকার হন। কিছুসংখ্যক পুলিশ বীরোচিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যদিও সেটা ক্ষণস্থায়ী ছিল। পরবর্তী ৯ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধকালে বহুসংখ্যক পুলিশ সদস্য সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে দেশের জন্য প্রাণ দেয়। অনেকেই বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধের ইতিহাস সৃষ্টি করেন। ১৬ ডিসেম্বর ৭১-এ মুক্ত বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রের মত পুলিশ বাহিনীও শুধু নাম পাল্টিয়েই একই পুরানো কাঠামোতে নিজেদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। শুধু ইস্ট পাকিস্তান পুলিশের বদলে বাংলাদেশের পুলিশ হয়ে যায়। কাগজে কলমে প্যাডে, গেজেট নোটিফিকেশন করে নাম বদলানো যায়। কিন্ত মন কি বদলানো যায় ? উত্তর হল 'যায় না'। যা হোক নতুন দেশের জন্য প্রয়োজনে পুলিশ বাহিনীর সম্প্রসারণ এবং উন্নতির চেষ্টা করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল জনাব



www.nagorikpathagar.org

আলমগীর এম,এ কবির-এর নেতৃত্বে ১৯৭৭ সালে একটি কমিটি করা হয় এই দায়িত্ব দিয়ে যে, পুলিশের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় পদক্ষেপের সুপারিশ করা হোক। কমিটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করলেও সেগুলো অবাস্তবায়িতই থেকে যায়। এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৬ সালে তৎকালীন এডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ জনাব তৈয়ব উদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি করা হয়। এ কমিটির কাজ ছিল পুলিশ বাহিনীর সার্বিক সমস্যা মূল্যায়ন করে দক্ষতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশ প্রণয়ন। এ কমিটির সুপারিশসমূহের অল্পকিছু বাস্তবায়িত হয়। এরপর ৮৮-৮৯ সালে গঠিত হয় আমিনুর রহমান কমিশন। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত ৯টি কমিটি বা কমিশনের বৃত্তান্ত দিতে গিয়ে পত্রিকার যে স্থান আমি ব্যবহার করলাম তার উদ্দেশ্য মাত্র একটি। পুলিশকে নিয়ে চিন্তাভাবনা, গবেষণা কিছুদিন পরপরই হয়, কিন্তু অবস্থা যে তথৈবচ– এই কথাটি জানিয়ে দেয়া। এ নিবন্ধের প্রথমাংশে যে ৮৮-৮৯ সালের কমিশনের টার্মস অব রেফারেন্স উল্লেখ করেছি সেখানে অন্যতম ছিল পুলিশ ও জনগণের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক পরীক্ষা করা এবং উন্নতির লক্ষ্যে সুপারিশ করা। ঐ কমিশন নিশ্চয়ই বহু কষ্ট করে অনেক সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু তার কয়টি বাস্তবায়ন হয়েছে? এই নিবন্ধের মাধ্যমে আমি সরকারের কাছে আবেদন করছি, পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করুন। আমাদের এই দেশ এবং সমাজকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে পুলিশের সংস্কার-এর কোন বিকল্প নেই। এখনই যদি পুলিশের সংস্কারের দিকে মন না দিই তাহলে দশ বছর পর এই পুলিশই আমাদের সমাজকে গিলে ফেলবে। দুষ্টের দমনের বদলে পুলিশই যদি দুষ্ট হয়ে যায় তাহলে এই সমাজে আর কোন শক্তি থাকবে না তাকে প্রতিরোধ করার। ইথিওপিয়া বা সোমালিয়ার মত অবস্থা এখানেও সৃষ্টি হতে পারে।

সমাজের অপরাধচিত্র ভয়াবহ। আজকের তারিখ পর্যন্ত গত ৩০ বছর যাবৎ এটি ক্রমাগত অবনতির দিকে। অপরাধ দমনে বা নিয়ন্ত্রণে, প্রত্যেকটি প্রশাসনই চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ তারা সফল হতে চাননি। তারা শুধু সীমিত দৃষ্টি দিয়ে সীমিত সময়ের জন্য সমস্যাগুলিকে দেখেছেন। প্রতিটি প্রশাসনই পুলিশ বাহিনীকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন এবং পুলিশ বাহিনীও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সেই গোষ্ঠীস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজগুলি করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। গত ৩০ বছরের সংবাদপত্র ঘাটলে এ নিয়ে একটি বিশ্বকোষ রচনা করা যাবে।

অপরাধ বৃদ্ধির জন্য পুলিশ একমাত্র দায়ী এটা আমি বলছি না। কিন্তু দায়ী কয়েকটি উপাত্তের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পুলিশ। সুতরাং এই পুলিশ বাহিনীকে সংস্কার ও উন্নত করে সেই উন্নত পুলিশ বাহিনীকে দিয়েই অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও দমন করতে হবে। বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে (সরকারের মতে) কিছুসংখ্যক সুনির্দিষ্ট অপরাধের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ এবং সংগঠনকে দমনের জন্য ছয় বছর আগে সন্ত্রাস দমন আইন



www.nagorikpathagar.org

জারি করা হয়েছিল এবং একই লক্ষ্যে কয়েকদিন আগে জননিরাপত্তা আইন চালু করা হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় পুলিশ বাহিনীর জন্য পুলিশ নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন সর্বাগ্রে জরুরি। পুলিশ কর্তৃক সংগঠিত কিছু অপরাধের কথা বিস্তারিতভাবে সরকার ও জনগণ অবশ্যই জানেন। একটা উদাহরণ দেই। টোকেন দিয়ে ঢাকা শহরে চাঁদা তোলা। এটি সকলেরই জানা। টেন্ডার দেয়ার সময় যেমন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঘুষ খায়, তেমনি পুলিশ নানা বাহানায় যান চালক, মালিক ও জনগণের কাছ থেকে ঘুষ খায়। পুলিশ বাহিনীতে ঘুষ খায় না এমন লোক প্রচুর আছে। কিন্তু তারা নীরব। তাদের কাছে আবেদন তারা যেন সোচ্চার হন। জনগণের ওয়াস্তে তাদের কাছে আবেদন করি তারা যেন পুলিশ বাহিনীতে সততা ফিরিয়ে আনেন। কোন কোন সময় একজনের দুর্নীতি অন্যের জন্যে অল্প ক্ষতিকারক হয়। আবার অন্য সময় একজনের ছোট দুর্নীতি সমাজের জন্য বড় ক্ষতির কারণ হয়। পরিবেশ দূষণকারী যে গাড়িকে একজন পুলিশ ছেড়ে দিলেন সেই গাড়ির কালো ধোঁয়াতেই ঢাকা মহানগরীর ২৫ লাখ লোকের সঙ্গে ১০০০ ট্রাফিক কনস্টেবলও দূষণের স্বীকার হচ্ছেন।

পুলিশ ও জনগণের আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে '৮৮-'৮৯ সালের পুলিশ কমিশনে দীর্ঘ বক্তব্য রাখা হয়েছিল বলে জানি। জনগণ কেন পুলিশের কাছে যায় না তার বহু কারণ কমিশন উল্লেখ করেছে বলে শুনেছি। এই বিষয়টির দিকেই সরকার এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য আবেদন করছি। এর জন্য ব্যতিক্রমধর্মী প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কি করলে জনগণের আস্থা ফেরত পাওয়া যাবে সেটা বলা সহজ, কিন্তু বাস্তবায়ন কঠিন। অন্য ৩২টি পেশা ফূর্তি করে যাবে আর, অতিরিক্ত কোন প্রাপ্তি ছাড়া পুলিশ জনসেবায় মনোযোগী হবে এটা আশা করা বাতুলতা। মরুভূমিতে যেমন উটের দৌড় হয় বা টেলিভিশন স্ক্রিনে যেমন ফর্মূলা ওয়ান মোটর রেস দেখি, তেমনি দুর্নীতির মাধ্যমে বড় লোক হওয়ার জন্য বল্গাহীন প্রতিযোগিতা আমাদের সমাজে চলছে। আমাদের আবেদন, পুলিশ বাহিনী যেন সেই প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়। কারণ পুলিশের সততা ও দক্ষতার উপর গোটাজাতির অস্তিত্ব নির্ভর করছে। '৮৮-৮৯ কমিশনের সুপারিশমালার মধ্যে একটি ছিল অনেকটা এ রকম,"The Commission believes that the financial expenses on police be considered as essential ingredient of social development deserving no less priority than other development agencies like education, health, agriculture etc.Police requirements should be integrated into national development planning effort so that its genuine needs do not go by default.This will also ensure planned, well co-ordinated unprevent of policing in the country,"



www.pathagar.com

ভাবার্থ : কমিশনের মতে, পুলিশ সংক্রান্ত ব্যয় সমাজের উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদির চাইতে এটাকে কম গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যাবে না। সার্বিক জাতীয় পরিকল্পনাতেই পুলিশের প্রয়োজনগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পুলিশের যথার্থ চাহিদাকে অস্বীকার করা চলবে না। তাহলেই পরিকল্পিতভাবে পুলিশের উন্নয়ন ও প্রসার সম্ভব। আমি আমার বিনীত বিবেচনায় কমিশনের এ বক্তব্যকে অত্যন্ত যথার্থ মনে করি।

যদি পত্রিকায় স্থানাভাব না হত তা হলে অবশ্যই আরও বিস্তারিত তথ্য, যুক্তি ও বক্তব্যসংবলিত নিবন্ধ উপস্থাপন করতে পারতাম। তার বিকল্প হিসেবেই এই নিবন্ধটি উপস্থাপন করলাম। দৈনিক যুগান্তরের ২০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত দুটি সংবাদ যথা 'ডিবি পুলিশের হাতে নিহত জালালের পরিবার এখন কোথায়? এবং 'টোকেন কাহিনী' আমাকে এ নিবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করেছে। ভবিষ্যতে আবার যদি লেখার সুযোগ পাই তাহলে অবশ্যই সম্মানিত পুলিশ সদস্যদের বীরত্বগাথার উল্লেখ করব। এক্ষণে আমি ছয়টি সুপারিশ করছি। প্রথম সুপারিশ : ঢাকা মহানগর নাগরিক সমাজের বিভিন্ন পেশা (যথা- আইনজীবী, সাংবাদিক, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার, প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট, গাড়ির মালিক, ওয়ার্ড কমিশনার ইত্যাদি) থেকে ৮০ জন প্রতিনিধি নিয়ে একটি নাগরিক কমিটি গঠন করা হোক। এই নাগরিক কমিটির কাজ হবে পুলিশের টোকেন প্রথা ভেঙে দেয়ার জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও প্রচারের ব্যবস্থা করা। সরকারের সহযোগিতা সাপেক্ষে এই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা। ওসমানী উদ্যানকে রক্ষা করার নিমিত্তে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে যেমন নাগরিক আন্দোলন হয়েছিল বা বস্তিবাসীকে অপরিকল্পিতভাবে উচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষার জন্য যেরকম এনজিও আন্দোলন হয়েছিল, আমি ঐ ধরনের প্রচেষ্টার কথা বলছি। সর্বজন শ্রদ্ধেয় কোন ব্যক্তি অবশ্যই এ ধরনের আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন বলে আশা করা যায়। দ্বিতীয় সুপারিশ পুলিশ ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর মডেল বা নমুনার ব্যবস্থা করা। শুধু তত্ত্ব দিয়ে কাজ হবে না। বিদেশ থেকে মডেল আমদানি করেও হবে না। তাই আমাদের দেশের পুলিশ সদস্যদের দিয়ে আমাদেরই মাটি, মানুষ ও পরিবেশের প্রেক্ষাপটেই নমুনা খাড়া করতে হবে। এজন্যে চারটি মেট্রোপলিটন পুলিশে একটি করে মোট চারটি থানা এবং মফস্বল এলাকায় ছয়টি বিভাগের একটি করে ছয়টি থানাকে পরীক্ষামূলকভাবে নেয়া হোক। উপযুক্ত সংখ্যক এবং উপযুক্ত মেধার অফিসার ও জনবল দেয়া হোক। গাড়ি-ঘোড়া, সরঞ্জামাদি ও দু'বছর সময় দেয়া হোক। গতানুগতিকতার বাইরে নিয়ে পুলিশ-জনগণ সম্পর্ক উন্নয়নের পন্থা পরীক্ষা করা হোক এবং প্রশিক্ষণের জন্য নমুনা প্রস্তুত করা হোক। তৃতীয় সুপারিশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের জন্য আলাদা বেতন স্কেল বিবেচনা করা হোক। তাদের বেতন অন্যান্য পেশা থেকে অবশ্যই বেশি করতে হবে যাতে কোন



www.pathagar.com

পুলিশ সদস্য দুর্নীতির দিকে আকৃষ্ট না হয়। কোন পুলিশ সদস্য কর্তব্য পালনকালে যদি মৃত্যুবরণ করে বা আহত হয় অথবা অক্ষম হয়ে থাকে তাহলে তার পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। পুলিশ ভালো কাজ করলে তাকে পুরস্কৃত করতে হবে। সম্মানিত করতে হবে। চতুর্থ সুপারিশ: পুলিশের জন্য বাজেট বৃদ্ধি করতেই হবে। চৌকষ পোশাক, আধুনিক অস্ত্র, অবাধ চলাচলের জন্য বাহন, থানার খরচ ইত্যাদি যেন সরকার দেয় এবং সেগুলো যেন যুক্তিযুক্ত হয়। পঞ্চম সুপারিশ : পুলিশ কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ সংঘটনের দৃষ্টান্তমূলক অভিযোগ তদন্ত করার জন্য আলাদা কর্তৃপক্ষ ও বিধান সৃষ্টি করতে হবে। ঐরূপ তদন্তকারীদের নিরাপত্তা শতাকরা ১০০ ভাগ নিশ্চিত করতে হবে। তদন্তের পর দ্রুত বিচারের জন্য আলাদা ট্রাইব্যুনালের ব্যবস্থা করতে হবে। ষষ্ঠ এবং শেষ সুপারিশ : পুলিশ বাহিনী রাজনীতিকীকরণ বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে হবে। এ ব্যাপারে মানবাধিকার সংগঠনগুলো বছরান্তে রিপোর্ট দিতে পারে। বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা তাদের নিকটজনের পক্ষ থেকে পুলিশের কর্তব্যে হস্তক্ষেপও এ পর্যায়ে পড়ে।

দৈনিক যুগান্তর ২৯/০২/২০০০ইং

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তাসরীনা বিনতে মুজাহিদ



www.pathagar.com

www.pathagar.com